শ্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬২

পাঁচ টাকা

৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, "বাণী-শ্রী" প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদপট—শ্রীআশু বন্দোপাধ্যায়

অনুজ শ্রীমান ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

নিবেদন

আনাতোল ফ্রাঁসের বিখ্যাত উপন্যাস 'Thais' অবলম্বনে 'নিরঞ্জনা' রচিত হইয়াছে। ইহা ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নহে, দেশ কাল পাত্র পাত্রী আমাদের দেশের অনুরূপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

ভাগলপুর
২৪ ৯-৫৫

বনফুল
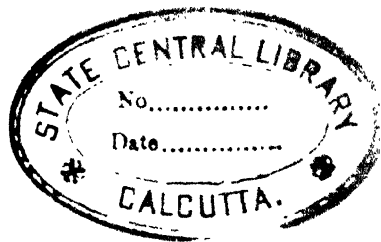
নিরঞ্জনা

পুরাকালে হিমালয়ের পাদদেশে অতি বিস্তৃত এক অরণ্যে বহু গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বসবাস করিতেন। সংসারবিরাগী হইয়া পরমার্থের সন্ধানে কৃচ্ছ্রসাধন করাই তখন বহু ভদ্রসন্তানের জীবনাদর্শ ছিল। এই উদ্দেশ্যে কেহ অরণ্যে, কেহ পর্বতগুহায়, কেহ বা উত্তপ্ত মরুভূমিতে গিয়া বাস করিতেন। যে অরণ্যের কথা বলিতেছি, সে অরণ্যে সন্ন্যাসীদের একটা সমাজই গড়িয়া উঠিয়াছিল। অরণ্যে স্থানাভাব ছিল না, সুতরাং প্রত্যেকেই তাঁহারা নির্জনতাসুখ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেন, আবার বিপদের সময় পরস্পরকে সাহায্যও করিতে পারিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যজ্ঞকুণ্ড ছিল; তাহাতেই তাঁহারা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিয়া ফল-লাভের প্রত্যাশা করিতেন। কেহ কেহ আবার যজ্ঞে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারা গভীর অরণ্যমধ্যে ছোট ছোট কুটীর নির্মাণ করিয়া নির্জন তপস্যায় মগ্ন থাকিয়া আত্মার নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইতেন।

শুধু সংযত নয়, অতিশয় কঠোর জীবন যাপন করিতেন ইঁহারা। অনেকেই সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সূর্যাস্তের পর সামান্য কিছু ফলমূল সেবন করিতেন, শয়ন করিতেন ভূমিশয্যায় অথবা খর্জুরপত্র-নির্মিত মাদুরের উপর। অনেকেই উপাধান ব্যবহার করিতেন না,

যাঁহারা করিতেন প্রস্তরখণ্ডই তাঁহাদের উপাধান হইত। গৈরিক বহির্বাস এবং উত্তরীয় ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন আবরণ থাকিত না। কেহ কেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়াও থাকিতেন। সাধনমার্গে যাঁহারা বেশি অগ্রসর, তাঁহারা ভূমিতে গভীর গর্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে আত্মগোপন করতঃ তৃপ্তি লাভ করিতেন।

তপস্যাই ছিল তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তাঁহারা এমন সব কাজ করিতেন যাহা সাধারণ মানুষ করিতে পারে না। তাঁহারা বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন, উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করিয়া নৈশ অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া তুলিতেন, কখনও রুদ্ধশ্বাসে দুরূহ আসনে বসিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন, কখনও শারীরিক কামনা-বাসনাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দমন করিবার উদ্দেশ্যে আত্মনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইতেন। বস্তুত দেহকে নানাভাবে নির্যাতন করিয়া তাঁহারা এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া লজ্জাকর ছিল তাঁহাদের চক্ষে। কোনপ্রকার প্রসাধনে তাঁহাদের রুচি তো ছিলই না, প্রত্যহ স্নান করাটাও অনেকে প্রয়োজন মনে করিতেন না। অনেকের চর্মরোগ হইত। ইহাতে চিন্তিত বা লজ্জিত না হইয়া তাঁহারা বরং আনন্দিতই হইতেন। ভাবিতেন, দেহটা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায় মাত্র, পীড়া তাহাকে ন্যায্য শাস্তিই দিতেছে।

সকলেই যে সর্বদা আত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন—এ কথা অবশ্য সত্য নয়। সাধারণ সাংসারিক কর্মের প্রতিও অনেকের আকর্ষণ ছিল। অনেকে বাসগৃহ-সংলগ্ন ভূখণ্ডে কৃষিকর্ম করিতেন, অনেকে খর্জুরপত্র সংগ্রহ করিয়া মাদুর বুনিতেন, অন্নসংগ্রহের

জন্য নিকটবর্তী গ্রামে গিয়া কেহ কেহ ভিক্ষাও করিতেন, কেহ কেহ বা মজুরের কাজও করিতেন। গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থগণের হৃদয়ে যদিও তাঁহাদের শ্রদ্ধার আসনই প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু নাস্তিক-প্রকৃতির এমন কয়েকজন দুষ্ট লোকও ছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ কটূক্তিও করিতেন; অনেকে বলিতেন, গ্রামে যে সব ছোটখাটো চুরি ডাকাতি হয় তাহা এই সন্ন্যাসীদেরই কাজ। বলা বাহুল্য, এ এব অভিযোগ মিথ্যা। এই সব সন্ন্যাসী পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে সত্যই বীতরাগ ছিলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল পরলোকের দিকে, ইহলোকের দিকে নয়।

মধ্যে মধ্যে এই অরণ্যে অলৌকিক অসম্ভব কাণ্ড ঘটিত। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, কখনও দেবতা কখনও বা দানব নাকি এই সন্ন্যাসীদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন। দেবতারা দিব্যকান্তি ধরিয়া দেখা দিতেন, আর দানবেরা আসিতেন কখনও বর্বরের বেশে, কখনও বা পশুর রূপ ধরিয়া। প্রভাতে দূরবর্তী ঝরনায় জল আনিতে গিয়া তাঁহারা বালুকার উপর নানারূপ অদ্ভুত পদচিহ্ন দেখিতে পাইতেন। তাঁহাদের মনে হইত হয়তো কোনও দুষ্ট দানব অদ্ভুতাকৃতি পশুর রূপ ধারণ করিয়া গভীর নিশীথে কাহাকেও প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছিল। মনে হইত তাঁহাদের কেন্দ্র করিয়া এই অরণ্যভূমিতে দেব-দানবের একটা যুদ্ধ চলিতেছে—কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা অদৃশ্যভাবে। দেবতারা মোক্ষলিপ্সু ভক্তগণকে সৎপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন আর দানবেরা চেষ্টা করিতেছে তাঁহাদের সে পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে অরণ্যভূমি দেব-দানবের যুদ্ধভূমি হইয়া উঠিত।

দানবদের এই হীন প্রচেষ্টা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য

তপস্বীরা নানারূপ প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করিতেন। কখনও উপবাস, কখনও ব্রত, কখনও অনুতাপ করিয়া তাঁহারা দেবতাগণের কৃপালাভ করিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাদের শীর্ণ দেহ শীর্ণতর হইয়া যাইত, কিন্তু সেদিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, দানবদের হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতেন। কিন্তু হায়, এত চেষ্টা সত্ত্বেও ষড়রিপু—বিশেষ করিয়া কাম—তাঁহাদের মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিত। তখন তাঁহারা তার-স্বরে রোদন করিতেন। মনে হইত, অরণ্যের অন্ধকারে ক্ষুধার্ত হায়েনার দল বুঝি চীৎকার করিতেছে! তাঁহাদের এই কামাতুর অবস্থায় দানবেরা মায়াবলে রূপসী যুবতীর বেশে মাঝে মাঝে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইত। শুধু তাহাই নয়, নানাবিধ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাঁহাদের অভিভূত করিবার চেষ্টাও করিত। তখন তাপসগণ যজ্ঞকুণ্ডের ভস্ম সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া দার্শনিক চিন্তায় মনকে ব্যাপৃত রাখিবার প্রয়াস পাইতেন। ভাবিতেন, "যত সুন্দরীই হোক না কেন, উহার দেহ মাংসপিণ্ড মাত্র, দুর্গন্ধচর্মজড়িত, শত শত কৃমিপূর্ণ মূত্রবিষ্ঠালিপ্ত। উহা মৃত্যুর দ্বার, ওই মুখপদ্ম একদা দন্তসর্বস্ব করোটিতে পরিণত হইবে…।" এই ধরনের বিশুদ্ধ চিন্তার ফলে দানবদের স্বরূপ প্রকটিত হইয়া পড়িত, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা ছাড়া তখন তাহাদের গত্যন্তর থাকিত না। বস্তুত অনেক সময় ঊষাকালে অনেকে দেখিতে পাইত যে, কোনও রোরুদ্যমানা যুবতী তাপস-পল্লী হইতে ত্বরিতপদে পলায়ন করিতেছে। প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিত—"একজন তাপস আমাকে লাঠিপেটা ক'রে ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই আমি কাঁদছি।"

এই সব জ্ঞানবৃদ্ধ তাপসগণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। শুধু তাহাই নয়। পাপীদের সৎপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহারা সে শক্তি প্রয়োগ করিতেও ইতস্তত করিতেন না। অনেক সময় কঠোর শাস্তি বিধান করিতেন। এজন্য তাঁহাদের অভিশাপকে সকলে ভয় করিত। সকলেরই ধারণা ছিল, ইঁহাদের ক্রোধ উদ্রিক্ত করিলে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিবেই। মৃত্যুর পর অনন্ত নরকবাসও ঘটিতে পারে। সুতরাং সকলেই তাঁহাদের সমীহ করিয়া চলিত, বিশেষ করিয়া নট-নটীরা, নর্তক-নর্তকীরা এবং রূপজীবীরা। অনেকের এ ধারণাও ছিল যে, বনের পশুরাও নাকি এই সকল তপোবল-সম্পন্ন ঋষিদের সহায়ক। ঋষিদের আয়ু নিঃশেষ হইয়া গেলে বন্য ব্যাঘ্র বা সিংহ তাঁহাদের প্রাণহীন দেহটাকে মুখে করিয়া তুলিয়া কোনও পুণ্যতোয়া নদী-স্রোতে লইয়া গিয়া নাকি তাঁহাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিত।

কিছুকাল পূর্বে মহর্ষি কারণ্ডব তাঁহার দুই প্রিয় শিষ্য হংসপক্ষ এবং কঙ্কধীমানকে লইয়া কৈলাস ও মানসসরোবর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। আর ফিরেন নাই। তাঁহাদের মহাপ্রস্থানের পর সেই অরণ্য-ঋষি-সমাজে মাগধী ঋষি সাবর্ণিই সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্বী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সত্যই তাঁহার তপোবল অনন্যসাধারণ ছিল। মহর্ষি উপলচরিতের অনেক শিষ্য ছিল বটে, মহর্ষি বনস্পতিরও খ্যাতি কম ছিল না, কিন্তু উপবাস এবং কৃচ্ছ্রসাধনে মহর্ষি সাবর্ণিই অগ্রণী ছিলেন। দিনের পর দিন তিনি

নিরম্বু উপবাস করিতে পারিতেন, কর্কশ-রোম-নির্মিত একটি কম্বল ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও দেহাবরণেরও প্রয়োজন হইত না। দৈহিক এবং মানসিক কামনাকে বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় নিজ অঙ্গে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করিতেন। অনেক সময় দেখা যাইত, তিনি ধূলিতে উপুড় হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সাষ্টাঙ্গে যেন কোনও অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করিতেছেন।

তাঁহার চব্বিশটি শিষ্য ছিল। শিষ্যেরা গুরুদেবের কুটীরের আশে-পাশে ছোট ছোট কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন এবং গুরুর মহান আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইতেন। মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্নেহে আসক্তির লেশমাত্র ছিল না। শিষ্যদের যে উপদেশ তিনি দিতেন তাহার মূল কথা—বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতপ্ত হও। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকের বিগত জীবনে পাপের প্রাধান্যও ছিল। এমন লোকও ছিল যাহারা পূর্বে ডাকাতি করিত। মহর্ষি সাবর্ণির চারিত্রিক আদর্শ ও অমূল্য উপদেশে অনেক রত্নাকরই বাল্মীকিত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহাদের জীবন এত পবিত্র হইয়াছিল যে, তাহাদের সাহচর্য লাভ করিয়া অন্যান্য শিষ্যগণও নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। মধ্যপ্রদেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের এক পাচক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। দীক্ষার পর তাহার অনুতাপ এমন প্রবল হইল যে, সে সর্বদাই অশ্রুবিসর্জন করিত। আর একজন শিষ্য ছিলেন পণ্ডিত হরানন্দ। তিনি পণ্ডিত তো ছিলেনই, বক্তাও ছিলেন। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সাবর্ণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন

বোধ হয় বাঞ্ছারাম নামক কৃষকটি। তাঁহার সরলতার জন্য সকলে তাঁহাকে বালক বাঞ্ছা নামে ডাকিত। তাঁহার অতি সরলতার জন্য অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে উপহাস করিত বটে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। তাই মাঝে মাঝে বিস্ময়কর দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন।

ইঁহাদের লইয়া মহর্ষি সাবর্ণির সময় ভালই কাটিতেছিল। কখনও তপস্যায়, কখনও অধ্যাপনায়, কখনও বা শাস্ত্রপাঠে তিনি মগ্ন থাকিতেন। শাস্ত্রের জটিল রূপক ও দুরূহ শব্দার্থ তাঁহাকে প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিত। তিনি বয়সে তরুণ ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য যে সব দানব অন্য সন্ন্যাসীদের বিব্রত করিয়া তুলিত, সাবর্ণির নিকট তাহারা আসিতে সাহস পাইত না। রাত্রিকালে প্রায়ই দেখা যাইত, সাতটি শৃগাল তাঁহার কুটীরের অনতিদূরে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি যেন শুনিতেছে। অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ধারণা জন্মিয়াছিল, তপস্যা-প্রভাবে সাবর্ণি দানবকে শৃগালে রূপান্তরিত করিয়া ভৃত্যের মত কুটীরের সম্মুখে বসাইয়া রাখিয়াছেন।

পাটলীপুত্র নগরীতে এক ধনীগৃহে সাবর্ণি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সে যুগে ধনীপুত্রেরা সাধারণত যেরূপ বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতপালিত হইতেন তিনিও সেইরূপ হইয়াছিলেন। যে শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্রও ছিল না। যে সব সাহিত্য, কাব্য, নৃত্যগীত সে যুগে ধনীপুত্রদের চিত্তকে কলুষিত করিত তাহা

সার্বাণর চিত্তকেও একদা মলিন করিয়াছিল। এ সকল কথা স্মরণ করিলে অনুতাপে এখনও তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হয়, লজ্জায় তিনি অধোবদন হইয়া পড়েন। অন্যান্য তাপসদের তিনি গল্পচ্ছলে প্রায়ই বলিতেন, সে সময় তিনি যেন মিথ্যা আনন্দের উত্তপ্ত তৈলে কামনা-কটাহে ভাজা ভাজা হইতেন; অর্থাৎ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যে, নয়নলোভন মহার্ঘ পরিচ্ছদে, মদিরাক্ষী রমণীর আলিঙ্গনে নিজের অস্তিত্বকেই তিনি বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন কুড়ি বৎসর, তখন পর্যন্ত তাঁহার জীবনে এই সব ভয়াবহ কাণ্ড চলিতেছিল। মহর্ষি মঙ্গলমৌলির সাক্ষাৎ না পাইলে তিনি হয়তো অনন্ত নরকেরও অন্ত-সীমায় উপনীত হইতেন। মহর্ষি মঙ্গলমৌলি যখন তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন তখনই তিনি মনুষ্যজীবনের প্রকৃত স্বাদ পাইলেন, তখনই বুঝিলেন—আনন্দ কোথায়, সত্য কি এবং কোন্ পথে গেলে শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সন্ধানের আগ্রহ যেন তাহাকে পাইয়া বসিল। তিনি বলিতেন, একটা তীক্ষ্ণ তরবারির মতো তাহা যেন তাঁহার অন্তরে গাঁথিয়া গেল। দীক্ষা লইবার পর গুরুর আদেশে তিনি মহেশ্বরের উপাসনায় নিজেকে নিযুক্ত করিলেন। এক বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু মহাকালের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। একদিন এক শৈব যোগী তাঁহাকে বলিল—পার্থিব বিষয় ত্যাগ না করিলে মহেশ্বরের সাধনা সফল হয় না। মহেশ্বর মহাভিক্ষুক। প্রাসাদে বসিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এ কথা শুনিবার পর তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের দান করিয়া দিলেন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

দশ বৎসর তিনি অরণ্যবাস করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনে নিরত আছেন। মিথ্যা আনন্দের উত্তপ্ত তৈলে কামনা-কটাহে ভর্জিত হইবার সুযোগ আর নাই। পুরাতন ক্ষতগুলিতে অনুতাপ-ঔষধি লেপন করিয়া বিমল আনন্দই তিনি উপভোগ করেন। কিন্তু অতীতের ওই অপবিত্র কামনাক্লিন্ন দিনগুলির কথা কিছুতেই তিনি ভুলিতে পারেন না। প্রায়ই সে সব কথা মনে পড়ে।

…একদিন তিনি এই অতীত জীবনের কথা, তাঁহার পশু-জীবনের কথা ভাবিতেছিলেন। বিশ্লেষণ করিতেছিলেন, কি কি দোষ কি ভাবে তাঁহার জীবনে আসিয়া কি ভাবে তাঁহাকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল। সহসা নিরঞ্জনার কথা মনে পড়িল।—অভিনেত্রী নিরঞ্জনার কথা। শুধু নিপুণা নর্তকী নয়, অপরূপ রূপসী ছিল সে। যখন সে নৃত্য করিত তখন দর্শকদের চিত্তে ঝড় বহিত, তুফান জাগিত, কামনার শিখা লেলিহান হইয়া উঠিত। আকুল হইয়া পড়িত সকলে—প্রমত্ত যুবক, স্থবির ধনী, স্বল্পবৃত্ত প্রৌঢ় সকলেই। নিরঞ্জনা সকলকেই লালায়িত করিয়া তুলিত, ফুলের মালা লইয়া সকলেই ছুটিত তাহার গৃহের উদ্দেশে, গৃহের বদ্ধদ্বারের সম্মুখে মাল্য-অর্ঘ্য দান করিয়াই অনেকে তৃপ্তিলাভ করিত। তাহার প্রদীপ্ত যৌবনের অন্তরালে ছিল পাপ। সে পাপ তাহার আত্মাকে তো মলিন করিয়াইছিল, যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহারাও কলুষিত হইয়াছিল।

সাবর্ণিও তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। তখন কতই বা তাঁহার বয়স? তখনও তিনি কিশোর। সেই কিশোর-বয়সেই নিরঞ্জনা

তাঁহার অন্তরে কামনা-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল। তিনি তাহার গৃহের দ্বার পর্যন্ত গিয়াছিলেন, আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার সাহস হয় নাই, আশঙ্কা হইয়াছিল নিরঞ্জনা হয়ত তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিবে। তখন তাঁহার কতই বা বয়স? মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ। ভগবানই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন কিন্তু তাঁহার এ কথা মনে হয় নাই। তখন পাপপুণ্যবোধই ছিল না তাঁহার। কিসে নিজের হিত হয়, কিসে অহিত হয় তাহা তিনি বুঝিতেন না।

···নিজের নির্জন কুটিরে যে শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গটি ছিল, তাহারই সম্মুখে তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কামনা-বাসনারই নানা কাল্পনিক চিত্র তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নিজের ভাগ্য-দেবতাকে তিনি বারম্বার প্রণাম করিলেন—কি ভয়ঙ্কর গহ্বরের মুখ হইতেই না তিনি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন! প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলেন। প্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল। যখন চক্ষু খুলিলেন তখন মনে হইল, শিবলিঙ্গের পিছনে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। পার্বতী না কি! কিন্তু পরক্ষণেই চিনিতে পারিলেন—নিরঞ্জনা! ঠিক তেমনি সুন্দরী, দশ বৎসর পূর্বে যেমন দেখিয়াছিলেন। হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং পর-মুহূর্তেই আবার দেখা দিল উর্বশীর বেশে। পাটলিপুত্র নগরীর এক প্রমোদাগারে দশ বৎসর পূর্বে নিরঞ্জনাকে তিনি উর্বশীর বেশে দেখিয়াছিলেন মনে পড়িল। ঠিক সেই দৃশ্যটিই আবার যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। বিশাল সমুদ্রের তরঙ্গ-হিল্লোলে উর্বশী যেন দুলিতেছে, আর দুলিতেছে তাহার কম্বুগ্রীবা, লীলায়িত বাহুযুগল,

পীবর স্তনদ্বয়। নয়নে বিলোল কটাক্ষ, আবেগভরে নাসার অগ্রভাগ কম্পিত হইতেছে, ঈষৎ ব্যায়ত আননের ফাঁকে মুক্তার সারির মতো দন্তগুলি দেখা যাইতেছে। ললাটে করাঘাত করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

বলিতে লাগিলেন, "ভগবান ভূতনাথ, এ কি দেখিতেছি! এ যে আমারই কামনার কদর্য মূর্তি!"

উর্বশীর মুখভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিল। তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, সে যেন কোনও নিগূঢ় বেদনায় কাতর হইয়া পড়িতেছে,—তাহার নয়নের দীপ্তি যেন অশ্রুজলে নিবিয়া আসিতেছে, মনে হইতেছে যেন ঝটিকা আসন্ন। নিরঞ্জনার এই মূর্তি সাবর্ণিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। নতজানু হইয়া তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"হে ভগবান, প্রভাতে তৃণদলের উপর শিশিরবিন্দুর মতো আমাদের অন্তরে তুমি করুণা দিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি। কিন্তু হে দেবাদিদেব, যে করুণা পাপকে প্রশ্রয় দেয়, আমার অন্তর হইতে তুমি সে করুণা অবলুপ্ত করিয়া দাও। আমাকে শক্তি দাও, তোমার মধ্যেই যেন আমি সকলকে ভালবাসিতে পারি, কারণ তুমি ছাড়া আর সবই নশ্বর। তোমারই সৃষ্টি বলিয়া এই নারী আমার অনুকম্পার পাত্রী, সম্ভবত স্বর্গের দেব-দেবীরাও ইহার অধঃপতনে করুণার্দ্র। নিরঞ্জনার মতো অনবদ্য সৃষ্টি কি তোমার স্নেহপাত্রী নয়? কিন্তু পরিচিত-অপরিচিত-নির্বিশেষে সকলে যে উহাকে কলঙ্কিত করিয়া দিতেছে, তোমার এমন সুন্দর সৃষ্টিটিকে এমন ভাবে কলুষিত হইতে দেওয়া কি উচিত? উহার জন্য আমার অন্তর বিগলিত হইয়া যাইতেছে। যে পাপে সে

লিপ্ত তাহা জঘন্য—এ কথা চিন্তা করিলেও আতঙ্কে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কিন্তু সে পাপীয়সী বলিয়াই কৃপাপাত্রী। তাহার পাপের মাত্রা বেশি বলিয়াই বেশি করুণা সে দাবী করিতে পারে। নিদারুণ পাপের জন্য তাহাকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে—এ কথা চিন্তা করিলে আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না...”

প্রার্থনা শেষ করিয়া সাবর্ণি অনেকক্ষণ মুদিতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত। দেখিলেন, একটি শিবলিঙ্গের সম্মুখে একটি কৃষ্ণকায় বানর বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র বানরটি দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করিল। সাবর্ণি বিস্মিত হইয়া গেলেন। বানর কোথা হইতে আসিল? কুটীরের দ্বার তো বন্ধ ছিল!...সাবর্ণি বুঝিলেন, কোনও মায়াবী মার নিশ্চয়ই তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিল। তিনি শিবলিঙ্গের সম্মুখে পুনরায় প্রণত হইলেন এবং পুনরায় নিরঞ্জনার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, “হে শঙ্কর, হে নীলকণ্ঠ, তুমি যদি আমাকে শক্তিদান কর, নিরঞ্জনাকে ঐ পঙ্ককুণ্ড হইতে আমি উদ্ধার করিবই...”

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি প্রবীণ মহর্ষি শুভঙ্করের নিকট গেলেন। মহর্ষি শুভঙ্কর কিছুদূরে এক খণ্ড বিস্তীর্ণ জমির উপর কুটীর নির্মাণ করিয়া তাপস-জীবন যাপন করিতেন। কৃষিকর্মে তাঁহার আগ্রহ ছিল। সাবর্ণি দেখিলেন, শুভঙ্কর নিজের বাগানে কি যেন খুঁড়িতেছেন! বৃদ্ধ শুভঙ্করের কুটীর-সংলগ্ন ছোট একটি বাগান ছিল। বাগানটি লইয়াই তিনি সারাদিন কাটাইতেন।

সকলে বলিত, শুভঙ্কর এত ভাল লোক যে বনের পশুরাও নির্ভয়ে তাঁহার কাছে আসে, ভূত প্রেত বা শয়তান তাঁকে বিব্রত করে না। সদাহাস্যমুখ প্রসন্নচিত্ত লোক তিনি। তিনিও সাবর্ণির মতো শিবের উপাসক। পরামর্শ করিবার জন্য সাবর্ণি তাঁহার নিকট গেলেন।

মহর্ষি সাবর্ণিকে শুভঙ্কর হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করিলেন।

"জয় শঙ্কর! সব কুশল তো?"

"জয় শঙ্কর! ভালই আছি আপনার কৃপায়। আশা করি, আপনারও সব মঙ্গল।"

কপালের ঘাম মুছিয়া শুভঙ্কর হাস্যমুখে বলিলেন, "মঙ্গলের অভাব তো দেখি না। তারপর আর সব খবর কি?"

"আমাদের আর খবর কি থাকতে পারে বলুন? তাঁর খবরই একমাত্র খবর, তাঁর খবরই নানাভাবে আলোচনা ক'রে আমরা ধন্য। তাঁরই মহিমার একটা দিক প্রকট করবার আশায় আপনার কাছে এসেছি—"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

সাবর্ণি বলিলেন, "একটা পরামর্শ করতে এসেছি আপনার সঙ্গে। আজ আমার অন্তরে সহসা একটি কল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছে।"

"মহেশ্বর কৃপা বর্ষণ ক'রে আমার শাকের ক্ষেতটিকে শ্রীসম্পন্ন করেছেন, তোমার কল্পনার অঙ্কুরটিকেও তেমনি শ্রীমণ্ডিত করবেন সন্দেহ নেই। তাঁর কৃপার কি অন্ত আছে? রোজ সকালে উঠেই তাঁর কৃপা প্রত্যক্ষ করি, প্রতি তৃণখণ্ডে শিশিরবিন্দু ঝলমল করছে। আমার বাগানের শশায় কুমড়োয় দেখি তাঁর মহিমা। আমি রোজ কেবল প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের এই সহজ

শান্তিটুকু যেন বজায় রাখেন, আর কিছু চাই না। কারণ চারিদিকে কামনা-বাসনার যা দাপট দেখি তাতে ভয় হয়। উদ্দাম কামনার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর তো কিছু নেই। কামনার পাল্লায় পড়লে ঠিক মাতালের মতো অবস্থা হয়, সোজা হয়ে চলতে পারি না। কখনও ডাইনে হেলি, কখনও বাঁয়ে হেলি, সর্বদাই পড়-পড় ভাব। কামোন্মত্ত অবস্থায় এক ধরনের আনন্দ হয় বটে, কিন্তু কামুকের সে আনন্দ শয়তানের হাসির খোরাক জোগায় খালি। সে আনন্দ মনকে পবিত্র করে না, বুদ্ধিভ্রংশ করে কেবল। আর একটা মজা কি জান? ওই কামনা দুঃখের রূপ ধ'রেও আসে কখনও কখনও, সে আরও ভয়ঙ্কর। ভাই সাবর্ণি, আমি বুদ্ধিমান নই, তপস্বীও নই, আমার পাপেরও সীমা নেই। কিন্তু আমার সুদীর্ঘ জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি। একটি অভিজ্ঞতা হচ্ছে—দুঃখের চেয়ে বড় শত্রু আমাদের আর নেই। দুঃখের অনুভূতি কুয়াশার মতো সমস্ত আত্মাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, আলোর পথ রোধ করে। তখন আমরা অসহায় হয়ে পড়ি, সর্বদাই যেন ভয় ভয় করে। যে কুবুদ্ধি, যে মার আমাদের বিব্রত করবার জন্যে সর্বদা ওত পেতে আছে, সে সর্বদা চেষ্টা করে সাধুদের হৃদয়কে বিষাদাচ্ছন্ন ক'রে দিতে। কারণ সাধুদের অন্তরে দুঃখের কালো ছায়া ফেলতে পারলেই তার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। কামনার মোহিনীরূপ দেখিয়ে সে আমাদের তত কাবু করতে পারে না, যত পারে আমাদের মনে দুঃখ জাগিয়ে। তার ছলনার তো অন্ত নেই। মহর্ষি কারগুবের মতো সাধু পর্যন্ত নাকাল হয়ে পড়েছিলেন। একটা কালো শিশুর জন্য অশ্রু বিসর্জন পর্যন্ত করতে হয়েছিল তাঁকে। শঙ্করের কৃপায় অবশেষে

তিনি নিস্তার পান। তিনি যতদিন এখানে ছিলেন আমি তাঁর সাহচর্য লাভ ক'রে ধন্য হয়েছি। সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, শিষ্যদের সর্বদা আনন্দে রাখতেন, দুঃখকে হতাশাকে আমলই দিতে চাইতেন না। ওঁর মতো লোকও দুঃখের কবলে প'ড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কথায় কথায় আসল কথাটাই চাপা প'ড়ে গেছে। শঙ্করের মহিমা প্রকট করবার জন্যে কি একটা পরামর্শ তুমি আমার কাছে চাইতে এসেছ, বললে না? কি পরামর্শ? কি কল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছে তোমার মনে? শঙ্করের মহিমা-প্রচার করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করব। সানন্দে করব। ক'রে কৃতার্থ হব। ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

সাবর্ণি বলিলেন, "শঙ্করের মহিমাকে উজ্জ্বলতর করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনি জ্ঞানী, পাপ কখনও আপনার বুদ্ধিকে ম্লান করে নি, তাই আপনার পরামর্শ পেলে আমি নির্ভয় হব।"

শুভঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সাবর্ণি, তোমার পাদুকা স্পর্শ করবার যোগ্যতাও আমার নেই। তুমি জ্ঞানে তপস্যায় আমার চেয়ে অনেক বড়। আমার জীবন পাপে পরিপূর্ণ, মরুভূমি যেমন বালুকণায় পরিপূর্ণ। তবে আমি বৃদ্ধ হয়েছি, অভিজ্ঞতা দিয়ে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি।"

"ব্যাপারটা শুনুন তা হ'লে। পাটলিপুত্র গ্রামে নিরঞ্জনা নামে একটি তরুণী আছে। সে রূপজীবিনী, কলুষিত জীবনযাপন ক'রে সমাজকে কলঙ্কিত করছে সে। তার কথা ভেবে আমি বড়ই বিষণ্ণ হয়েছি।"

"বিষণ্ণ হবারই তো কথা। শহুরে সমাজে অনেক স্ত্রীলোকেরই

ওই দশা। তুমি কি ওদের উদ্ধার করবার কোন উপায় ঠাউরেছ ?”

“মহর্ষি, ঠিক করেছি, পাটলিপুত্রে গিয়ে আমি নিরঞ্জনাকে খুঁজে বার করব এবং শঙ্কর যদি আমার সহায় হন পাপের পঙ্ক থেকে তাকে তুলে সৎপথে নিয়ে আসব। এই আমার সঙ্কল্প। এতে আপনার সম্মতি আছে আশা করি।”

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শুভঙ্কর বলিলেন, “দেখ ভাই সাবর্ণি, গোড়াতেই তোমাকে বলেছি আমি স্বল্পবুদ্ধি লোক। পাপও জীবনে অনেক করেছি। এ বিষয়ে মতামত দেবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু মহর্ষি কারণ্ডব একটা কথা বলতেন মনে পড়ছে। তিনি বলতেন—যেখানেই তুমি থাক না কেন, সে জায়গাটি চট ক’রে ছেড়ো না।”

“আমার এ সঙ্কল্পের মধ্যে আপনি কি মন্দের কোনও আভাস পাচ্ছেন মহর্ষি ?”

“কারও কোনও সঙ্কল্পের মধ্যে মন্দ অভিপ্রায় আবিষ্কার করবার মতো বুদ্ধি শঙ্কর আমাকে দেন নি। মহর্ষি কারণ্ডব আর একটা কথা বলতেন, মনে পড়ছে। সেটাও শোন। তিনি বলতেন—মাছকে ডাঙায় তুললে সে ম’রে যায়। সন্ন্যাসীরা যদি নিজের গুহা বা আশ্রম ছেড়ে সংসারের লোকের সঙ্গে মেশেন তাঁদেরও দুর্গতি হয়।”

এই কথাগুলি বলিয়া তিনি পুনরায় মাটি কোপাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি ডুমুর গাছের গোড়ার মাটি তিনি আলগা করিতেছিলেন। সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন, উড়ুম্বর বৃক্ষটি ফলভারনম্র, প্রতি শাখায় অজস্র ফল ধরিয়াছে। শুভঙ্করের কথার উত্তরে তিনি

কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না। একটি বন্য হরিণ একলম্ফে বেড়া ডিঙাইয়া বাগানে প্রবেশ করিল, কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর আরও দুই লম্ফে মহর্ষি শুভঙ্করের নিকট আসিয়া তাঁহার অঙ্গে মাথা ঠেকাইতেই তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর স্নেহভরে বলিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, কি মতলবে এসেছ। চল, দিচ্ছি। জয় শঙ্কর, জয় ত্রিলোচন—"

কোদাল রাখিয়া তিনি কুটীর অভিমুখে গেলেন, হরিণটিও তাঁহার পিছু পিছু গেল। কুটীরের ভিতর হইতে তিনি কয়েকখানা যবের রুটি বাহির করিয়া আনিলেন। হরিণটি তাঁহার হাত হইতেই সেগুলি খাইতে লাগিল।

মৃত্তিকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন। শুভঙ্করের সহিত আর আলোচনা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি যাহা শুনিলেন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে নিজের কুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

তাঁহার মনে হইল, মহর্ষি শুভঙ্কর অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। প্রকৃত জ্ঞান তাঁহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ তিনি আমার এ সঙ্কল্পে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। আশ্চর্য! নিরঞ্জনাকে কামনা-রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা না করাটা কি অসঙ্গত হইবে না? এতবড় হৃদয়হীন হওয়া কি উচিত? না, আমি তাহা পারিব না। ভগবান শঙ্কর আমার সহায় হোন, তাঁহার নির্দেশ সম্বল করিয়াই আমি যাত্রা করিব।

...সাবর্ণি স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিবেন। চলিতে

চলিতে একটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পথের ধারে তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি টিট্টিভ পক্ষী শিকারীর জালে ধরা পড়িয়া ছটফট করিতেছে। নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, পক্ষী নয়, পক্ষিনী। আর আশ্চর্য ব্যাপার, পুরুষ পক্ষীটি উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া ঠোঁট ও নখের সাহায্যে জালটি ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েকবার চেষ্টার পর অবশেষে সত্যই সে জালের খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। সাবর্ণির মনে হইল, ওই ছিদ্র দিয়া তাহার সঙ্গিনী এইবার অনায়াসে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। এই দৃশ্য মহর্ষি সাবর্ণির চিত্তে যে মহতী কল্পনা উদ্রিক্ত করিল তাহা তাঁহার মতো সাধু ব্যক্তির চিত্তেই উদ্ভবযোগ্য। এই দৃশ্যে তিনি যেন একটি রূপককে মূর্ত দেখিলেন। তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন, ওই পক্ষিনীই নিরঞ্জনা, কামনার জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আর ওই পুরুষ পক্ষীটি যেমন নখ চঞ্চু দ্বারা জাল ছিন্ন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাকেও তেমনি উপদেশ দ্বারা ওই অদৃশ্য কামনাজাল ছিন্ন করিয়া নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই দৃশ্য তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। তিনি চক্ষু বুজিয়া মনে মনে ইষ্টদেবতা শঙ্করকে স্মরণ করিবার পর তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অন্তরে আশঙ্কারও ছায়াপাত হইল। তিনি দেখিলেন, জালের জটিলতায় পক্ষিনীর পায়ের নখগুলি এমন আটকাইয়া গিয়াছে যে, ছিদ্র সত্ত্বেও সে বাহির হইতে পারিতেছে না।

সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না। অতি প্রত্যুষে তাঁহার নয়নে এক অলৌকিক দৃশ্য প্রতিভাত হইল। তিনি

দেখিলেন, নিরঞ্জনা যেন আসিয়াছে। তাহার মুখভাবে কামনা বা লালসার কোনও চিহ্ন নাই, পোশাক-পরিচ্ছদেও অতি স্বচ্ছ ঘাগরা বা ওড়নার অভব্যতা নাই। একটা ঘনকৃষ্ণ আচ্ছাদনে তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত, মুখেরও খানিকটা ঢাকা রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে কেবল অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটি।....মহর্ষি সাবর্ণিও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অভাবিত ঘটনার মধ্যে যে ভগবান দেবাদিদেবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আভাসিত হইয়াছে ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই দৃশ্য তাঁহাকে যেন দ্বিধামুক্ত করিল। ভগবান শঙ্করের প্রতীক ত্রিশূলটি হস্তে লইয়া তিনি কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার নিকট বহু দুষ্প্রাপ্য শিবস্তোত্র ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যাহাতে সেগুলি নষ্ট হইয়া না যায় সেজন্য তিনি কুটীরদ্বার ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর প্রতিবেশী সাধু ভূমানন্দকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার উপর নিজ শিষ্যগণের ভার অর্পণ করিলেন। সমস্ত সারিয়া গৈরিকমাত্র সম্বল করিয়া তিনি যাত্রা করিলেন গঙ্গানদীর উদ্দেশে। পাটলিপুত্র গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গঙ্গানদীকে অনুসরণ করিলেই তিনি পাটলিপুত্রে পৌঁছিয়া যাইবেন, পথ ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়া অতিশয় দ্রুতবেগে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না, দৈহিক ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া তিনি ধূলিকঙ্করময় পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কিছুদূর গিয়া অবশ্য তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ক্লান্তিও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তিনি হাঁটিতেই লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী

হইল। সমস্ত দিন পথ চলিবার পর সন্ধ্যার পূর্বে তিনি গৈরিকবর্ণা গিরিকন্যার দর্শন লাভ করিলেন। তরঙ্গমুখরা গঙ্গানদীর তীরে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া গেল। মর্ত্যে অবতরণকালে ব্রহ্ম-কমণ্ডলু হইতে উচ্ছলিত হইয়া জাহ্নবী যে শিবের জটাজালে নিপতিত হইয়াছিলেন—এই পৌরাণিক কাহিনী তাঁহার মনে পড়িল। তিনি জানু পাতিয়া গঙ্গাস্তব করিতে লাগিলেন। করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, দেবি, তোমার স্পর্শে ভস্মীভূত সগরবংশ নবজন্ম লাভ করিয়াছিল, আশীর্বাদ কর ভগবান নীলকণ্ঠের প্রভাব নিরঞ্জনাকেও যেন নবজন্ম দান করে। মহেশ্বরের কৃপায় আমি যেন তাহাকে মুক্ত করিতে পারি, মহেশ্বরের মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। প্রার্থনা শেষ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং আবার হাঁটিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি নদীতীরবর্তী এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামে ঢুকিয়া কিন্তু তিনি যখন ভিক্ষা করিতে গেলেন তখন অনেকেই তাঁহাকে তাড়া করিয়া আসিল। গৃহস্থদের এরূপ ব্যবহারে তিনি প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন এটি বৌদ্ধ গ্রাম। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বহু লোক তখনও এ দেশে ছিল, তাহারা নিজেরাই অধঃপতিত হইয়াছিল—বৌদ্ধধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের নামে বৈষ্ণব, শৈব বা বেদপন্থী সন্ন্যাসীদের নির্যাতন করিতে তাহারা ছাড়িত না। গৃহস্থদের অভদ্র আচরণ দেখিয়া মহর্ষি সাবর্ণি স্থির করিলেন, কোনও গ্রামের ভিতর তিনি আর প্রবেশ করিবেন না। তাঁহার মনে হইল, গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামবাসীদের দুর্ব্যবহারই কেবল যে তাঁহাকে বিপন্ন করিবে তাহা

নয়, পথে ক্রীড়ারত বালকেরাও হয়তো দল বাঁধিয়া তাঁহার পিছু লইবে, কিংবা কূপের নিকট সমবেত যুবতীগণের বিলোল কটাক্ষ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিবে। তাঁহার মনে হইল, সমাজের সংস্পর্শ ই কলুষময়, কি যে কখন ঘটিবে কিছুই বলা না। সুতরাং গ্রাম এবং শহর যথাসম্ভব এড়াইয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা আসিলে শ্মশানে গিয়া রাত্রি যাপন করিতেন এবং শ্মশানবিলাসী শঙ্করের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

এই ভাবে ছয় দিন হাঁটিবার পর তিনি পর্বতমালাবেষ্টিত এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাঁহার নয়নগোচর হইল। দেখিলেন, পর্বতগাত্রে নানা ভঙ্গীর বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এক পর্বতের পাদদেশে বিরাটাকার এক ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ মূর্তিটির দিকে তিনি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার অন্তরে এক অদ্ভুত আশঙ্কার উদয় হইল। মনে হইল, কোনও মন্ত্রবলে এই বিরাট পুরুষ সঞ্জীবিত হইয়া যদি তাঁহাকে আক্রমণ করে! দুরাচার পিশাচসিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা কোথাও আত্মগোপন করিয়া নাই তো! সুযোগ পাইলে শৈব সন্ন্যাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেও যে তাহারা ইতস্তত করে না, এ ধরনের সংবাদ তিনি অনেক শুনিয়াছিলেন। সেই নির্জন গিরিবেষ্টিত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহার ভয় করিতে লাগিল। তিনি জানু পাতিয়া বসিয়া শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঐকান্তিকভাবে শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিলে যে সর্বপ্রকার বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়—এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। কিছুক্ষণ শিব-স্তোত্র আবৃত্তি করার পর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বিরাট

বুদ্ধমূর্তির পিছন হইতে একটা বিরাট বাদুড়ছানা ঝটপট করিয়া উড়িয়া গেল। সাবর্ণির মন হইল, শিবস্তোত্রের প্রভাবে বুদ্ধমূর্তি বুঝি পাপমুক্ত হইল। বৈদিক ধর্মের বিরোধিতা করিয়া এই রাজপুত্র যে পাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন শিবনামের গুণে তাহাই বোধ হয় বাদুড় রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া গেল। সহসা তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। সনাতন হিন্দু-ধর্মকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া লোকটা দেশের কি অনিষ্টই না করিয়াছে! তিনি আগাইয়া গেলেন এবং একটি প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া মূর্তিটির দিকে নিক্ষেপ করিলেন। প্রস্তরটি মূর্তির কপালের মাঝখানে গিয়া আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। মহর্ষি সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন, মূর্তি যেন সজীব হইয়া উঠিতেছে, তাহার মুখভাব পরিবর্তিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, মনে হইতে লাগিল এখনই বুঝি চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িবে। সেই বিরাট মূর্তির বিরাট মুখমণ্ডলে এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সাবর্ণির হৃদয় করুণার্দ্র হইল। আর একটু আগাইয়া গিয়া মূর্তিকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, আশা করি তুমি এবার হৃদয়ঙ্গম করেছ যে, দেবদেবীবর্জিত ধর্মপ্রচার করলে সমাজের কি অনিষ্ট হয়। শিবনাম উচ্চারণে তোমার পাপ স্খালন কর। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। শিবনাম ক'রে তুমি পাপমুক্ত হও—"

সাবর্ণির মনে হইল, বুদ্ধমূর্তির চক্ষুদ্বয় যেন আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, চক্ষুপল্লব যেন ঈষৎ কম্পিত হইল, তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিভিন্ন হইয়া গেল, মনে হইল সত্যই যেন সে শিব-নাম উচ্চারণ করিতেছে।

মহর্ষি সাবর্ণি তখন দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সেই প্রস্তর-মূর্তিকে পুনরায় আশীর্বাদ করিলেন। আবার পথ চলা শুরু হইল।

আরও কিছুদূর যাইবার পর তিনি এক বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিকে বহু ভগ্ন প্রাসাদ, প্রাকার ও মন্দির রহিয়াছে। যে সব মন্দির তখনও ভূমিসাৎ হয় নাই, সাবর্ণি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেইগুলিকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্দির মধ্যে কোনও দেব-দেবীর বিগ্রহ নাই। একটি মন্দিরে আলিঙ্গন-বদ্ধ একটি নর-নারীর প্রস্তর মূর্তি রহিয়াছে। নারীটির দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন, পুরুষটির নাসিকাগ্র নাই। মন্দিরগাত্রেও দেখিলেন, বহু অশ্লীল চিত্র খোদিত রহিয়াছে—নগ্ন রমণী, নগ্ন পুরুষ, মৈথুনরত নর-নারী জীব-জন্তু ছাড়া অন্য কোনও চিত্রই নাই। তাঁহার মনে হইল, প্রতিটি মূর্তি যেন তাঁহাকেই নির্নিমেষে দেখিতেছে। পুনরায় তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, সম্ভবত কোনও শক্তিশালী হিন্দুরাজা অধঃপতিত বৌদ্ধদের এই সব লালসা-উদ্দীপক কাম-চিত্রগুলিকে অবলুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্যকরূপে কৃতকার্য হন নাই ভগ্ন বিধ্বস্ত হইয়াও ইহারা এখনও কাম-লীলা প্রকটিত করিতেছে।

এই ভাবে তিনি সপ্তদশ দিবস নানারূপ কুৎসিত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পথ অতিবাহন করিলেন। শিবমন্ত্রের বর্মে আবৃত ছিলেন বলিয়াই সম্ভবত তাঁহার আর কোনরূপ বিপদ ঘটিল না।

অষ্টাদশ দিবসে এক গ্রামের বাহিরে তিনি তালপত্রনির্মিত একটি কুটীর দেখিতে পাইলেন। কুটীরটি তাঁহার অন্তরে পুলক

সঞ্চার করিল। কারণ কুটীরটির ভগ্নদশা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এটি নিশ্চয়ই কোন সংসার-বিরাগী সাধুর কুটীর। কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া তিনি কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আশা হইল, হয়তো কোনও শৈব সন্ন্যাসীরই সাক্ষাৎ পাইবেন। সমীপবর্তী হইয়া লক্ষ্য করিলেন, কুটীরে দ্বার বা বাতায়ন নাই, চতুর্দিকেই খোলা কয়েকটি বংশদণ্ডের উপর চালটি কোনক্রমে টিকিয়া আছে। ঘরের মেঝেতে রহিয়াছে কয়েকটি বেল, একটি মাটির কলসী এবং তৃণশয্যা।

সাবর্ণি স্বাগতোক্তি করিলেন, "বেল যখন রয়েছে তখন নিশ্চয় কোন শিবভক্তের আস্তানা এটি। কিন্তু গেলেন কোথা ভদ্রলোক? দেখা হ'লে দুজনে মিলে শিবনাম করতাম খানিকক্ষণ। শিবের দয়া হ'লে আহারেরও ব্যবস্থা হয়ে যেত হয়তো। ভদ্রলোক শিবের নামে বিল্বফল উৎসর্গ ক'রে আমাকে একটু প্রসাদ কি আর না দিতেন! কোথা গেলেন তিনি? একটু সন্ধান করি—"

তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। একটু আগাইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, গঙ্গার তীরে পদ্মাসনে এক ঋজু-দেহ ব্যক্তি বসিয়া আছেন। আরও কাছে গিয়া দেখিলেন, লোকটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। চুল ও দাড়ি একেবারে শুভ্র, গায়ের রঙ গাঢ় রক্তবর্ণ। সাবর্ণির সন্দেহ রহিল না যে, ইনিই সেই সন্ন্যাসী। যথারীতি সম্ভাষণপূর্বক সাবর্ণি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্র, ভগবান শঙ্কর আপনার মঙ্গল করুন। তাঁহার করুণা আপনাকে অক্ষয় আনন্দের অধিকারী করুক—"

লোকটি কিন্তু কোনও উত্তর দিল না। এমনভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল যেন কোনও কথাই শুনিতে পায় নাই। সাবর্ণির

সহসা মনে হইল, হয়তো বা সন্ন্যাসী সমাধিস্থ হইয়া আছেন। আর উচ্চবাচ্য না করিয়া তিনিও করজোড়ে নতজানু হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং শিব-প্রার্থনায় নিরত হইলেন। অনেকক্ষণ কাটিল। ক্রমশ সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু ওই উলঙ্গ রক্তবর্ণ সাধুর কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না।

সাবর্ণি সসঙ্কোচে পুনরায় বলিলেন, "প্রভু, আপনার যদি ধ্যানভঙ্গ হয়ে থাকে আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি আপনার মতো শিবভক্ত হতে পারি।"

এইবার ফল ফলিল।

ঘাড় না ফিরাইয়াই লোকটি উত্তর দিল, "আগন্তুক, তোমার কথার কোন অর্থবোধ হচ্ছে না। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব কেন, তোমার এই শিবই বা কে?"

মহর্ষি সাবর্ণি শিহরিয়া উঠিলেন।

"সে কি! আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের শিবনাম শোনেন নি—এ কি সম্ভব?"

"খুবই সম্ভব। পৃথিবীতে ধ্রুব সত্য ব'লে কিছু নেই, তা না হ'লে বলতাম ধ্রুব সত্য।"

মহর্ষি সাবর্ণি লোকটির নিদারুণ অজ্ঞতায় মর্মাহত হইলেন।

"আপনি কি ভারতবাসী?"

"ভারতবর্ষে যখন জন্মেছি, তখন ভারতবাসী বইকি।"

"অথচ আপনি মহাকাল ত্রিলোচনের নাম শোনেন নি! মৃত্যুর পর অনন্ত সুখময় জীবন লাভ করবার ইচ্ছা কি আপনার নেই? দেবাদিদেবের মহিমা উপলব্ধি না করলে সবই যে বৃথা—এ কথা তো প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা উচিত।"

"আমার মনে হয় সবই বৃথা। জন্ম-মৃত্যুও আমার কাছে সমান।"

"বলেন কি! অনন্ত স্বর্গ লাভ করবার ইচ্ছে আপনার নেই? আপনার ওই কুটীর আর আপনার ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখে আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি সন্ন্যাসী।"

"আপনার ধারণা ভুল না হতে পারে।"

"আপনি উলঙ্গ। এর থেকে মনে হয় আপনি সর্বত্যাগী।"

"হতে পারে।"

"আপনার ঘরে মাত্র কয়েকটি বেল দেখলাম। তাই মনে হ'ল হয়তো আপনি ফলাহারী ব্রহ্মচারী।"

"তাও না হয় হ'ল। তাতে কি হয়েছে?"

"তার মানে, আপনি জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য আড়ম্বর ত্যাগ করেছেন।"

"লোকে সাধারণত যে সব জিনিসকে ঐশ্বর্য ব'লে মনে ক'রে বৃথা আস্ফালন আড়ম্বর করে, তা আমি ত্যাগ করেছি।"

"তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আপনি আমারই মতো দরিদ্র, আমারই মতো নির্মলচরিত্র, এক কথায় আমারই মতো সন্ন্যাসী। কিন্তু আপনি মহাদেবের নাম পর্যন্ত শোনেন নি—এ বড় আশ্চর্য ঠেকছে আমার কাছে। ইহলোকের ঐশ্বর্যসম্ভার ত্যাগ ক'রে দারিদ্র্য-পীড়িত বঞ্চিত জীবন যাপন করবার সার্থকতা কি, যদি পরলোকে অনন্ত সুখশান্তি পাওয়ার আশা না থাকে?"

"আগন্তুক, আমি নিজেকে একটুও পীড়িত বা বঞ্চিত ব'লে মনে করি না। যে জীবনদর্শন আমি আবিষ্কার করেছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি, সূক্ষ্ম বিচার ক'রে তাকে ভাল বা মন্দ কোনও

পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টাই আমি করি নি। পৃথিবীতে কিছুই ভাল বা মন্দ নয়। সম্মানজনকও কিছু নেই। ন্যায়-অন্যায়ও আমাদের সৃষ্টি। আমরা নিজেরাই গুণ বা দোষ আরোপ ক'রে প্রত্যেক জিনিসকে স্বধর্মভ্রষ্ট করি—মসলা যেমন ব্যঞ্জনের প্রকৃত স্বাদকে বিকৃত করে।"

"তা হ'লে আপনার মতে সত্য ব'লে কিছু নেই? দেখছি, সামান্য প্রতিমা-উপাসকেরাও যে ধ্রুবের সন্ধান করেন, সে সম্বন্ধেও আপনি অজ্ঞ। আপনি দার্শনিক, না, পশু তা বুঝতে পারছি না। সন্দেহ হচ্ছে পশুর মতোই আপনি অজ্ঞতার কর্দমে নিমজ্জিত রয়েছেন।"

"পশু বা দার্শনিককে গাল দেওয়া বৃথা। পশু যে কি তা আমরা জানি না, আমরা নিজেরা যে কি তাও জানি না। কিছু জানি না আমরা—"

"নাস্তিক ব'লে এক অদ্ভুত সম্প্রদায় আছে শুনেছি। আপনি কি সেই দলের নাকি! তারা কিছুই মানে না। গতিও না, স্থিতিও না। দিনের আলো, রাতের অন্ধকার দুইই তাদের কাছে সমান।"

"বন্ধু, আমি নাস্তিকই। নাস্তিকের মতবাদ তোমার কাছে হয়তো হাস্যকর, কিন্তু আমার কাছে নয়। আমি বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ দেখি। বিরাট মন্দির প্রভাতের স্বর্ণকিরণে ঝলমল করে, আবার সান্ধ্য-আকাশের উজ্জ্বল রঙীন পটভূমিকায় সেই মন্দিরকেই দেখায় কষ্টিপাথরের স্তূপের মতো। ওর সত্য রূপ কি আমি জানি না। আমি জানি, সবই বদলায়। সূর্যকে হিরণ্ময় পাত্রের মতো দেখি,

কিন্তু কেন দেখি তা জানি না। অগ্নির তাপ অনুভব করি, কিন্তু অগ্নি কেন যে উত্তপ্ত তা জানি না। বন্ধু, তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছ মনে হচ্ছে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো দার্শনিকের চক্ষে সবই সমান।"

"তাই যদি হয় তা হ'লে আপনি সুখভোগে লিপ্ত না থেকে এমন নির্জনে ওই ভগ্নকুটীরে বেল খেয়ে এমন দুর্দশায় আছেন কেন? কেন তা হ'লে এই কষ্ট সহ্য করছেন? আমিও আপনারই মতো নির্জনে কৃচ্ছ্রসাধনা করি। কিন্তু আমার একটা লক্ষ্য আছে, আমি দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করতে চাই। তিনি প্রসন্ন হ'লে আমি অনন্ত সুখের অধিকারী হব—এই আমার বিশ্বাস। তাই আমার আচরণ নিরর্থক নয়, ভবিষ্যৎ সুখের জন্য বর্তমানে কষ্ট সহ্য করা প্রয়োজন। কিন্তু আপনি এ কি করছেন! ভবিষ্যৎ অনন্ত জীবনের অস্তিত্বে আপনার যদি আস্থা না থাকে, তা হ'লে এ দুঃখভোগ কি অনর্থক নয়? এ তো তা হ'লে বাতুলতার নামান্তর। আমি যদি আপনার মতো নাস্তিক হতাম—এই ভয়ঙ্কর উক্তির জন্য শঙ্কর আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন—আগমে নিগমে শাস্ত্রে পুরাণে সাধু-সন্নাসীদের জীবনচরিতে যে শিবমহিমা কীর্তিত তাতে যদি আমার বিশ্বাস না থাকত, আত্মার পরিশুদ্ধির জন্যই শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন এ সত্যে আমি যদি আস্থাবান না হতাম, সংক্ষেপে আপনার মতো আমিও যদি অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম, তা হ'লে আমি সন্ন্যাসী হতাম না, সংসারেই থাকতাম। সংসারের ভোগবিলাসেই গা ঢেলে দিতাম। বিলাসের সঙ্গী-সঙ্গিনীদের ডাক দিয়ে বলতাম—নিয়ে এস তোমাদের সুরা আর সুধা, নিয়ে এস অলঙ্কার আর অহঙ্কারের উপচার আড়ম্বর, চল, আনন্দের হিল্লোলে ভেসে যাই।

....আপনার তাই করা উচিত ছিল। আপনি যা করছেন তাতে আপনার বুদ্ধির কোন পরিচয় পাচ্ছি না। বর্তমানের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছেন, অথচ ভবিষ্যতের কোনও সুখ আশা করেন না, মনে হচ্ছে আপনি একূল ওকূল দু কূলই হারিয়ে মাঝখানে দিশাহারা হয়ে আছেন, অথচ তা বুঝতে পারছেন না। এ রকম সাধু সাজবার অর্থ কি! আপনার আচরণ বড়ই অদ্ভুত মনে হচ্ছে, পশুদের ব্যবহারেরও একটা সঙ্গতি থাকে। ব্যাপারটা কি বলুন তো?”

সাবর্ণির কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ ও উত্তাপ ছিল। বৃদ্ধ কিন্তু বেশ শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, “ভাই, যে ব্যক্তিকে তুমি পশুরও অধম ব'লে মনে করছ তার কথা জেনে লাভ কি?”

বৃদ্ধের শান্ত কণ্ঠস্বরে সাবর্ণি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। সত্য সম্বন্ধে কৌতূহলই তাঁহাকে ভব্যতার গণ্ডী লঙ্ঘন করাইয়াছিল —বৃদ্ধকে অপমান করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না।

তিনি বলিলেন, “সত্য জানবার আগ্রহে আমি যদি শোভনতার সীমা অতিক্রম ক'রে থাকি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার উপর ব্যক্তিগতভাবে আমার রাগ বা আক্রোশ থাকবার কথা নয়। কিন্তু আপত্তি যে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছেন, সেই অন্ধকার আমি ঘৃণা করি। আমি ভাবতেও পারি না যে, এমন ভারতবাসী থাকতে পারেন যিনি শিবের নাম পর্যন্ত শোনেন নি। আপনার মধ্যেই আমি শিবকে প্রচ্ছন্ন দেখছি এবং মনে মনে প্রার্থনা করেছি, আপনার কাছেও তিনি আত্মপ্রকাশ করুন। শিব-মহিমার শুভ্র আলোকে আপনার তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধির মুক্তি হোক। একটি অনুরোধ করছি, আপনার এই অদ্ভুত আচরণের

স্বপক্ষে যদি কোনও যুক্তি থাকে আমাকে বলুন, আমি এখনই তা খণ্ডন করব।"

বৃদ্ধ শান্তভাবেই উত্তর দিলেন, "যুক্তি বিবৃত করতে আমার আপত্তি নেই, কিছু না ব'লে চুপ ক'রে থাকতেও আপত্তি নেই। আপনি শুনতে চাচ্ছেন শুনুন। আমার যুক্তির উত্তরে কিন্তু আপনি যা বলবেন তা আমি শুনব না। শোনবার প্রবৃত্তি নেই। আপনার সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলও আমার জাগে নি। আপনি আপনার মধ্যেই আপনার সুখ-দুঃখ বর্তমান-ভবিষ্যৎ যুক্তি-তর্ক নিবদ্ধ ক'রে রাখুন। তা নিয়ে সময় নষ্ট করতে বা মাথা ঘামাতে আমি ইচ্ছুক নই। আপনার প্রতি প্রেম বা ঘৃণা কিছুই জাগে নি আমার মনে। দার্শনিকের কাছে তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণা দুই-ই সমমূল্য। এখন মনে পড়েছে, শিব নামক যে দেবতাটির আপনি নাম করলেন তাঁর নাম একেবারে শুনি নি যে তা নয়, ছেলেবেলায় একবার শুনেছিলাম। কিন্তু তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করি নি কখনও। প্রয়োজনই হয় নি। দেবতা তো একটি নন, শুনেছি সংখ্যায় তাঁরা তেত্রিশ কোটি, হয়তো আরও বেশি, কিন্তু আমার জীবনে তাঁদের কোনও প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। তাই তাঁদের কথা চিন্তা করি না কখনও।"

"আপনার নাম কি ?"

"আমার নাম কৌশিক। জাতিতে আমি লিচ্ছবি। শুনেছি, আমার পূর্বপুরুষরা রাজা ছিলেন। কিন্তু রাজত্ব তাঁদের বেশি দিন টেকে নি। আমার পিতামহের কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি শেষকালে নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগ করেন। সৌরাষ্ট্রে চ'লে যান তিনি। সেইখানেই আমার পিতার জন্ম হয়। আমার পিতাও

প্রথম জীবনে যথেষ্ট দারিদ্র্য ভোগ করেছিলেন। পরে তিনি এক বণিকের সহকারী হয়ে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। বাণিজ্যে তাঁর বেশ লাভ হ'ল এবং ক্রমশ তিনি সৌরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম হয়ে পড়লেন। আমার দুই দাদা ছিলেন। তাঁদের উনি ওই ব্যবসাতেই লাগালেন। আমাকে দিলেন বিদ্যালয়ে। আমি পড়াশোনায় মন দিলাম। ভালই দিন কাটছিল আমাদের। কিন্তু তার পরেই বিপদের ছায়াপাত হ'ল। ব্যাপারটার সূত্রপাত হ'ল বড়দার বিয়ে নিয়ে। বাবা তাঁর এক ব্যবসায়ী বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে জোর ক'রে বড়দার বিয়ে দিয়ে দিলেন। ফল বিষময় হ'ল। অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল একটা। বড়দা বৌদিদিকে একেবারে সহ্য করতে পারতেন না, মেজদা কিন্তু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পরে জানা গেল, তাঁর সঙ্গে একটা অবৈধ যোগাযোগও ঘটেছে। বৌদির মনোভাব ছিল কিন্তু একেবারে অন্যরকম। তিনি আমার দুই দাদাকেই ঘৃণা করতেন। তিনি ভালবাসতেন এক বাঁশীওলাকে, বিয়ের আগে থেকেই সম্ভবত ভাব ছিল তার সঙ্গে। সে গভীর রাত্রে গোপনে বৌদির ঘরে আসত। একদিন সে ধরা পড়ল। দুই দাদা মিলে তাকে এমন চাবকান চাবকালেন যে, সে ম'রেই গেল। তার আর্তনাদ অনুনয় অশ্রু নিবৃত্ত করতে পারলে না দাদাদের। এর পর যা হ'ল তা আরও ভয়ঙ্কর। বৌদি পাগল হয়ে গেলেন। আমার দুই দাদাও। তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার ক'রে বেড়াতে লাগলেন। পশুর মতো চীৎকার ক'রে বেড়াতেন তাঁরা। এত চীৎকার করতেন যে, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াত। কারও দিকে চাইতেন না তাঁরা। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে থাকতেন। একপাল ছেলে তাদের পিছু নিয়েছিল, ছেলেদের যা স্বভাব তাই

করত তাঁরা, ওই পাগল তিনটেকে লক্ষ্য ক'রে দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ত। কিছুদিন পরে তাঁরা মারা গেলেন—তিনজনেই মারা গেলেন। বাবা বেঁচে ছিলেন তখনও, তাঁকেই শ্রাদ্ধশান্তি করতে হ'ল। কিছুদিন কাটল, কি ভাবে কাটল অনুমান করতে পারছেন আশা করি। তারপর বাবার পালা এল। তাঁর পেটে একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। শুধু তাই নয়, যা খেতেন বমি হয়ে যেত। এশিয়ার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কিনে ফেলবার মতো অর্থ তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি মারা গেলেন অনাহারে। পেটে কিছুই থাকত না। আমি অবশেষে তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলাম। তাঁর ইচ্ছে ছিল না যে, আমি তাঁর উত্তরাধিকারী হই। কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। সমস্ত টাকাটা আমার হাতেই প'ড়ে গেল। গৃহের পরিবেশ ভাল লাগল না আমার। আমি বেরিয়ে পড়লাম দেশভ্রমণে। ভারতবর্ষ ঘুরলাম। সিংহলে, শ্যামদেশে, যবদ্বীপেও গেলাম। অনেক বড় বড় মঠে, বড় বড় বিদ্যাপীঠে, বড় বড় মন্দিরে, বড় বড় বিদ্বানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। আলাপও হ'ল। তাঁদের তর্ক করবার প্রবল ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। প্রত্যেকেই মহা তার্কিক, অপরকে হীন প্রতিপন্ন ক'রে নিজের বিদ্যা জাহির করতে চায় প্রত্যেকে। একদিন কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বারের কাছে গঙ্গাতীরে এমন একজনকে দেখলাম যে, আমার তাক লেগে গেল। দেখলাম গঙ্গাতীরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি লোক পদ্মাসনে স্থির হয়ে ব'সে আছেন। সবাই বললে—উনি একজন উঁচুদরের সন্ন্যাসী, ত্রিশ বৎসর ধ'রে ঠিক ওই একভাবে ব'সে আছেন। দেখলাম, তাঁর শীর্ণ দেহ লতায় ঘিরেছে, তাঁর রুক্ষ জটায় পাখী বাসা বেঁধেছে। অথচ তিনি বেঁচে আছেন। আমার দুই দাদা, বৌদি, সেই বাঁশীওলা

আর বাবার কথা মনে পড়ল, কি দুঃখই না তাঁরা পেয়েছেন! বুঝলাম, এই গঙ্গাতীরবাসী সন্ন্যাসীই প্রকৃত জ্ঞানী। আমার যেন একটা উপলব্ধি হ'ল, মনে হ'ল যেন পথ দেখতে পেলাম। বুঝলাম মানুষের দুঃখের একমাত্র কারণ কামনা। আমরা যেটাকে আনন্দজনক ব'লে মনে করি, সেইটেই কামনা করি। কাম্য বস্তু না পেলেই দুঃখ হয়, আবার পেলেও সর্বদা ভয় ভয় করে—পাছে সেটা হাতছাড়া হয়ে যায়। এটা আনন্দজনক, ওটা দুঃখজনক—এই সব বিশ্বাসই দুঃখের হেতু। এই সব বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিলেই দুঃখ, বর্জন করলে দুঃখের হাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। সেই সাধুর আদর্শই আমি অনুসরণ করছি। এটা ভাল, ওটা মন্দ—এ বোধ ত্যাগ ক'রে যতদূর সম্ভব নির্বিকার হয়ে নির্জনে স্থির হয়ে ব'সে থাকাটাই আমি একমাত্র শ্রেয়ঃ ব'লে মনে করছি।"

মহর্ষি সাবর্ণি অভিনিবেশ সহকারে কৌশিকের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কৌশিকের বক্তব্য শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "আপনি যা বললেন তা যে একেবারে অর্থহীন তা নয়। পার্থিব সুখ সত্যই বর্জনীয়। অপার্থিব সুখলাভের জন্যই বর্জনীয়। ঋষিরা যাকে অপার্থিব অনন্ত সুখ ব'লে বর্ণনা করেছেন, সেটাকে কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সেইটাই হ'ল লক্ষ্য। এই সত্যকে অবজ্ঞা করলে স্বয়ং ভগবানকেই অবজ্ঞা করা হয় যে! নিতান্ত পাগল ছাড়া আর কেউ তা করতে সাহস করবে না। কৌশিক, আপনার অজ্ঞতায় আমি ব্যথিত হয়েছি। আপনি এইটুকু শুধু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তিতেই পরম সত্য প্রকাশিত। একই তিন, আবার তিনই এক। আপনি আমার কথাগুলি শুনুন ভাল ক'রে—"

কৌশিক বাধা দিলেন, "আগন্তুক, ক্ষান্ত হও। তোমার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আমি শুনতে চাই না। জোর ক'রে আমাকে দলে টানবার চেষ্টা ক'রো না, পারবে না। আমি কোনও মতবাদই মানি না। কোন সিদ্ধান্তই শেষ কথা বলতে পারে নি, সমস্ত শাস্ত্র-আলোচনাই বন্ধ্যা—এই আমার মত। এই মত অনুসরণ ক'রে আমি মোটা-মুটি ভালই আছি। তুমি তোমার গন্তব্য পথে চ'লে যাও। বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার পর যে নির্লিপ্ত নির্বিকার অবস্থায় আমি নিজেকে মগ্ন করতে পেরেছি, সেখান থেকে আমাকে টেনে তোলবার চেষ্টা ক'রো না। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও।"

মহর্ষি সাবর্ণি প্রকৃতই একজন শাস্ত্রপারঙ্গম প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঈশ্বরের করুণা এখনও এই দুর্ভাগ্য কৌশিকের উপর বর্ষিত হয় নাই। ইহার চিত্ত সাংসারিক কষ্টে এত বেশী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, মহেশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত ইহার নাই। মুক্তি বা অনন্ত জীবনের কল্পনা করা এখনও ইহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন অপাত্র বা অনধি-কারীর সহিত শাস্ত্রীয় বাদানুবাদ করিলে অনেক সময় বিষময় ফল হয়, অবিশ্বাসীরা জেদ করিয়া যেন নিজেদের পাপের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দেয়। এই সব চিন্তা করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি বলিলেন, "কৌশিক, ভগবান তোমাকে সুমতি দিন। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই। আমি চললাম।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই অন্ধকারেই সাবর্ণি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

উষাকালে দেখিতে পাইলেন, গঙ্গার তীরে মুণ্ডক নামক সারস-জাতীয় পক্ষী একপদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গঙ্গার জলে তাহাদের মূর্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। আশেপাশে ঝাউবন। শ্বেতপক্ষ বলাকার শ্রেণী ত্রিভুজাকারে নীল আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে। ঝাউবনের ভিতর হইতে নানাপ্রকার জলচর পক্ষীর বিচিত্র কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

সাবর্ণি দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই দৃশ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। অসংখ্য তরঙ্গ তুলিয়া সুরধুনী সাগরসঙ্গমে চলিয়াছেন, যতদূর দৃষ্টি যায় নৌকার সারি পাল তুলিয়া চলিয়াছে। নদীর তীরে মানুষের বসবাস। কোথাও গগনচুম্বী শ্বেত অট্টালিকা, কোথাও বা কুটীর-শ্রেণী, আর সকলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে একটা অর্ধ-স্বচ্ছ কুহেলিকা। কুহেলিকা ধীরে ধীরে যেন নিজেকে প্রসারিত করিতেছে। অনেক বাগান দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটিই ফলে ফুলে ভরা। ক্ষেতে ক্ষেতে শস্যসম্ভার যেন উছলিয়া পড়িতেছে, পক্ষী-কলরবে চারিদিক মুখরিত, জীবনধাত্রী ধরিত্রী জীবনের বিচিত্র বিকাশে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সে আনন্দ শস্যশীর্ষে কাঁপিতেছে, ধূলিকণায় বিচ্ছুরিত হইতেছে।

মহর্ষি সাবর্ণি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, তোমার কৃপায় আমার যাত্রা সফল হতে চলেছে, তোমাকে নমস্কার। হে মদনান্তক, তোমার যে মহিমার বিচিত্র প্রকাশে প্রকৃতি সমুজ্জ্বলা, তোমার সেই মহিমার প্রভাব নিরঞ্জনাকেও কলুষমুক্ত করুক। যে প্রেমে তুমি বিশ্ব-প্রকৃতিকে মধুময় ক'রে রেখেছ, নিরঞ্জনা যে তা থেকে বঞ্চিত এ আমি ভাবতে পারি না। হীন প্রবৃত্তির যে কালিমা তাকে কলঙ্কিত

ক'রে রেখেছে, হে সর্বকলঙ্ক-পাবক যোগীশ্বর, তুমি তা অপসারিত ক'রে কুসুমেরই মতো স্বর্গীয় সুষমায় আবার তাকে ফুটিয়ে তোল—"

প্রার্থনা শেষ করিয়া আবার তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। পথে পুষ্পিত তরু বা সুন্দর পাখী দেখিলেই নিরঞ্জনার কথা মনে পড়িতে লাগিল।

গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়া চলিতে চলিতে বহু সমৃদ্ধ নগর ও গ্রাম অতিক্রম করিয়া কয়েকদিন পরে অবশেষে তিনি পাটলিপুত্রের সমীপবর্তী হইলেন।

তখন প্রভাত হইতেছিল। নিকটে একটি ক্ষুদ্র পর্বত-সদৃশ উচ্চভূমি দেখিয়া তাহাতেই তিনি আরোহণ করিতে লাগিলেন। সেই উচ্চভূমির শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া বহুকাল পরে তিনি সেই বিশাল নগরীকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, নবোদিত সূর্যালোকে অসংখ্য সৌধমালা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্দিক যেন ঝলমল করিতেছে। তাঁহার আনন্দ হইল, দুঃখও হইল। তাঁহার মনে হইল, এ আনন্দ কামজ। মনে হইল, যাহা দেখিতেছি তাহাতে মূঢ় মানবদের মোহিনী কামনাই কেবল শতরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। দম্ভ, বিলাস, আত্মপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নাই।

সাবর্ণির অধরে একটা বক্র হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। অতীতের সমস্ত স্মৃতি ধীরে ধীরে তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি নির্নিমেষে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে অন্তরের ভাবকে ভাষা দিলেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওই নগরেই কামনার ফলস্বরূপ

একদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। ওই নগরের বিষাক্ত সুরভিত বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ ক'রে কুহকিনী রাক্ষসীদের গান শুনে ছলাকলায় মুগ্ধ হয়ে আনন্দের সাগড়ে পাড়ি দেবার প্রয়াস পেয়েছিলাম আমি। জন্মের দিক থেকে বিচার করলে ওই আমার শৈশবের লীলাভূমি, সমাজের দিক থেকে দেখলে ওই গৃহ। লোকচক্ষে সে লীলাভূমি পুষ্পাকীর্ণ, সে গৃহ আভিজাত্যমণ্ডিত। পাটলিপুত্র, তোমার সন্তানেরা যে তোমাকে জননী ব'লে শ্রদ্ধা করে তাতে অস্বাভাবিকতা নেই কিছু। সত্যিই তোমার ক্রোড়ে তারা জন্মেছে, সত্যিই তাদের লালন করেছ তুমি। বিলাসবেশে সজ্জিত হয়ে আমিও তোমার বুকে মানুষ হয়েছিলাম একদিন।

আমি ত্যাগ করেছি তোমাকে, স্বেচ্ছায় শুভবুদ্ধিবশে ত্যাগ করেছি। মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণীরাও ওই উপদেশই দিয়েছেন। যাঁরা বিদ্রোহী, তাঁরাই সন্ন্যাসী, তাঁরা প্রকৃতির পারবশ্য মানতে চান না। বৈদান্তিকেরা পার্থিব সুখ-দুঃখকে স্বপ্নবৎ অলীক মনে করেন, তপস্বীরা মানব-জীবনকে প্রবাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন, সাধু মাত্রেই সংসারের সংস্রব ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। পাটলিপুত্র, তাই তোমার প্রেমালিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করেছি আমি। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। ঘৃণা করি তোমার ঐশ্বর্যকে, তোমার বিজ্ঞানকে, তোমার ভদ্রতাকে, তোমার চাকচিক্যকে। প্রকৃত মানবতার তুমি জননী নও, তুমি দানবধাত্রী, তোমাকে আমি অভিশাপ দিই। অভিশাপ দিই তোমার ছদ্মবেশী ভদ্রতাকে। হে সর্বত্যাগী শঙ্কর, হে শ্মশানচারী মহাকাল, হে কৈলাসপতি মহেশ্বর, কুবেরের ঐশ্বর্য তোমাকে মুগ্ধ করে নি; তুমি সতীনাথ, তুমি উমাপতি, প্রতি কুমারীর আরাধ্য দেবতা তুমি, কিন্তু তবু

তুমি কাম-পঙ্কে নিমগ্ন নও, মদনকে ভস্ম করেছ তুমি। হে মহাশক্তিধর, আমাকে শক্তি দাও, আমি পাপ-পুরীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি—”

প্রার্থনা শেষ করিয়া তিনি পর্বত হইতে অবরোহণ করিতে লাগিলেন।

…কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর পাটলিপুত্রের বিরাট সিংহদ্বার তাঁহার নয়নগোচর হইল। দেখিলেন, প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের ছায়ায় বসিয়া বহু ফল-বিক্রেতা ফল বিক্রয় করিতেছে। আশেপাশে অনেক ভিক্ষুকও রহিয়াছে। তাহাদের করুণ কণ্ঠ, শীর্ণ কান্তি, লোলুপ দৃষ্টি দেখিয়া সাবর্ণি বিচলিত হইলেন। ছিন্নবাসা এক বৃদ্ধা জানু পাতিয়া বসিয়া ছিল। সে সাবর্ণির বহির্বাসের প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া করুণকণ্ঠে কহিল, “ঠাকুর, আমাকে আশীর্বাদ কর, ভগবান যেন দয়া করেন আমাকে। এ জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করেছি, পরকালে যেন শান্তি পাই। তুমি পুণ্যাত্মা, তোমার পায়ের ধুলো মাথায় দাও আমার—”

“জয় শঙ্কর—”

বৃদ্ধার মাথায় হস্তার্পণ করিয়া তিনি আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া একদল ছেলের পাল্লায় পড়িয়া গেলেন তিনি। রাস্তার অভব্য ছেলের দল। তাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শুধু তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাহা বলিতে লাগিল তাহা অশ্লীল, অশ্রাব্য।

“ওরে দেখ্ দেখ্, এক ব্যাটা ভাণ্ড সাধু চলেছে! ব্যাটার গায়ের রঙ ঠিক যেন কাকের মতো। আর দাড়ি দেখেছিস? ঠিক

যেন ছাগল-দাড়ি। মাঠের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলে কাক-তাড়ুয়ার কাজ হয়। না না বাবা, মাঠে গিয়ে কাজ নেই ওর। ওকে দেখলে মাঠের ফসলই শুকিয়ে যাবে, শীষ ঝ'রে যাবে সব। যমের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও স্থান নেই ওর। এখানে কোথা থেকে জুটল···"

এই ধরনের চীৎকার করিতে করিতে তাহারা ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল।

"অবোধ শিশুদের ভগবান মঙ্গল করুন"—মনে মনে এই কথা বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "এই বৃদ্ধাটির ব্যবহার কত শ্রদ্ধাপূর্ণ, আর এই ছেলেগুলো কি অভদ্র! বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে একই বস্তুকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মূল্য দেয়। বৃদ্ধ কৌশিক নাস্তিক হ'লেও যা বলেছে তা ঠিক। সে অন্ধ বটে, কিন্তু এ জ্ঞান তার আছে যে সে অন্ধ, আলো কি তা জানে না, জানবার স্পৃহাও নেই। মানুষকে একটা কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ড দিয়ে মাপবার উপায় নেই। পৃথিবীতে একমাত্র শঙ্করই স্থির, আর সবই মায়া, সবই চঞ্চল—"

দ্রুতবেগে তিনি পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। দশ বৎসর পরে তিনি জন্মভূমিতে ফিরিয়াছেন, আশা করিতেছিলেন অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু কই, সবই তো ঠিক তেমনিই রহিয়াছে! পথ তেমনি প্রস্তরাকীর্ণ, মনে হইতেছিল প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড যেন তাঁহার পরিচিত। মনে পড়িতেছিল প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডের সহিত যেন তাঁহার পদস্খলনের ইতিহাস জড়িত

আছে। উঃ, কি জঘন্য জীবনই না তিনি যাপন করিয়াছিলেন! সহসা তাঁহার অন্তর ক্ষোভে দুঃখে অনুতাপে তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর পদাঘাত করিতে করিতে তিনি চলিতে লাগিলেন। তাঁহার চরণ রক্তাক্ত হইয়া গেল, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বরং রক্ত দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইল, মনে হইল প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম তখনও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নাই। কিছু দূর গিয়া তিনি একটি বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাইলেন। সেটিকে বামে রাখিয়া তিনি যে পথ ধরিলেন, সেই পথই তিনি সন্ধান করিতেছিলেন। পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি উদ্যান-বাটিকা। চন্দন চম্পক প্রভৃতি সুগন্ধি বৃক্ষশ্রেণী পথটিকে ছায়াময় ও সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে। উদ্যান-বাটিকাগুলি মোটেই বাটিকা নয়, প্রত্যেকটিই এক-একটিই হর্ম্য। প্রতিটি হর্ম্যই মনোরম কারুকার্য-খচিত। কোথাও প্রবালের রক্তদ্যুতি, কোথাও মর্মরের শুভ্রকান্তি, কোথাও বা স্বর্ণগম্বুজের সমুজ্জ্বল শোভা। অর্ধ-উন্মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া কোন কোন উদ্যান-বাটিকার অভ্যন্তর দৃষ্ট হইতেছিল। কোথাও মর্মর-বেদিকার উপর পিত্তলের মূর্তিসকল কাননের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, কোথাও সুরভিত জলের ফোয়ারা কাননের পুষ্পপত্র ও পরিবেশকে শীকর-স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা কৃত্রিম পর্বত বাহিয়া নির্ঝরিণী নামিয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে, প্রত্যেকটি বাড়ি যেন শান্তির নিলয়। কোথাও কোন শব্দ নাই, মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শোনা যাইতেছে।

সাবর্ণি একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মনোহর প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া গতিবেগ রোধ করিলেন। এই প্রাসাদটিই তিনি সন্ধান

করিতেছিলেন। প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি প্রাসাদটির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাসাদের স্তম্ভগুলি অপরূপ, সেগুলিতে যেন পাষাণের কাঠিন্য বা রূঢ়তা নাই, প্রত্যেকটিতে যেন তন্বী যুবতীর দেহলাবণ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রাসাদের অলিন্দে বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পিত্তলমূর্তিসমূহ শোভা পাইতেছে। প্রত্যেকটিই যে এক বা একাধিক শিল্পীর প্রতিভা-নৈপুণ্যের নিদর্শন, দেখিলেই তাহা বোঝা যায়। মূর্তিগুলি দেখিয়া মহর্ষি সাবর্ণি কিন্তু আনন্দিত হইলেন না। তাঁহার অন্তরে ক্ষোভই সঞ্চারিত হইল। দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "পিতল দিয়েই তৈরি কর বা সোনা দিয়েই তৈরি কর, এ সব বাজে সন্ন্যাসীর মহিমা কখনও চিরস্থায়ী হবে না। এরা নাস্তিক, নরকেই এদের মহিমা চিরস্থায়ী হতে পারে। এদের ভ্রান্ত মতবাদ মানুষকে ভ্রান্ত পথেই নিয়ে যায়। লম্বা লম্বা বক্তৃতা করলেই সাধু হওয়া যায় না, বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করলে তা মন্দিরও হয় না, যদি তাতে দেবতা না থাকেন। ও-সব ভাঁওতায় সাধারণ লোকও বেশিদিন ভোলে না।"

একজন ক্রীতদাস দ্বার খুলিয়া দেখিল, ছিন্ন মলিন আলখাল্লা-পরা একটা কিম্ভূতকিমাকার কুৎসিত লোক ধূলামাখা পায়ে মর্মর-শুভ্র বারান্দায় উঠিয়াছে। সে তাড়া করিয়া গেল।

"নেবে যাও, নেবে যাও। এখানে ভিক্ষে মিলবে না, অন্য কোথাও যাও। নাবছ না যে, মার খাবে নাকি?"

সাবর্ণি শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি ভিক্ষা চাই না। আমাকে তোমার প্রভু সিন্ধুপতি বর্মার কাছে নিয়ে চল।"

এ কথা শুনিয়া ভৃত্যটি আরও চটিয়া গেল।

"আমার প্রভুর কি আর কাজ নেই যে, তোমার মত লক্ষ্মীছাড়া ভূতের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন! আর কথা বাড়িও না, কেটে পড়।"

"বৎস, যা বলছি শোন। তোমার প্রভুকে গিয়ে বল যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার প্রয়োজন আছে।"

ভৃত্যটি এবার ক্ষেপিয়া গেল।

"দূর হ, দূর হ, ব্যাটা ভণ্ড কোথাকার—"

ভৃত্যটির হস্তে একটি যষ্টি ছিল। তদ্দ্বারা সে সার্বর্ণিকে আঘাত করিল। সার্বর্ণি কিন্তু বিচলিত হইলেন না। মাথা পাতিয়া তিনি আঘাত গ্রহণ করিলেন এবং শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, যা বলছি কর। তোমার প্রভুকে খবর দাও। মিনতি করছি, আমার অনুরোধটি রাখ।"

এবার ভৃত্য অবাক হইয়া গেল। একটু ভীতও হইল। প্রহারে বিচলিত হয় না, লোকটি তো সাধারণ লোক নয়। সে ছুটিয়া গিয়া প্রভুকে খবর দিল।

সিন্ধুপতি তখন স্নান করিতেছিলেন। তিনি সদানন্দ পুরুষ, তাঁহাকে দেখিলেই ভাল লাগে। তাঁহার অধরে নয়নে একটি শান্ত মৃদুহাস্য সর্বদাই তাঁহার মুখমণ্ডলকে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অবশ্য বোঝা যায় যে, তাঁহার ওই শান্ত হাসিটি অন্তরের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের বহিঃপ্রকাশ।

সার্বর্ণি ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া আসিলেন।

"আরে, আরে, সাবু না কি! বাল্যবন্ধুর এমন আকস্মিক পুনরাবির্ভাব তো কল্পনা করতে পারি নি! তোমাকে দেখেই

চিনেছি আমি, খুশীও হয়েছি, কিন্তু তোমার এ কি চেহারা হয়েছে! তুমি যে ভদ্রবংশের ছেলে তা তোমাকে দেখে আর বোঝবার উপায় নেই! ছি ছি, কি হয়ে গেছ তুমি! মনে হচ্ছে মানুষ নয়, যেন একটা জানোয়ার। ব্যাপার কি বল দেখি?"

সিন্ধুপতি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"আমরা একসঙ্গে ব্যাকরণ অলঙ্কার আর দর্শন পড়েছিলাম, না? আমাদের আচার্য জ্ঞানকুম্ভ উপাধ্যায়কে মনে আছে? টোলেই তোমার কেমন যেন একটা বুনো বুনো ভাব ছিল, অনেকটা যেন ঘোড়ার মতো ছিলে তুমি। চট্ ক'রে ভড়কে যেতে, চট্ ক'রে লাফিয়ে উঠতে। মনে আছে?"

মহর্ষি সাবর্ণ কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল।

সিন্ধুপতি বলিয়া চলিলেন, "সব মানে আছে আমার। কাউকে বিশ্বাস করতে না তুমি, এমন কি নিজেকেও নয়। তবে মেজাজ তোমার দরাজ ছিল, তার পরিচয় তুমি দিয়েছ। তোমার ধনদৌলত বিষয়সম্পত্তি, এমন কি নিজের জীবনটাও এমন ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ তুমি, যেন একমুঠো ধুলো। তোমার এই অদ্ভুত স্বভাব—প্রতিভা বলতেও আপত্তি নেই আমার—অবাক ক'রে দিয়েছিল আমাকে। তুমি যখন সব ছেড়েছুড়ে চ'লে গেলে, সত্যি বলছি, খুব কষ্ট হয়েছিল; মনে হয়েছিল মস্ত একটা ক্ষতি হয়ে গেল। যাক, এতদিন পর যে তোমার আবার সুমতি হয়েছে; আবার যে তুমি ফিরে এসেছ, এতে সত্যি বলছি খুব খুশী হয়েছি। ধর্মের ভেক কি ভদ্রলোকের মানায়? অরণ্যে বাস করাও কোন ভদ্রলোকের পোষায় না বেশীদিন। তুমিও যে ফিরবে তা

জানতাম। আজ একটা শুভদিন বলতে হবে। ছন্দা, নন্দা, আমার বন্ধুটিকে একটু ভদ্র ক'রে তোল তো। ওর হাতে পায়ে গায়ে দাড়িতে চুলে বেশ ক'রে ফুলেল তেল লাগাও—”

সিন্ধুপতি ঘাড় ফিরাইয়া তুইজন ক্রতদাসীকে আদেশ করিলেন। তাহারা মৃদু হাস্য করিয়া চলিয়া গেল এবং ভৃঙ্গার, গন্ধপাত্র, তৈল, ধাতব দর্পণ প্রভৃতি আনয়ন করিল। কিন্তু সাবর্ণি হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহাদের নিবৃত্ত করিলেন এবং আনতনয়ন হইয়া রহিলেন, কারণ ক্রীতদাসী তুইটি সম্পূর্ণ নগ্না ছিল। সিন্ধুপতি স্মিতমুখে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর নিজেই গিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য আসন এবং খাদ্য পানীয় আনিয়া করজোড়ে বলিলেন, “মহর্ষি, সদয় হোন। আমার অতিথ্য গ্রহণ করুন।”

মহর্ষি কিন্তু কিছু গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু এইবার তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল। বলিলেন, “সিন্ধুপতি, তুমি ভুল করেছ। আমি ধর্ম ত্যাগ ক'রে তোমার কাছে আসি নি। ধর্মেই যে সার সত্য নিহিত আছে—এ কথা আমি ক্ষণিকের জন্যও ভুলি না। শব্দই যে শঙ্কর—এ কথা আমি উপলব্ধি করেছি। শঙ্করই ব্রহ্মরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণুরূপে তা পালন করছেন এবং মহাকালরূপে তা ধ্বংস করছেন—এ সত্য বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আমি জানি, তিনি যা সৃষ্টি করেন নি তা এখনও অসৃষ্ট আছে। তিনিই আদি-উৎস, আদি-প্রাণ, চিরন্তন লীলা—”

“আরে সর্বনাশ—”

অর্ধ-স্ফুটকণ্ঠে কথা তুইটি উচ্চারণ করিয়া সিন্ধুপতি একটি সুরভিত অঙ্গচ্ছেদ পরিধান করিতে লাগিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, “দেখ ভাই সাবু, ব্রহ্ম-ট্রহ্ম শুনে ঘাবড়াবার ছেলে

আমি নই। আমি বনে যাই নি বটে, কিন্তু ও-রকম বড় বড় বচন অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছিও। নিজেও দর্শনশাস্ত্র চর্চা কম করি নি—একসঙ্গেই তো শুরু করেছিলাম, মনে নেই? তুমি উপনিষদ্ বা পুরাণ থেকে দু-চারটে বচন আউড়ে আমাকে ঘায়েল করতে পারবে না, সন্তুষ্ট করতে পারবে না। সমস্ত উপনিষদ্, সমস্ত পুরাণ তন্ন তন্ন ক'রে ঘেঁটেছি আমি, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারি নি, পিপাসাও মেটে নি। ওসব প'ড়ে মনে হয়েছিল মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন ছেলেমানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে তাকে ভোলবার জন্যেই মুনি-ঋষিরা নানা রকম রূপকথা বানিয়ে গেছেন। শাস্ত্রই বল বা বেদ-উপনিষদ্ই বল, গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রে পশু-পক্ষীরা কথা কইছে, বত্রিশ সিংহাসনে পুতলরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে—এসব আশা করি তুমি সত্য ব'লে মনে কর না। চল, ভিতরে চল—"

মহর্ষি সাবর্ণির হাত ধরিয়া তিনি ভিতরের দিকে একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"এটি আমার গ্রন্থশালা। পাটলিপুত্রে রাজপ্রাসাদেও এ রকম পুঁথি-সংগ্রহ নেই। সমস্ত আমি প'ড়ে দেখেছি। আমার কি মনে হচ্ছে জান? ওসব অসুস্থ মনের অস্বাভাবিক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।"

তিনি জোর করিয়া সাবর্ণিকে একটি গজদন্তনির্মিত আসনে বসাইয়া দিয়া নিজে আর একটি আসন গ্রহণ করিলেন। সাবর্ণি তাঁহার সযত্নরক্ষিত গ্রন্থগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চোখে বিষণ্ণতার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। অবশেষে বলিলেন, "ওগুলো পুড়িয়ে ফেল।"

"পড়িয়ে ফেলব! বল কি? মানব-সভ্যতার ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে তা হ'লে যে! বলছ কি তুমি ওগুলো অসুস্থ মনের কল্পনা হতে পারে, কিন্তু পড়তে যে চমৎকার! এই সব অস্বাভাবিক স্বপ্ন আর অসুস্থ কল্পনাই তো সরস ক'রে রেখেছে জীবনকে। ওগুলো লোপ পেলে পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রসও লোপ পাবে সঙ্গে সঙ্গে। আমরা তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক বস্তু হয়ে পড়ব তা হ'লে—"

মহর্ষি সাবার্ণর মনে চিন্তা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। নিজের চিন্তার সূত্র ধরিয়াই তিনি বলিলেন, "শাস্ত্র নামে অভিহিত এমন অনেক গ্রন্থ আছে যা অসার কল্পনা ছাড়া কিছু নয়, মানছি। কিন্তু যিনি সত্য, যিনি ব্রহ্ম, যিনি শঙ্কররূপে মূর্ত, তিনি কি মিথ্যা কল্পনা হতে পারেন? মানুষের হিতের জন্য তিনি এসেছেন আমাদের মধ্যে—এ কথা কি শোন নি?"

সিন্ধুপতি সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "শুনেছি বইকি! চমৎকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছ তুমি। এটা তুমি নিশ্চয় মানবে, যিনি মানুষের মতোই চিন্তা করেন, মানুষের মতোই কথা বলেন, খান ঘুমোন বেড়িয়ে বেড়ান, সুযোগ পেলে স্ত্রীসঙ্গও করেন, তিনি মানুষই। তুমি তাঁকে দেবতা ব'লে ভাবছ কেন? বৈদিক যুগের ঋষিরা সূর্য চন্দ্র অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে প্রচুর ঘি পোড়াতেন, উপনিষদ্-যুগের ঋষিরা বললেন—ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে, দেবতারা এক ফোঁটাও পান নি, পেতে পারেন না। তারপর এলেন বুদ্ধদেব, তিনি ওদিক দিয়েই গেলেন না। তিনি অষ্ট নিয়মে সকলকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নির্বাণের পথ দেখালেন। তাঁর জীবদ্দশায় কেউ কেউ হয়তো তাঁকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু পরে দেখছি তাঁর

চেলারা কামনার আগুন জ্বালিয়ে তুললেন দাউ দাউ ক'রে। তারপর এলেন কুমারিল ভট্ট, এলেন শঙ্করাচার্য। একের পর এক এসেই যাচ্ছেন। দেবতারাও কি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছেন? বিশ্বের কুলোয় তেত্রিশ কোটিকে তুলে আছড়াচ্ছে সর্বদা। যাক, ওসব থাক্ এখন। তোমার কথা শুনি। খেতেও চাইছ না, কাপড় পর্যন্ত ছাড়তে চাইছ না, ব্যাপার কি বল দেখি? তোমাকে নিয়ে কি করি আমি—"

"ইচ্ছে করলে একটি মহদুপকার করতে পার। তুমি যেমন সুগন্ধি পোশাক পরেছ, তেমনি একটি পোশাক ধার দাও আমাকে। স্বুবর্ণখচিত পাদুকাও দাও এক জোড়া। আমার চুলে আর দাড়িতে লাগাবার জন্য দু-এক শিশি সুগন্ধি তেল পেলেও ভাল হয়। আর আমি অত্যন্ত খুশী হব, যদি তুমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে পার আমাকে। দেবে? যদি দাও, বড় কৃতজ্ঞ হব। এই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।"

সিন্ধুপতি সুছন্দা ও সুনন্দা নাম্নী ক্রীতদাসী দুইটির দিকে ফিরিয়া তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদটি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। পোশাকটি কাশ্মীরী কাজ করা, বর্ণে গন্ধে সৌন্দর্যে অপরূপ। সুছন্দা সুনন্দা যখন সেটিকে খুলিয়া তুলিয়া ধরিল, তখন মনে হইতে লাগিল যেন একটি অদ্ভুত আকৃতির বিচিত্র পুষ্প অদৃশ্য বৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল, মহর্ষি সাবর্ণি যে ময়লা শতচ্ছিন্ন দুর্গন্ধ আলখাল্লাটি পরিধান করিয়া আছেন তাহা খুলিয়া তবে নূতন পোশাকটি পরিধান করিবেন। কিন্তু মহর্ষি সাবর্ণি কিছুতেই তাঁহার আলখাল্লা খুলিতে চাহিলেন না। বলিলেন, তিনি বরং

গায়ের চামড়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু আলখাল্লা ছাড়িবেন না, পোশাকের উপর তিনি আলখাল্লা পরিবেন। সুতরাং আলখাল্লার নীচেই তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদটি পরাইতে হইল। ক্রীতদাসী হইলেও সুছন্দা সুনন্দা মহর্ষি সাবর্ণিকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, কারণ প্রথমত তাহারা যুবতী, দ্বিতীয়ত রূপসী। সাবর্ণির অদ্ভুত সাজ দেখিয়া তাহারা হাসিতেছিল। সুনন্দা তাঁহাকে মহারাজ সম্বোধন করিয়া তাহার সম্মুখে দর্পণটি তুলিয়া ধরিল। সুছন্দার সাহস আরও বেশী। সে তাঁহার দাড়িতে হাত বুলাইয়া মুচকি হাসিতে লাগিল। মহর্ষি সাবর্ণি এসব কিছুই দেখিতেছিলেন না, তিনি চক্ষু বুজিয়া শঙ্করকে ডাকিতেছিলেন। সুবর্ণখচিত পাতুকাদ্বয় পরিধান করিয়া এবং স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ পেটিকাটি কটিবন্ধে ভাল করিয়া বাঁধিয়া সাবর্ণি সিন্ধুপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, সিন্ধুপতিও মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

সাবর্ণি বলিলেন, "সিন্ধুপতি, উপহাস ক'রো না। বিচলিতও হ'য়ো না। আমাকে যা যা দিলে আমি তার সদ্ব্যবহারই করব, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

সিন্ধুপতি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "ভাই, আমি নিশ্চিন্তই আছি। সৎ অসৎ কোন কিছু নিয়েই আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, কখনও ঘামাইও না। আমি জানি কোনও মানুষের পক্ষে সৎ হওয়াও যেমন অসম্ভব, অসৎ হওয়াও তেমনি অসম্ভব। আসলে ও দুটো জিনিসের অস্তিত্বই নেই। আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য—তা-ও সাময়িক সুবিধার জন্য—ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ করেছি। সবাই আবার এ বিষয়ে একমতও নই। তুমি যেটা ভাল মনে কর, আমি সেটা করি না। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা

ঝামেলা বাঁচিয়ে চলেন। অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম আর সংস্কার মেনে চলেন, না চললে সমাজে শান্তিতে বাস করা যায় না। বর্তমান পাটলিপুত্র সমাজের সব রকম সংস্কার মেনে আমি চলি, ভাল-মন্দ বিচার করি না। তাই শহরে আমি গণ্যমান্য লোক। বন্ধু, তোমাকে যে সামান্য উপহার দিয়েছি তা নিয়ে তুমি মনের আনন্দে যা খুশী ক'রে বেড়াও, আমার কিছুতেই আপত্তি হবে না—"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সাবর্ণির মনে হইল, সিন্ধুপতিকে অকপটে সব কথা খুলিয়া বলাই উচিত।

"আচ্ছা, বছর দশেক আগে নিরঞ্জনা ব'লে এক নটী রঙ্গমঞ্চে নাচত তাকে মনে আছে তোমার? তাকে চেন কি?"

"চিনি মানে! রূপসী নিরঞ্জনাকে পাটলিপুত্রে কে না চেনে! এই কিছুকাল আগে আমিই তো ক্ষেপেছিলাম তাকে নিয়ে। প্রচুর টাকা খরচ ক'রে রেখেও ছিলাম তাকে কিছুদিন। ওর জন্যে খানিকটা জমিদারি বিক্রি ক'রে ফেলতে হয়েছে।" তাহার পর একটু থামিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তিন-তিনখানা মোটা কবিতার বইও লিখতে হয়েছে, ও-রকম বাজে কবিতা আমার কলম দিয়ে কি ক'রে যে বেরুল তা ভেবে পাই না। কিন্তু কি করি বল, উপায় ছিল না কিছু। মেয়েমানুষের ব্যাপার, বিশেষত নিরঞ্জনার মত রূপসীর, ধন মান বুদ্ধি বিবেক সমস্ত তার পদপ্রান্তে রেখে হাতজোড় ক'রে থাকতে হয়েছিল কিছুদিন। চিরকাল যদি থাকতে পারতাম, কৃতার্থ হয়ে যেতাম। চিরকাল যদি অপরূপ সৌন্দর্যে ডুবে থাকা সম্ভব হ'ত, তা হ'লে শাস্ত্র-ফাস্ত্র, ব্রহ্ম-ট্রহ্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। তুমি কিন্তু আমাকে অবাক করেছ সাবু। গভীর অরণ্যে এতকাল

তপস্যা ক'রেও নিরঞ্জনাকে মনে আছে তোমার? ওর টানেই এসেছ না কি! আমরা তা হ'লে আর কল্‌কে পাব না দেখছি—"

সিন্ধুপতি হাসিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মহর্ষি সাবর্ণি কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। লোকটা এত বড় গর্হিত পাপের কথা সরস ভঙ্গীতে স্বচ্ছন্দে বলিয়া গেল! পৃথিবী বিদীর্ণ হইল না, বিদীর্ণ পৃথিবীর ভিতর হইতে নরকের অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া তাহাকে গ্রাসও করিল না! সব যেমন ছিল তেমনি রহিল। সিন্ধুপতির মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, সে বিষণ্ণ চিত্তে তাহার বিগত যৌবনের অন্তর্হিত দিনগুলির কথা চিন্তা করিতেছে। কারণ সত্যই তাহার মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল।

মহর্ষি সাবর্ণি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "নিরঞ্জনার জন্যই আমি এসেছি। কিন্তু তুমি যা ভাবছ সেজন্য আসি নি। আমি এসেছি নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করবার জন্যে। আমি তাকে কামের পঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে যাব। নিয়ে গিয়ে সমর্পণ করব সেই শঙ্করের চরণে, যিনি সতীনাথ, যিনি উমাপতি, যিনি মদনকে ভস্ম করেছিলেন, অথচ যিনি অনন্ত প্রেমের আকর। ভগবান নীলকণ্ঠ যদি আমার প্রতি বিরূপ না হন, তা হ'লে নিরঞ্জনা আজই পাটলিপুত্র ত্যাগ ক'রে মঠে প্রবেশ করবে—"

সিন্ধুপতির অধরে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিল।

"একটি কথা কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বন্ধু। নীলকণ্ঠ কন্দর্পকে ভস্ম করেছিলেন, কিন্তু বিলুপ্ত করতে পারেন নি। বিদেহী কন্দর্প আরও ভয়ানক। তিনি আগে ছিলেন পঞ্চ-শর, এখন হয়েছেন

অসংখ্য-শর। নিরঞ্জনা মূর্তিমতী রতি। তাকে সন্ন্যাসিনী করবার চেষ্টা করলে কন্দর্পের রোষে পড়বে বন্ধু। কথাটা মনে রেখো।"

"স্বয়ং শঙ্কর আমার সহায়। শঙ্করের কাছে এ প্রার্থনাও আমি জানাচ্ছি তিনি তোমাকেও রক্ষা করুন। তুমিও পাপের পঙ্কে ডুবে আছ সিন্ধুপতি—"

এই কথা বলিয়া সাবর্ণি বাহির হইয়া গেলেন, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। সিন্ধুপতি কিন্তু সঙ্গ ছাড়িলেন না, কিছু দূর গিয়ে তিনি সাবর্ণির কানে কানে পুনরায় বলিলেন, "কন্দর্পকে চটিও না। তাঁর রোষ ভয়ঙ্কর, প্রতিশোধ আরও ভয়ঙ্কর।"

সাবর্ণি এ কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, সিন্ধুপতির সহিত আলাপ করিয়া তিনি মোটেই সুখী হন নাই, তাঁহার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সতীর্থ সিন্ধুপতি যে একদিন নিরঞ্জনার প্রণয়ী ছিল, সে যে অর্থের বিনিময়ে নিরঞ্জনাকে ধারাবাহিকরূপে কিছুদিন ভোগ করিয়াছে—এই নিদারুণ সংবাদ যেন সাবর্ণির বুকে শেল হানিতেছিল। সুরত-প্রসঙ্গ মাত্রেই তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্তে জুগুপ্সার সঞ্চার করে, কিন্তু নিরঞ্জনা-সম্পর্কে এ প্রসঙ্গ তাঁহার চিত্তকে মথিত করিয়া বিষোদ্গিরণ করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এতদপেক্ষা ঘৃণ্যতর পাপ পৃথিবীতে আর যেন কিছু নাই, হইতেও পারে না। একটা অদৃশ্য ঈর্ষার অনলে তিনি যেন দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সিন্ধুপতিকে বারম্বার অভিশাপ দিলেন আর মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে শঙ্কর, আমাকে শক্তি দাও,—শক্তি দাও। প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মানসিক শক্তি সত্যই

যেন বর্ধিত হইল। তিনি মনে মনে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন, নটী নিরঞ্জনাকে যেমন করিয়া হোক পাটলিপুত্রবাসীদের কবলমুক্ত করিয়া তিনি লইয়া যাইবেন।

নিরঞ্জনার সহিত দিনের বেলা দেখা করা যায় না, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। সাবর্ণি যখন পাটলিপুত্রের পথে পুনরায় বাহির হইলেন তখন প্রভাতও উত্তীর্ণ হয় নাই। শঙ্করের কৃপালাভ করিবার জন্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ না নিরঞ্জনার সহিত দেখা হয় ততক্ষণ তিনি জলস্পর্শ পর্যন্ত করিবেন না। অনাহারেই তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে এক-একটা দেবমন্দির তাঁহার নয়নগোচর হইতেছিল। তাহারই কোন একটাতে প্রবেশ করিয়া শঙ্করের ধ্যানে তিনি সমস্ত দিন নিমগ্ন থাকিতে পারিতেন। কিন্তু একটিতেও তিনি প্রবেশ করিলেন না। তিনি জানিতেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সমস্ত মন্দির অপবিত্র করিয়া দিয়াছে। যেখানে ভগবান শঙ্করের বা বিষ্ণুর মূর্তি ছিল সেখানে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। ঈশ্বর অস্বীকৃত হইয়াছেন। ভক্তের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার করিয়া নাস্তিক বৌদ্ধরা নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছে। ওই সব চূড়াসমন্বিত বৃহৎ হর্ম্যগুলি আর ধর্ম-মন্দির নাই, উহারা ধার্মিক ভোগীদের লীলা-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। না, একটি মন্দিরেও তিনি প্রবেশ করিলেন না।

তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। পাটলিপুত্রের পথে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, তাঁহার আচরণ যেন প্রকৃত শৈবের মতো হয়, মুখভাবে যেন কোনও অভব্যতা প্রকটিত না হইয়া পড়ে। তাই সন্ন্যাসীসুলভ বিনয়ে তাঁহার দৃষ্টি কখনও

ভূমিনিবদ্ধ, কখনও বা তপস্বীসুলভ আনন্দে আকাশমুখী হইতে লাগিল। শিব-চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তিনি নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাবক্ষে এক সুসজ্জিতা ময়ূরপঙ্খী দক্ষিণা বাতাসে রঙীন পাল তুলিয়া পাড়ি জমাইতেছে। বলিষ্ঠকায় নাবিকেরা আরও পাল তুলিয়া ময়ুররূপিণী তরণীটিকে আরও বেগবতী করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তরণীর অভ্যন্তর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে সুমিষ্ট বাঁশীর সুর। হালের কাছে একটি অপ্সরীমূর্তি শূন্যে দুই বাহু মেলিয়া যেন আকাশে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে। সাবর্ণি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে পড়িল, তিনিও একদিন জীবন-সমুদ্রে ঠিক ওই ভাবেই পাড়ি জমাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। মায়া বা মোহের কবলে পড়িয়া তিনি বিভ্রান্ত হন নাই। অপ্সরী তাঁহার জীবনেও আসিয়াছিল কিন্তু টিকিতে পারে নাই, উড়িয়া গিয়াছে, উড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।....

নিকটেই এক স্থানে মোটা মোটা কাছি স্তূপীকৃত ছিল। তাহার উপর তিনি উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ পথ চলিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মনে হইল একটু বিশ্রাম না করিলে তিনি দুর্বল হইয়া পড়িবেন। নিরঞ্জনার সহিত সাক্ষাতের সময় দুর্বল হইয়া পড়িলে চলিবে না। ঘুমে তাঁহার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতেছিল, সেই কাছির উপরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

ঘুমের ঘোরে এক অতি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলেন তিনি। মনে হইল চতুর্দিকে যেন তূর্যধ্বনি হইতেছে, আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। স্বপ্নের ঘোরে তিনি আতঙ্কিত হইলেন, তাঁহার

আশঙ্কা হইতে লাগিত প্রলয় বুঝি আসন্ন। ভীতকম্পিত চিত্তে শঙ্করকে স্মরণ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন দীর্ঘ পদক্ষেপে এক বিরাট পুরুষ তাঁহার সমীপবর্তী হইতেছেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, এ বিরাট পুরুষ তাঁহার পূর্বপরিচিত। মনে পড়িল, আসিবার সময় পর্বতমালা-বেষ্টিত গ্রামে তিনি পাষাণময় যে বিরাট বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন তাহাই সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাস্যে সমুজ্জ্বল। লোকে যেমন শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তিনিও তেমনি তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর আবার চলিতে লাগিলেন। বহু নদ নদী পর্বত প্রান্তর পার হইয়া, রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহা ভয়ঙ্কর। চতুর্দিকে কেবল রুক্ষ পর্বতমালা আর ভস্ম—উত্তপ্ত ভস্ম। পর্বতগুলি রন্ধ্রময়, প্রতি রন্ধ্র হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। একটি প্রকাণ্ড গহ্বরের নিকটবর্তী হইয়া সেই বিরাট পুরুষ নিজ গতিবেগ রোধ করিলেন এবং তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন।

বলিলেন, "দেখ—"

সাবর্ণি গর্তের মুখে উঁকি দিয়া দেখিলেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। গহ্বরের ভিতরে অসংখ্য কৃষ্ণ প্রস্তরমালা এবং সেই প্রস্তরমালার ভিতর হইতে এক ভয়ঙ্করী অগ্নিতরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। সেই অগ্নিস্রোতের রক্তাভ আলোকে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা আরও ভয়ঙ্কর। অসংখ্য পিশাচ অসংখ্য মৃত ব্যক্তির আত্মাকে নির্যাতন করিতেছে। আশ্চর্যের বিষয়, মৃত ব্যক্তিদের দেহ বা পরিচ্ছদ বিকৃত বা বিলুপ্ত হয় নাই

প্রত্যেককে চেনা যাইতেছে। সাবর্ণি সবিস্ময়ে ইহাও লক্ষ্য করিলেন, নির্যাতনে ইঁহারা কেহই বিচলিত হইতেছেন না। সকলেরই মুখভাব শান্ত, কষ্টের কোন চিহ্ন নাই। দেখিলেন, এক দীর্ঘকায় গৌরাঙ্গ পুরুষ (সম্ভবত ইনি একজন কবি) অর্ধ-নিমীলিত নয়নে উদাত্ত কণ্ঠে গান করিতেছেন। ক্ষুদ্রকায় এক-দল দানব তাঁহার অধরে কণ্ঠে উত্তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতেছে। কবির কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি তন্ময়চিত্তে গানই গাহিয়া চলিয়াছেন। নিকটেই একজন জ্যোতিষী উপুড় হইয়া বসিয়া ধূলির উপর গণিতের অঙ্কপাত করিতেছিলেন, আর একটা পিশাচ তাঁহার কর্ণে উত্তপ্ত তৈল ঢালিতেছিল, কিন্তু তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছিল না। সাবর্ণি বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি আরও দেখিলেন, সেই অগ্নি-নদীর তপ্ত সৈকতে বহু বিদ্যার্থী নিবিষ্ট চিত্তে পাঠে মগ্ন—কেহ বা আলাপ করিতেছে, মনে হইতেছে কোনও তপোবনে যেন গুরু শিষ্যদের উপদেশ দিতেছেন। আরও একটু দূরে তিনি বৃদ্ধ কৌশিককেও দেখিতে পাইলেন, মনে হইল তিনি এসব কিছুই দেখিতেছেন না, কেবল অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িতেছেন। ভূগর্ভ হইতে একজন দেবদূত উঠিয়া আসিল। সে যে দেবদূত তাহা তাহাকে দেখিয়াই সাবর্ণি বুঝিতে পারিলেন। দেবদূত আসিয়া সম্মুখে দিব্য স্বর্গীয় আলোক বিকীর্ণ করিতে লাগিল, কিন্তু কৌশিক তাহাও দেখিতে পাইলেন না।

হতবুদ্ধি হতবাক্ সাবর্ণি তখন সেই বিরাট বুদ্ধমূর্তির দিকে চাহিতে গেলেন, দেখিলেন তিনি নাই। একটি অবগুণ্ঠিতা নারী দাঁড়াইয়া আছে।

সে বলিল, "ভাল ক'রে দেখ, ভাল ক'রে প্রণিধান কর। নরকে এসেও এদের চৈতন্য হয় নি। মর্ত্যলোকে যে সব মিথ্যা মায়া এদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল তা এখনও এদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। মৃত্যু এদের মোহমুক্ত করতে পারে নি। মরলেই ভগবানকে পাওয়া যায় না। জীবনে যারা সত্যকে উপলব্ধি করে নি, মৃত্যুর পরও তারা সে উপলব্ধি থে:ক বঞ্চিত হয়ে থাকে। যে সব পিশাচ আর দানব এদের নির্যাতন করছে তারা নির্মম নিয়তির মূর্ত প্রতীক। ওই অন্ধ মূঢ় আত্মারা এদেরও দেখতে পায় না, এদের নির্যাতনও অনুভব করতে পারে না, এদের শাসনের মর্মও বুঝতে পারে না। কোনরূপ সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা 'এদের নেই। নিজেদের সর্বনাশও এরা বুঝতে পারে না। এদের অন্তরে মোহের পাষাণ চেপে আছে, এদের দুঃখবোধও নেই, সে বোধ সঞ্চার করবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নেই—"

সাবর্ণি বলিলেন, "ভগবান সর্বশক্তিমান।"

অবগুণ্ঠিতা রমণী উত্তর দিল, "ভগবানও অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না। এদের শাস্তি দিতে হ'লে সর্বাগ্রে এদের অন্তরে চেতনার আলোকপাত করতে হবে। সত্য সম্বন্ধে এরা যদি সচেতন হয় তবেই এদের মুক্তি হবে—"

মহর্ষি সাবর্ণি ভীত চিত্তে পুনরায় গর্তের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এবার তিনি যেন সিন্ধুপতির আত্মাকে দেখিতে পাইলেন। মনে হইল, একটি অর্ধ-দগ্ধ চামেলীকুঞ্জের নিকট সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে বারাঙ্গনা অম্ব-পালী। অম্বপালীর স্বর্ণাভ অঙ্গচ্ছেদে, অপূর্ব মুখভাবে, কোমল

দৃষ্টিতে লালসা ও তিতিক্ষা, সত্য ও মায়া যেন যুগপৎ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভীষণ অগ্নিপ্রবাহ তাহাদের যেন কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই, বরং মনে হইতেছে তাহারা যেন আসন্ন প্রভাতের উষালোকে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের পদতলে যেন উত্তপ্ত সৈকত-ভূমি নাই, শ্যামল তৃণাস্তরণ রহিয়াছে। সিন্ধুপতিকে দেখিবামাত্র সাবর্ণি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ভগবান শঙ্কর, ওকে ধ্বংস কর, ভস্ম কর, নিপাত কর। ও নিরঞ্জনাকে নষ্ট করেছে—"

সাবর্ণির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন, একটি শক্তিশালী ব্যক্তি তাঁহাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। বলিতেছে, "কে মশাই আপনি, আপনার মাথা খারাপ নাকি? এমনভাবে এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন? এ কি ঘুমোবার জায়গা! আর একটু হ'লে জলে গড়িয়ে প'ড়ে যেতেন যেতেন যে! ভাগ্যে আমি এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম! উঠুন, দাঁড়ান।"

সাবর্ণি কেবল দুইটি মাত্র কথা বলিলেন, "জয় শঙ্কর!" তাহার পর আবার তিনি চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে অদ্ভুত স্বপ্নের কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, স্বপ্নটি শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ স্বপ্নে নরকের যে দৃশ্য তাঁহার মানস-পটে প্রতিফলিত হইল তাহা ভগবদ্-মহিমাবর্জিত, উহা নরকের সত্য চিত্রই নহে। কোন্ স্বপ্ন শুভ, কোন্ স্বপ্ন অশুভ, কোন্‌টাতে দেবতার প্রভাব, কোন্‌টাতে দানবের—তাহা তিনি সহজেই নির্ণয় করিতে পারিতেন, কারণ বহুকাল মনুষ্য-সমাজের বাহিরে বহুদূরে আরণ্য পরিবেশে বাস করিয়া তিনি নানাপ্রকার অদেহী দেব-

দানবের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। দানবেরা যে মায়ারূপ ধারণ করিয়া সাধুদের সর্বদাই বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে—এ কথা তিনি ভালভাবেই জানিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের মতো লোককেও স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাতে ছুটিতে হইয়াছিল। দানবেরা খুবই ধূর্ত, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করাও খুব কঠিন। সীতা কি সন্ন্যাসী-বেশী রাবণকে চিনিতে পারিয়াছিলেন? নল যখন নিদ্রিতা দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন কি তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন, কে তাঁহাকে এই হীনকার্যে প্ররোচিত করিতেছে? না, মায়াবী দানবদের চেনা খুব সহজ নয়। কিন্তু মহর্ষি সার্বর্ণিকে ফাঁকি দেওয়াও খুব সহজ নয়। তিনি অচিরাৎ বুঝিতে পারিলেন, যে স্বপ্নটি তিনি এখন দেখিলেন'তাহা দানবীর মায়া মাত্র। চন্দ্রমৌলি ধূর্জটি তাঁহাকে এমনভাবে দানবের কবলে কেন নিক্ষেপ করিলেন—এই কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি পথ চলিতেছিলেন। সহসা লক্ষ্য করিলেন—তিনি জনস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছেন, তাঁহার চতুর্দিকে ভীড়। ইহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, স্রোতের গতি একমুখী, অর্থাৎ সকলেই একই স্থান অভিমুখে চলিয়াছে। নগরের জনতায় সুষ্ঠুভাবে চলিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না, সুতরাং নদীস্রোত-বাহিত জড়পদার্থের ন্যায় তিনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। নিজেরই গৈরিক অঙ্গচ্ছেদে পা জড়াইয়া দুই-একবার পড়িয়াও গেলেন। তিনি বুঝিতেই পারিলেন না, এতগুলি লোক এত দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়াছে। কোথাও কি আগুন লাগিয়াছে, না, আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? জনতার মধ্যে একজনকে ডাকিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা এমন দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়াছেন?"

লোকটি উত্তর দিল, "আপনি শোনেন নি নাকি? আজ রঙ্গমঞ্চে বিরাট পৌরাণিক নাটক অভিনয় হচ্ছে যে। অনেক বড় বড় অভিনেতা নামবেন, দৌপদীর ভূমিকায় নামছেন স্বয়ং নিরঞ্জনা। সকলেই তাই সেখানে চলেছে। আপনি যদি যেতে চান, আসুন আমার সঙ্গে।"

নিরঞ্জনা নামিতেছে? মহর্ষি সাবর্ণি ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এতগুলি লোকের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে নিরঞ্জনা কি ভাবে নিজেকে প্রকটিত করিবে? সে দৃশ্য কি তিনি সহ্য করিতে পারিবেন? দ্রৌপদীর ভূমিকায়? পঞ্চপতির স্ত্রী দ্রৌপদী—! তাহার পর সহসা আবার তাঁহার মনে হইল, এই ভীড়ের মধ্যেই নিরঞ্জনার সহিত দেখা হওয়া ভাল। দূর হইতে নিরঞ্জনার চেহারা হাবভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন, সে আয়ত্তাতীত কি না! তিনি লোকটির সঙ্গ লইলেন। বেশীদূর যাইতে হইল না, অনতিদূরেই রঙ্গমঞ্চ দেখা গেল।

রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ বেশ মনোরম মনে হইল। সম্মুখেই অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা, তাহাতে বহু মর্মরমূর্তি সুসজ্জিত। জনতাকে অনুসরণ করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি ও তাঁহার সঙ্গী একটি সঙ্কীর্ণ গলি পার হইয়া অবশেষে বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চতুর্দিক আলোকে আলোকময়। অনেক দর্শক ইতিমধ্যেই আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাও উভয়ে পাশাপাশি দুইটি আসন গ্রহণ করিলেন। সাবর্ণি দেখিলেন, রঙ্গমঞ্চে কোনও যবনিকা নাই। রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া একটি অলোকিত প্রান্তর দেখা যাইতেছে। আলোকিত প্রান্তরে বেদীর মতো একটি উচ্চ স্থান রহিয়াছে এবং তাহার এক পার্শ্বে একটি

দণ্ডের উপর একটি গোলাকার চক্রের মধ্যে একটি মৎস্য বিলম্বিত রহিয়াছে। আকাশপটে চক্রটি অদ্ভুত দেখাইতেছিল। বেদীটির আশেপাশে কাছে দূরে ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি শিবিরও দৃশ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি শিবিরের সম্মুখে তরবারি ঝুলিতেছে, শিবিরশীর্ষে শোভা পাইতেছে পুষ্পশোভিত স্বর্ণময় ঢাল। সাবর্ণি বিস্ফারিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। দর্শকদের গুঞ্জনধ্বনি ছাড়া চতুর্দিকে আর কোন শব্দ নাই। সকলেরই দৃষ্টি ওই বেদী এবং শিবিরগুলির উপর নিবদ্ধ। মহর্ষি সাবর্ণি সহসা চক্ষু মুদিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কোনও কথা বলিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। কিন্তু যাঁহার সঙ্গে তিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার প্রকৃতি অন্যরূপ। কথা না বলিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। তিনি নাট্য-শিল্পের অধঃপতন সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

বলিতে লাগিলেন, "আগে অভিনেতারা উদাত্ত কণ্ঠে কাব্য আবৃত্তি ক'রে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। তাঁদের আবৃত্তিতেই কাব্যরস মূর্ত হয়ে উঠত সবার মনে, টিকা বা ভাষ্যের প্রায়োজনই হ'ত না। এখন আবৃত্তি উঠে গেছে, তার জায়গায় এসেছে অভিনয়, মানে অঙ্গভঙ্গী—কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী। উদ্দেশ্য ইতর লোককে খুশী করা। এখন আর রসিকের স্থান কোথাও নেই মশাই, যেখানেই যান, দেখবেন বেরসিকের দল কিলবিল করছে। মেয়েরাও প্রকাশ্যে অভিনয়ে যোগ দিচ্ছে আজকাল। এমনিতেই তো মেয়েরা আমাদের পরম শত্রু, আমাদের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়ে গোল্লায় পাঠাচ্ছে আমাদের; তার উপর যদি এখন খোলাখুলি-ভাবে রঙ্গমঞ্চে অঙ্গভঙ্গী করবার সুযোগ পায় তা হ'লে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ—"

মহর্ষি সাবর্ণি বলিলেন, "ঠিকই বলছেন আপনি, মেয়েরাই আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। তারা আনন্দদায়িনী, সেই জন্যই বোধ হয় ভয়ঙ্করী। আপনার নামটি জানতে পারি কি ?"

"আমার নাম ডমরু। ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। মেয়েরা মোটেই আনন্দদায়িনী নয়, ঠিক উলটো। আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, সমস্ত চিন্তা-ভয়ের কারণ ওরাই। আমাদের তীব্রতম বেদনার কারণ কি জানেন ? প্রেম। সম্রাট অশোকের নাম নিশ্চয় শুনেছেন আপনি ?"

"শুনেছি।"

"তিনি বুড়ো বয়সে তিষ্যরক্ষিতা নামে এক নর্তকীর প্রেমে প'ড়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন—এ-ও নিশ্চয় আপনার অজানা নয় ?"

"এ কথাও শুনেছি।"

"তিষ্যরক্ষিতা কি করেছিল স্মরণ আছে কি আপনার ?"

"না, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে মনে হচ্ছে তিনি কি একটা যেন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন।"

"ব্যভিচার ব'লে ব্যভিচার! অশোকের যুবকপুত্র কুণালকে পাপ-পথে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কুণাল যখন তাতে অসম্মত হলেন, তখন সে অশোকের কাছে মিথ্যা নালিশ করলে যে, কুণাল জোর ক'রে তার ধর্ম নষ্ট করতে চায়। এ কথা শুনে অশোক কুণালের চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে দূর ক'রে দিলেন তাকে দেশ থেকে। অন্ধ কুণাল পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগলেন। এক শিল্পী অন্ধ কুণালের একটি চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন। সে ছবিটি আমি অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি,

কিনে টাঙিয়ে রেখেছি আমার শোবার ঘরে। ছবিটি প্রতিদিন আমাকে মনে করিয়ে দেয়—'নারী ভয়ঙ্করী।"

মহর্ষি সাবর্ণি কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিসে আপনি সুখ পান ডমরু?"

"আমি?"—ডমরু ম্লান হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি অক্ষম পেট-রোগা লোক, বেশী সুখ ভোগ করবার সামর্থ্য আমার নেই। কেবল একটি মাত্র জিনিসে আমি সুখ পাই—চিন্তা। আমাকে আপনি চিন্তাশীল বলতে পারেন।"

ডমরুর এই মনোভাবের সুযোগ লইয়া মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহার চিত্তে আধ্যাত্মিক আলোকপাত করবেন মনস্থ করিলেন।

"ভাই ডমরু, যদি প্রকৃত সুখের অভিলাষী আপনি হন, আমি কিছু সাহায্য করতে পারি—"

"বলুন, শুনি।"

"শুনুন তা হ'লে। সত্যই সুখের উৎস। এই উৎসের স্বরূপ কি এবং কি করলে তা আয়ত্ত করা যায় তা বলবার আগে—"

"চুপ, চুপ, চুপ করুন।"

বহু লোক হাত তুলিয়া সাবর্ণিকে থামাইয়া দিল। চতুর্দিকে নিবিড় নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। তাহার পর সহসা শিবির-গুলির ভিতর হইতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

অভিনয় আরম্ভ হইল। সুসজ্জিত ক্ষত্রিয় নৃপতিরা একে একে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিলেন। তাহার পর সেই বেদী উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সকলে সবিস্ময়ে ও সহর্ষে দেখিলেন, দ্রৌপদী-বেশিনী নিরঞ্জনা দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দর্শকের অন্তরে আনন্দের

শিহরণ সঞ্চারিত হইল। ক্ষণ-পরেই সেই বেদীর উপর হোমশিখা জ্বলিয়া উঠিল, দ্রুপদের কুলপুরোহিত তাহাতে আহুতি প্রদান করিলেন এবং মন্ত্র পাঠ করিবার পর হস্ত উত্তোলন করিলেন। সমস্ত বাদ্য নীরব হইল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "সমাগত বীরগণ, আজ ষোড়শ দিবস। আমার ভগ্নী কৃষ্ণা আজ স্নানান্তে উত্তম বসন, উপযুক্ত অলঙ্কার এবং কাঞ্চনী মাল্য ধারণ ক'রে সভায় অবতীর্ণা হয়েছেন, তিনি স্বয়ম্বরা হবেন। আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহারাজ দ্রুপদ ঘোষণা করেছেন, তাঁর প্রদত্ত ধনুতে গুণ পরিয়ে শূন্যে স্থাপিত যন্ত্রমধ্যস্থ মীনের প্রতিবিম্ব মাত্র দর্শন ক'রে যিনি উক্ত মীনের চক্ষু ভেদ করতে পারবেন তিনি কৃষ্ণাকে পাবেন। পার্শ্বেই জলপাত্রে মীনের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে, এই সেই ধনু, এই বাণ এবং ওই লক্ষ্য। যন্ত্রটির মধ্যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে পাঁচবার শরসন্ধান ক'রে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। উচ্চ কুলজাত, রূপবান যে বর এই দুঃসাধ্য কর্ম করতে পারবেন, আমার ভগ্নী কৃষ্ণা তাঁর ভার্যা হবেন—এই সত্য আমি সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি।" তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সমাগত রাজন্যবর্গের পরিচয় প্রদান করিলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ, বিরাটরাজ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ, মদ্ররাজ শল্য, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি সকলের পরিচয় বিবৃত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, "এইবার আপনারা একে একে শর-সন্ধান করুন।"

ব্রাহ্মণদের বেশ ধারণ করিয়া পঞ্চপাণ্ডবগণও ব্রাহ্মণদের

সহিত মঞ্চস্থলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহাদের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাঁহাদের চিনিতে পারিলেন। তাঁহাদের মত্তগজেন্দ্রবৎ আকৃতি ও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ দীপ্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ইহার পর শর-সন্ধান আরম্ভ হইল।

অধিকাংশ রাজা যদিও দ্রৌপদীকে লাভ করিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কন্দর্পবাণে আহত হইয়া সদর্পে পরস্পরের সহিত স্পর্ধিত বাক্য-বিনিময়ও করিতেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্যভেদে তাদৃশ সফলকাম হইলেন না। অনেকে ধনুতে গুণ পর্যন্ত পরাইতে অক্ষম হইলেন। অনেকে ধনুর আঘাতে ভূশায়ী হইয়া জনতার উপহাসের লক্ষ্যস্থল হইলেন। দুই-একজন ধনু উত্তোলন পর্যন্ত করিতে পারিলেন না। এক-একজন বীর এইভাবে যেমনিই ব্যর্থকাম হইতে লাগিলেন, অমনই জনতার ভিতর হইতে তুমুল হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

অলঙ্কারভূষিতা কাঞ্চনমাল্যশোভিতা কৃষ্ণা কিন্তু নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন তন্ময় হইয়া কাহারও ধ্যান করিতেছেন।

সাবর্ণি মুগ্ধনেত্রে দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া ছিলেন। কত কথাই তাঁহার মনে হইতেছিল! কৃষ্ণার গম্ভীর ধ্যানমগ্ন মূর্তির দিকে চাহিয়া তাঁহার আশা হইতেছিল, তিনি সফল হইবেন। নিরঞ্জনার মুখে যখন এখনও এমন পবিত্র দীপ্তি জাজ্বল্যমান, তখন পাপ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে নাই—এখনও তাহার উদ্ধারের আশা আছে।

সহসা কবচকুণ্ডলধারী এক দিব্যকান্তি যুবা সদর্পে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ধনুতে গুণ পরাইলেন এবং জ্যা আকর্ষণপূর্বক টঙ্কারধ্বনি করিলেন। সকলে বুঝিতে পারিলেন, মহাবীর কর্ণ শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। জনতার মধ্যে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হইল। চতুর্দিকে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন, কর্ণ হয়তো লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। কৃষ্ণা এতক্ষণ প্রস্তরপ্রতিমাবৎ ধীর স্থির নিস্পন্দ ছিলেন, সহসা তিনি সঞ্জীবিত হইলেন। এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সুতপুত্রকে বরণ করব না। ওঁর শরসন্ধান করবার প্রয়োজন নেই—"

কর্ণের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর উচ্চ হাস্য করিয়া তিনি ধনু দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর আসিলেন চেদিরাজ শিশুপাল। তিনি ধনুতে গুণ পরাইতে পারিলেন না, জানু পাতিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মহাবীর জরাসন্ধও অপারগ হইলেন। বক্রোক্তিতে এবং ব্যঙ্গহাস্যে চতুর্দিক মুখরিত হইতে লাগিল। তখন মদ্ররাজ শল্য সদর্পে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কিন্তু সেই বিশাল ধনু বক্র করিতে গিয়া নিজেই ভূশায়ী হইলেন। হাস্য-কোলাহল তুমুল হইয়া উঠিল। এইরূপ একে একে অনেক বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বীর শরসন্ধানে ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। তখন ব্রাহ্মণদিগের ভিতর হইতে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন গাত্রোত্থান করিলেন। এক দীন ব্রাহ্মণের এই উচ্চাভিলাষ দেখিয়া অনেক বিস্মিত হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বারণও

করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বীরদের পক্ষে যাহা অসাধ্য, দুর্বল ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা সাধ্য হইবে কিরূপে? আমরা এখানে হাস্যাস্পদ হইতে আসি নাই। আমাদের প্রতিপালক রাজন্যবর্গের বিদ্বেষভাজন হইতেও চাহি না। কোন ব্রাহ্মণ-সন্তানেরই এই ক্ষাত্র প্রতিযোগিতায় যোগদান করা উচিত নহে। আর একদল ব্রাহ্মণ কিন্তু ঠিক বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করিলেন: এই যুবার গমনভঙ্গী সিংহের ন্যায়, আশা করা যায় ইঁহার বিক্রমও সিংহের মতো হইবে, সুতরাং ইনি সফলকাম হইতে পারেন। ইঁহাকে বারণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ যে সর্বকর্মকুশল হইতে পারেন, জল বায়ু বা ফলমাত্র আহার করিয়াও তিনি শক্তিমান হইতে পারেন—এই সত্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করাই কর্তব্য—

অর্জুন অগ্রসর হইয়া আসিয়া ধনুর নিকট বিরাট পর্বতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধনু প্রদক্ষিণ করতঃ বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া ধনু উত্তোলন করিলেন। তাহার পর যাহা হইল তাহা সকলেই প্রত্যাশা করিতেছিলেন—অনায়াস-দক্ষতা-সহকারে ধনুতে গুণ পরাইয়া তিনি একে একে পাঁচটি শরসন্ধান করিয়া নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিলেন। লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। অন্তরীক্ষ ও সভাস্থলে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ সহর্ষে উত্তরীয় আস্ফালন করিতে লাগিলেন, তূর্যধ্বনি দশ দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিল, পরাজিত রাজবৃন্দ লজ্জায় অধোবদন হইয়া 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিলেন; সুত মাগধগণের স্তুতিপাঠে রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হইয়া উঠিল। দ্রুপদ

এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় আনন্দিত হইলেন। আর কৃষ্ণা? তাঁহার মুখভাবে যাহা প্রকাশিত হইল তাহা অবর্ণনীয়। ইন্দ্রতুল্য অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, মনে হইল তাঁহার অন্তর-দীপ যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, হাস্য না করিয়াও তিনি যেন হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া একটি বাক্যও নির্গত হইল না, তাঁহার দৃষ্টিই বাঙ্ময় হইয়া উঠিল, ভাবাবেগে তিনি বিহ্বল হইয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার আচরণে অশোভন চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

সহসা পরাজিত রাজন্যবৃন্দ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। জয়দ্রথ চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলেন, "বন্ধুগণ, আমি দ্রুপদ-কন্যাকে হরণ করিব, তোমরা আমার সহায় হও—"

তিনি সদলবলে ভীমপরাক্রমে পাঞ্চালীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সহসা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কার্মুকে টঙ্কার দিয়া বীরদর্পে তাঁহাকে বাধা দিলেন। তাঁহার পর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি লক্ষ্যভেদ করিয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে যে কন্যাকে বধূরূপে অর্জন করিয়াছেন তাহাকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার সহায়তা করিব—"

অর্জুন ত্বরিতহস্তে ধনুর্বাণ তুলিয়া সিংহবৎ গর্জন করিয়া উঠিলেন। সে গর্জন সত্যই ভয়ঙ্কর। সে গর্জনে জয়দ্রথের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর অর্জুন যখন শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হইল তাহা যুগপৎ বিস্ময়কর ও হাস্যকর। প্রভঞ্জনের সম্মুখে শুষ্ক পত্ররাশির ন্যায় সকলে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

সহসা সাবর্ণি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া

পড়িয়াছিলেন। হস্ত আস্ফালন করিয়া তিনি তারস্বরে বলিতে লাগিলেন, "পাটলিপুত্রের অধিবাসীরা, শ্রবণ কর। আজ যে অভিনয় তোমরা দেখলে, নূতন ধরনে সে অভিনয় আর একবার হবে। তোমরা শ্রবণ কর, ঘৃণ্য কাপুরুষদের হাত থেকে আমিও অর্জুনের মত কৃষ্ণাকে উদ্ধার করব। সে কৃষ্ণা কাব্যের নায়িকা নয়, বাস্তবের মানবী। সে জানে না যে, সে নিরঞ্জনা—"

আশেপাশে যাহারা ছিল তাহারা সকলেই সাবর্ণির দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাঁহার অদ্ভুত উক্তি শুনিয়া বিস্মত হইল। অনেকে ভাবিল লোকটা পাগল। অনেকে হাসিল, অনেকে ব্যঙ্গও করিল। তাহার পর কেহই তাঁহার প্রতি আর বিশেষ মনোযোগ দিল না। অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছিল, সকলেই রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল।

ডমরুও সাবর্ণির এই অদ্ভুত আচরণে কম বিস্মিত হন নাই। এ বিষয়ে হয়তো তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, সাবর্ণি কিন্তু সে সুযোগ দিলেন না, ডমরুকে এড়াইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

এক ঘণ্টা পরে তিনি নিরঞ্জনার দ্বারে গিয়া কারাঘাত করিলেন।

নিরঞ্জনা বাস করিত নগরের বাহিরে এক বিরাট সুসজ্জিত প্রাসাদে। ছায়াশীতল কাননপরিবৃত প্রাসাদটি অপরূপ। প্রাসাদ-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কৃত্রিম পাহাড়, ঝরনা, উৎস, এমন কি ছোট একটি নদী পর্যন্ত ছিল। নদীর দুই তীরে ছিল দেবদারু চন্দন বকুল প্রভৃতির বীথি।

করাঘাতের উত্তরে দ্বার খুলিয়া গেল। সাবর্ণি দেখিলেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহার উভয় হস্তেরই প্রতি অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয় এবং প্রতিটি অঙ্গুরীয় বহুমূল্য প্রস্তরখচিত।

সাবর্ণি কহিলেন, "আমি নিরঞ্জনার সঙ্গে এখনি দেখা করতে চাই। তার কাছে আমাকে অবিলম্বে নিয়ে চল।"

সাবর্ণির অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ দেখিয়া এবং কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর শুনিয়া ভৃত্যটি আপত্তি করিতে সাহস করিল না। বলিল, "আপনি ভিতরে আসুন। দেবী বাগানের মধ্যে শিলানিবাসে আছেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিরঞ্জনার শৈশব ইতিহাস অতিশয় করুণ। তাহার জন্ম হইয়াছিল একটি পান্থশালায় এবং সেই পান্থশালাতেই তাহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার পিতা মণিবজ্র সারথি নগরের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত এই পান্থশালাটির প্রভু এবং পরিচালক ছিলেন। পান্থশালায় নানাপ্রকার পান্থের সমাবেশ হইত। বিদেশী বণিকেরাও আসিতেন; তা ছাড়া আসিতেন গান্ধার, বাহ্লীক, গ্রীক, সিরিয়ার পর্যটকেরা। স্থানীয় অনেক রাজ-কর্মচারীরাও অসিতেন—বিশেষ করিয়া সেনা-বিভাগের লোকেরা। কিন্তু সে পান্থশালায় আর একদল লোকও যাতায়াত করিতেন, যাঁহাদের আচার আচরণ একটু অসাধারণ ছিল। তাঁহারা নিজেদের বৌদ্ধ নামে পরিচিত করিতেন বটে, কিন্তু যে ধর্ম তাঁহারা অনুসরণ করিতেন সে ধর্মের নাম ছিল গুহ্যধর্ম, কারণ তাহা প্রকাশ্যে আচরণীয় ছিল না, সে ধর্মাচরণের জন্য গোপনতার আশ্রয় লইতে হইত। নিরঞ্জনার পিতা মণিবজ্র ছিলেন তাঁহাদের নেতা এবং গুরুস্থানীয়। সমস্তই গোপনতার আবরণে আবৃত থাকিত। পান্থ-শালার নিত্যপরিবর্তনশীল পরিবেশে, নিত্য নব আগন্তুকদের আবির্ভাবে এবং অন্তর্ধানে যে প্রভাব নিরঞ্জনার অজ্ঞাতসারেই তাহার চরিত্রগঠন করিতেছিল, সে প্রভাব তাহাকে দার্শনিকতার উচ্চলোকে হয়তো একদিন উন্নীত করিতে পারিত; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। পান্থশালার চলমান জীবনধারার যে স্বাদ সে পাইয়াছিল তাহা বৈচিত্র্যপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু কলুষিত। সে

আনন্দে সন্তরণ করিতে পারে নাই, খরস্রোতে বারম্বার পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়া ক্রমাগত বিপর্যস্তই হইয়াছিল। আনন্দ নয়—ক্ষোভ, ভয়, বিস্ময় তাহার শৈশব জীবনকে যে বিচিত্র রূপ দান করিয়াছিল তাহা আর যাহাই হউক মহিমান্বিত ছিল না।

নিরঞ্জনার চিত্তপটে শৈশবের কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত ছিল। তাহার মধ্যে একটি চিত্র এই।—তাহার পিতার শিষ্যেরা একদিন গভীর রাত্রে একটি কিশোরী চণ্ডাল-কন্যাকে লইয়া পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন। সেদিন বিশেষ প্রকার আহারাদির বন্দোবস্তও ছিল। ছাগমাংস, কুক্কুটমাংস তো ছিলই, কুক্কুরমাংসও আহারের উপকরণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত মাংস সংগ্রহের জন্য একটি চণ্ডাল একটি কৃষ্ণা কুক্কুরীকে মুদ্গরাঘাতে বধ করিয়াছিল। সুরা তো ছিলই। আরও সব নানাবিধ অদ্ভুত উপকরণও সঞ্চিত হইয়াছিল, সেগুলি নিরঞ্জনাকে দেখানো হয় নাই। নিরঞ্জনার মা যোগিনী এই গুহ্যপূজায় যোগ দিতেন অর্থের লোভে। নিরঞ্জনার সন্দেহ হইত, পূজার পদ্ধতিতে তাঁহার অন্তরের তেমন সায় যেন ছিল না। ওই কিশোরী চণ্ডাল-কন্যকে তিনি যেন ঈর্ষা-পূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থলিপ্সা তাঁহার ঈর্ষাকে পরাজিত করিয়াছিল। মণিবজ্রের শিষ্যেরা সকলেই প্রায় ধনী ছিলেন। গুহ্যপূজার অয়োজন করিবার অছিলায় যোগিনীর হস্তে প্রচুর অর্থ দিতেন। পূজার আয়োজন করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত—প্রচুর থাকিত—তাহা যোগিনীরই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত। যোগিনী এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। যেদিন ওই চণ্ডাল-কন্যাকে আনা হইয়াছিল সেদিন যোগিনীর হস্তে একজন শিষ্য এক শত স্বুবর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে কেহ

দিয়াছিলেন পঞ্চাশ, কেহ কুড়ি। দশের কম কেহই দেন নাই। যোগিনী শুধু লোভ-পরবশ হইয়াই যে গুহ্যপূজায় সহযোগিতা করিতেন তাহা নয়, প্রতিবাদ করিবার সাহসও তাঁহার ছিল না। মণিবজ্রকে তিনি ভয় করিতেন। কারণ ক্রুদ্ধ মণিবজ্র ক্ষিপ্ত মহিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিলেন। রাগিয়া গেলে তাঁহার হিতাহিতজ্ঞান থাকিত না। প্রতিবাদ করিয়াছিল বলিয়া একবার যোগিনীকে তিনি প্রহার করিতে করিতে অর্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যোগিনী অবশ্য তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অর্থ-লোভ ছিল। ক্রমশ এ বিশ্বাসও তাঁহার হইয়াছিল যে, সহধর্মিণী হিসাবে স্বামীর ধর্মাচরণে বিঘ্ন উৎপাদন করা তাঁহার পক্ষে অনুচিত। সুতরাং গুহ্যপূজায় তিনি সহায়তা করিতেন। ওই চণ্ডাল-কন্যাকে একটি ভিন্ন ঘরে লইয়া গিয়া গভীর রাত্রে গোপনে কি ধরনের পূজা যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নিরঞ্জনা তখন বুঝিতে পারে নাই। গভীর রাত্রে সে কেবল শুনিতে পাইয়াছিল, চণ্ডাল-কন্যাটি চীৎকার করিতেছে এবং তাহার সে চীৎকারের সহিত মিশিয়াছে সঙ্গীত, মন্ত্রপাঠ এবং অট্টহাস্য।

মণিবজ্রের শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নিরঞ্জনাকেও অন্তরালে লইয়া গিয়া মাঝে মাঝে কি সব বলিতেন, নিরঞ্জনা বুঝিতে পারিত না। তাঁহাদের বক্তব্য যে অশ্লীল তাহা বুঝিবার বয়সও তখন তাহার হয় নাই। কিন্তু তাহার মনের এ শুচিতা বেশীদিন অক্ষুণ্ণ রহিল না। সমর্থ পুরুষদের মনোযোগ অকালেই তাহার বয়স বাড়াইয়া দিল। ক্রমশ সে সবই বুঝিতে শিখিল।

যখন তাহার বয়স নয় বৎসর, তখন মণিবজ্রের এক শিষ্য হেবজ্র নামক এক অদ্ভুত দেবতার মূর্তি তাহাকে দেখাইয়াছিল। মূর্তিটি

সত্যই অদ্ভুত। অষ্টশির, ষোড়শভুজ এক বলিষ্ঠ দেবতা এক তরুণীকে ক্রোড়ে তুলিয়া দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, এক-জনের নাক আর একজনের নাক স্পর্শ করিয়া আছে। দেবতাটির. পদতলে কতকগুলি শবদেহ। প্রতিভাবান শিল্পীর হস্তে উৎকীর্ণ সেই প্রস্তরমূর্তি নিরঞ্জনাকে কিছুদিন সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে সমস্ত দিন ওই কথাটা চিন্তা করিত, রাত্রে স্বপ্নও দেখিত।

…এইভাবে কিছুদিন কাটিল। নিরঞ্জনার বয়স আর একটু বাড়িল। সে ক্রমশ অনুভব করিতে লাগিল যে, পুরুষেরা নানা ছলে তাহার সান্নিধ্য কামনা করে। সন্ধ্যাবেলায় যুবকদল তাহারই উদ্দেশে গান গাহিয়া পান্থশালার আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে পান্থশালায় আসিয়া খাবার খায় তাহাকে দেখিবে বলিয়া। একদিন সন্ধ্যাকালে কয়েকজন বিদেশী বণিক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের শিরস্ত্রাণ, মুখে চাপ-দাড়ি, আগুল্ফলম্বিত রেশমী পোশাকে উগ্র আতরের গন্ধ। প্রত্যেকেই বলিষ্ঠ। তাহারা আসিয়া দাবী করিল 'আমরা উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পানীয় চাই। দুই রাত্রি তোমার এখানে বাস করিব। দুই দিন, দুই রাত্রির জন্য তোমার কন্যাটিকেও চাই, সে-ই আমাদের সর্ববিধ সেবা করিবে। অন্য কোন ভৃত্যের প্রয়োজন নাই। ইহার জন্য যত অর্থ চাও পাইবে।' মণিবজ্র দুই শত স্বর্ণমুদ্রা চাহিলেন, বণিকেরা সানন্দে সম্মত হইল। তাহাদের পরুষ স্পর্শ এবং পাশবিক ব্যবহার নিরঞ্জনার অন্তরে যেন একটা অপ্রত্যাশিত বিপ্লব ঘটাইয়া দিল। সে কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল, একটা অজ্ঞাতপূর্ব রহস্যময় অরণ্যে সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। শুধু যে ভীত হইল তাহা নয়, পুরুষের আচরণে একটা আত্মপ্রসাদের

খোরাকও পাইল। বণিকের দল চলিয়া যাইবার পূর্বে মণিবজ্রকে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা তো দিলই, নিরঞ্জনাকেও পৃথকভাবে দশটি স্বর্ণ-মুদ্রা দিল। কিন্তু সে স্বর্ণমুদ্রা নিরঞ্জনার হাতে বেশীক্ষণ থাকিতে পাইল না, বণিকের দল পথের বাঁকে অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে যোগিনী তাহা ছিনাইয়া লইলেন।

ক্রমশ যোগিনী এবং মণিবজ্র বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের কন্যাটি নিতান্ত নগণ্য নয়। ইহাও তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইদানীং মুখ্যত তাহার আকর্ষণেই তাহাদের পান্থশালায় দলে দলে পান্থসমাগম হইতেছে। একদিন মণিবজ্রের এক শিষ্য প্রস্তাব করিলেন, নিরঞ্জনাকে এইবার গুহ্যপূজার কন্যারূপে বরণ করা হোক। মণিবজ্র শিষ্যের নিকট খোলাখুলিভাবে অর্থ দাবী করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। বলিলেন, নিরঞ্জনা এখনও দ্বাদশ বর্ষে পড়ে নাই, তা ছাড়া উহার মা যোগিনী সম্মত না হইলে গুহ্যপূজায় তাহাকে নিয়োগ করা উচিত হইবে না। যোগিনীর সম্মতি পাইতে অবশ্য বিলম্ব হয় নাই। স্বর্ণমুদ্রার লোভে তিনি রাজী হইয়াছিলেন। মণিবজ্র গোপনে তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন—যদি দুই শত মুদ্রা পাও রাজী হইয়া যাইবে। যোগিনী বলিয়াছিলেন, কিন্তু নিরঞ্জনা যদি রাজী না হয়! সে আজকাল ক্রমশ অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। ইহা শুনিয়া মণিবজ্রের চক্ষু দুইটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিলেন—যদি এমনিতে রাজী না হয়, চাবুক আছে।

ইহার পর হইতেই নিরঞ্জনার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। পিতৃগৃহ নরকে পরিণত হইল। অপরিচিত অসভ্য পুরুষদের সঙ্গ

তাহার প্রায়ই ভাল লাগিত না, মাঝে মাঝে সে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু চাবুক ছিল। মণিবজ্রের নির্মম প্রহার হইতে যোগিনীও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। ভগবান কিন্তু একজন রক্ষক জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের পুরাতন ভৃত্য কিঙ্কর। নিরঞ্জনাকে অতি শৈশব হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল সে। মণিবজ্রের অমানুষিক অত্যাচার হইতে সে-ই তাহাকে রক্ষা করিত। কিঙ্করের সহায়তায় নিরঞ্জনা মাঝে মাঝে পলায়ন করিত। কোথায় যাইত, কোথায় থাকিত তাহা কিঙ্কর ছাড়া আর কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। অনেক সময় একাধিক দিন সে আত্মগোপন করিয়া থাকিত, কিঙ্করই তাহাকে খাবার দিয়া আসিত। কিঙ্করেরই খোশামোদ করিয়া মণিবজ্র এবং যোগিনী—বিশেষ করিয়া যোগিনী, পুনরায় নিরঞ্জনাকে গৃহে লইয়া আসিতেন। প্রতিশ্রুতি দিতেন, আর তাহাকে কিছু বলিবেন না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও তাঁহারা বিলম্ব করিতেন না, আবার সে কিঙ্করের সহাতায় পলায়ন করিত। এইভাবেই কিছুদিন চলিল।

মণিবজ্র ও যোগিনীকে ক্রমশ এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইল যে, নিরঞ্জনা পশু নয়, মানুষ। তাহার সহায়তায় যদি অর্থোপার্জনই করিতে হয় তাহাকে পীড়ন করিলে চলিবে না। শক্তিপ্রয়োগ না করিয়া কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। বেশী জোর-জবরদস্তি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সহায়তায় অর্থোপার্জন করিতে হইলে তাহার আনুকূল্য না থাকিলে চলিবে না।

....অবশেষে তাঁহারা কৌশলই অবলম্বন করিলেন। নিরঞ্জনাকে

আর তাঁহারা প্রহার বা তাড়না করিতেন না, বরং মাঝে মাঝে ছোট-খাটো উপহার কিনিয়া দিয়া তাহার মনোরঞ্জনেরই প্রয়াস পাইতেন। কখনও রঙীন শাড়ি, কখনও সুদৃশ্য অলঙ্কার মাঝে মাঝে তাহার অদৃষ্টে জুটিতে লাগিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নিরঞ্জনার মনে শান্তি একটুও ছিল না। গভীর রাত্রে প্রায়ই কেহ না কেহ তাহাকে লইয়া টানাটানি করিত,—কখনও বা কোনও সুরামত্ত বণিক, কখনও বা কোনও বলিষ্ঠ সৈনিক, কখনও বা আর কেহ।

এই সময় কিঙ্কর যদি কাছে না থাকিত নিরঞ্জনার জীবনধারা যে কোন্ পথে প্রবাহিত হইত তাহা অনুমান করা শক্ত। হয় সে আত্মহত্যা করিয়া তাহার দুঃসহ জীবনের অবসান করিয়া দিত, না হয় তাহাকে অতিশয় ঘৃণ্য নিম্নশ্রেণীর রূপজীবীর পঙ্কিল জীবন যাপন করিতে হইত।

কিঙ্কর তাহাকে একটা নূতন জগতের সন্ধান দিল। কিন্তু প্রকাশ্যে নয়, গোপনে—প্রকাশ্যে দিবার উপায় ছিল না। যে পরিবেশে তাহারা বাস করিতেছিল সে পরিবেশে প্রকাশ্যভাবে সদাচরণ করাই অসম্ভব ছিল। সকলকেই গুহ্যধর্মের সাধক বা সমর্থক হইতে হইত। কিঙ্করকে সকলেই বৌদ্ধ বলিয়া জানিত, কিন্তু সে যে গোপনে গোপনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শৈব হইয়া-ছিল—এ কথা কেহ জানিত না। সে-যুগে বৌদ্ধ-ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তাহাকে অহি-নকুলের সম্পর্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে অসমর্থ ছিলেন, তাঁহারা ভণ্ডামি করিতেন। যে স্থানে বৌদ্ধ-ধর্মের আধিক্য সে স্থানে হিন্দুরা বৌদ্ধ সাজিয়া থাকিতেন। আবার যেখানে

হিন্দুরা প্রবল সেখানে বৌদ্ধগণ হিন্দুত্বের ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেন।

কিঙ্করের একটু ইতিহাস আছে। তাহার প্রপিতামহ সত্যই একদা বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক বৌদ্ধ রাজার অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহাকে ধর্ম-পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। তাহাদের আদি নিবাস ছিল উত্তর প্রদেশেরও উত্তরাঞ্চলে, হিমালয়-সন্নিহিত এক গ্রামে। তাহার প্রপিতামহের জীবদ্দশায় বৌদ্ধ রাজার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এক রাজার প্রভাব বা প্রতিপত্তি বেশীদিন থাকে না। রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণে বৌদ্ধ রাজার বংশধরগণ ক্রমশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের যখন শোচনীয় অবস্থাবিপর্যয় ঘটিল তখন তাহার পুত্রকে অর্থাৎ কিঙ্করের পিতামহকে ভিটা ত্যাগ করিতে হইল, কারণ চারিদিকেই তখন বৌদ্ধ-নির্যাতন চলিতেছিল। বৌদ্ধ ক্ষপণক দেখিলেই লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করিত। এ অবস্থায় কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি আস্থা রাখাই কঠিন। বৌদ্ধ বা হিন্দু কোন ধর্মের মহিমাই সাধারণ লোকের চিত্তকে তখন উদ্বুদ্ধ করিত না, ধর্মকে তখন স্বার্থ-সাধনের উপায়স্বরূপ লোকে গ্রহণ করিত। কিঙ্করের পিতা শুক্লচন্দ্র কোনও ধর্মেই আস্থাবান ছিলেন না। অবস্থা এবং পরিবেশ অনুসারে নিজেকে কখনও বৌদ্ধ, কখনও হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিতেন। ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে দেশের নানা স্থানে পর্যটন করিতে হইত, যেখানে যেরূপ পরিচয় দিলে সুবিধা হইবে সেখানে নিজের সেইরূপ পরিচয় দিতেন। সুতরাং তিনি কোথাও

হিন্দু, কোথাও বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শেষবয়সে পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী একটি গ্রামে এক ভৈরবীর আশ্রমে তাঁহাকে বসবাস করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণও ছিল। তাঁহার তৃতীয় পত্নী অনুরাধা যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল তিনি তখন বংশলোপের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। প্রথমা এবং দ্বিতীয়া পত্নীও বন্ধ্যা ছিলেন। চতুর্থবার দার পরিগ্রহ করিতে শুক্লচন্দ্রের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, চতুর্থ পত্নী তাঁহাকে পুত্র দান করিতে পারিবে কি? বিগত তিনটি পত্নী রূপে গুণে বা স্বাস্থ্যে কিছুমাত্র কম ছিল না, তাহাদের গর্ভে কোনও সন্তানই তো হয় নাই, চতুর্থার গর্ভে হইবে তাহার স্থিরতা কি! তিনি সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছিলেন ; এমন সময় তাঁহার এক বন্ধু সংবাদ দিলেন যে, এক ভৈরবীর একটি পালিতা কন্যা আছে, সে কন্যাটিকে তিনি যদি পত্নী-রূপে লাভ করিতে পারেন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কারণ ভৈরবী যোগসিদ্ধা এবং শক্তিশালিনী, কন্যাটিও সুলক্ষণা। ভৈরবী আশীর্বাদ করিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। বহু স্থানে হইয়াছে। বহু নিঃসন্তান ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় সন্তানলাভ করিয়াছে। এ কথা শুনিয়া শুক্লচন্দ্রও ভৈরবীর শরণাপন্ন হইলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার জন্য একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়া দিলেন, অবশেষে ভৈরবীর গুরু গোরক্ষনাথের নিকট শিবমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া ভৈরবীর পালিতা-কন্যাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে কিঙ্করের জন্ম হইল।

ভৈরবীর গুরুদেব গোরক্ষনাথ সত্যই অসাধারণ যোগী ছিলেন। হিমালয়েই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া-

ছিলেন। কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী কোন গুহা তাঁহার তপস্যাপীঠ ছিল—ইহাই জন-শ্রুতি। কিন্তু প্রকৃত ঠিকানা কেহ জনিত না। মধ্যে মধ্যে তিনি হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়া ভৈরবীর আশ্রমে কিছুদিন করিয়া থাকিতেন বটে। কিন্তু সমাজের সংস্পর্শ তাঁহাকে কাতর করিত, আশ্রমে বেশীদিন তিনি থাকিতে পারিতেন না, কিছুদিন থাকিবার পরই হিমালয়ের গহনে অন্তর্ধান করিতেন। ভৈরবী শুধু যে তাঁহার শিষ্যা ছিলেন তাহা নয়, পরম স্নেহের পাত্রীও ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তিনি শুক্লচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, কারণ খুব কম লোকেরই তাঁহাকে গুরুরূপে পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শুক্লচন্দ্রকে দীক্ষা দিবার পর সেই যে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, আর ফিরেন নাই। তাঁহার অন্তর্ধানের পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল এবং তৎপরে কিঙ্করের দুর্ভাগ্য দেখা দিল। এক ভীষণ মহামারীর প্রকোপে পড়িয়া ভৈরবী, শুক্লচন্দ্র, কিঙ্করের জননী নীলনলিনী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। গুরুদেবকে দেখিবার সৌভাগ্য আর তাঁহাদের হইল না। তাঁহাদের গৃহগোবিন্দ নামে একজন পুরাতন ভৃত্য ছিল। অনাথ কিঙ্করের লালনপালনের ভার তাহারই উপর পড়িল। কিঙ্করের ভাগ্যে গৃহগোবিন্দও বেশীদিন বাঁচিল না। সে বৃদ্ধ হইয়াছে, কফরোগে আক্রান্ত হইয়া সে-ও একদিন ভব-লীলা সাঙ্গ করিল। অন্তিম নিশ্বাস ফেলিবার পূর্বে কিঙ্করকে সে একটি আশ্বাস কিন্তু দিয়া গেল। বলিয়া গেল, "বাবা গোরক্ষনাথ একদিন না একদিন এখানে আসবেন। তোমার এ বিপদের কথা তিনি জানতে পারবেনই এবং সময় হ'লে তোমার কাছে আসবেন। তুমি যেখানেই থাক, আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ ক'রো না। আশ্রমে

এসে মাঝে মাঝে খবর নিও, তাঁর দেখা একদিন না একদিন নিশ্চয়ই পাবে।"

গৃহগোবিন্দের মৃত্যুর পর বালক কিঙ্কর প্রথমে কয়েক দিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। বালক হইলেও সে নির্বোধ ছিল না। সে যখন দেখিল সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ক্রমশ ফুরাইয়া আসিতেছে, তখন আর সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকতে পারিল না। কাজের সন্ধানে বাহির হইল।

নিকটবর্তী এক বৌদ্ধ মঠে তাহার কাজও একটি জুটিল। সেখানে গিয়া সে বলিল, তাহার প্রপিতামহ দীক্ষিত বৌদ্ধ ছিলেন। অবস্থাবিপর্যয়ে তাহারা কুলধর্ম বজায় রাখিতে পারে নাই বটে, তাহার পিতাকে এক ভৈরবীর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধ ক্ষপণকগণ যদি কৃপা করেন তাহা হইলে কুলধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সে কৃতার্থ হয়। ক্ষপণকগণ কৃপা করিলেন, এবং কিঙ্কর তাহাদের কিঙ্কররূপে নিযুক্ত হইল।

বলা বাহুল্য, তাহা পিতা এবং পিতামহের ন্যায় কিঙ্করও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিল। অর্থাৎ বাহিরে যদিও সে বৌদ্ধ আচার, বৌদ্ধ পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল, ভিতরে ভিতরে সে যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। গৃহগোবিন্দ মৃত্যুকালে যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহাও সে বিস্মৃত হইল না। বৌদ্ধ মঠের কাজকর্ম শেষ করিয়া রাত্রে সে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত। কিন্তু এত বড় আশ্রম সে একা ভোগ করিতে পারিল না, অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি আশ্রম-ভবনের উপর নিপতিত হইল। ওই বৌদ্ধ ক্ষপণকরাই একে একে আসিয়া আশ্রমের ঘরগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন।

কিঙ্করকে অবশ্য ক্ষপণকরা তাড়াইয়া দিলেন না। ভৃত্যদের থাকিবার জন্য দূরে যে ঘরটি ছিল সেই ঘরেই সে থাকিবার অনুমতি পাইল। ক্ষপণকরা মঠটি দখল করিয়া লইয়া কিছুদিন বেশ শান্তিতে বাস করিলেন। কিছুদিন পরে কিন্তু শান্তি বিঘ্নিত হইল। একদিন রাত্রে এমন একটি কাণ্ড ঘটিল তাহা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি ভয়ঙ্কর। গভীর নিশীথের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিষ্ঠাকৃতি একদল লোক ভীমপরাক্রমে আশ্রম আক্রমণ করিল এবং বৌদ্ধ ক্ষপণকদের প্রহার করিতে করিতে আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহাদের দীর্ঘ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ, আরক্ত নয়ন, গুচ্ছাকৃতি শ্মশ্রু, শাল-প্রাংশু পেশী-সমৃদ্ধ দেহ এবং ব্যাঘ্রহুঙ্কর কিঙ্করকে শুধু আতঙ্কিতই করিল না, হতজ্ঞানও করিল। যদিও কেহই তাহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই, তাহার নিকটে পর্যন্ত আসে নাই, তথাপি এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া নিজের ঘরে সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

···যখন জ্ঞান হইল তখন সে অনুভব করিল, অজ্ঞান অবস্থায় সে গৃহান্তরে নীত হইয়াছে। প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল, বিরাট একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের পাশে একটি মৃগচর্মের আসন এবং আসনের পাশে একটি বৃহৎ শঙ্খ রহিয়াছে। তাহার পর একজন ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, বাম হস্তে কমণ্ডলু, মুখমণ্ডল শ্বেত শ্মশ্রু-গুম্ফে সমাচ্ছন্ন, নয়নের দৃষ্টি সমুজ্জ্বল।

তিনি মৃগচর্মে উপবেশন করিয়া কিঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, কিঙ্কর, ভয় পেয়ো না। আমি তোমার পিতার গুরু গোরক্ষনাথ। তোমাকে দীক্ষা দেবার জন্যে এসেছি। আর

একজনকে দীক্ষা দেবার জন্যেও আর একবার আমাকে আসতে হবে। তোমাকে দীক্ষা দিয়ে আজ আমি চ'লে যাব, কিন্তু আবার আসব আমি। তুমি আমার প্রতীক্ষা ক'রো, এ আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ ক'রো না—"

কিঙ্কর সভয়ে বলিল, "প্রভু, আপনি আসবার কিছু পূর্বে এখানে একদল ডাকাত এসেছিল।"

"তারা ডাকাত নয়, তারা শিবের অনুচর। যে নাস্তিক পাষণ্ডের দল এই শিবস্থানকে কলঙ্কিত করছিল, তাদের শাস্তি দিতে তারা এসেছিল। আর তারা এখানে আসবে না।"

"আমি কি তা হ'লে এখানে একাই থাকব?"

"তোমার নিয়তি তোমাকে নানা স্থানে ঘোরাবে। এই বৌদ্ধদের সংস্পর্শেই তোমাকে থাকতে হবে অনেক দিন। বাইরে যে বেশই তুমি ধারণ ক'রে থাক না, অন্তরে যদি তুমি প্রকৃত শৈব হয়ে থাকতে পার, তোমার ভয় নেই। ভগবান অন্তরটাই দেখেন। শঙ্কর তা হ'লে তোমাকে কৃপা করবেন।"

"বৌদ্ধদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে না। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন।"

"বৌদ্ধদের মধ্যেই তোমাকে থাকতে হবে। ওদের নরককুণ্ড থেকে একজন আর্তকে উদ্ধার করবার ভার নিতে হবে তোমাকে। যে দিন তা পারবে সেই দিন শঙ্কর কৃপা করবেন, তার কিছুদিন পরেই মুক্তি হবে তোমার। এখন এস, তোমাকে দীক্ষা দিই।"

গোরক্ষনাথ সেই রাত্রে কিঙ্করকে যথাবিধি দীক্ষা দিলেন দীক্ষা যখন শেষ হইল, তখন পূর্বদিগন্তে উষা হাসিতেছিল।

গোরক্ষনাথ কিঙ্করকে বলিলেন, "তুমি এবার বিশ্রাম কর

আমি এখন যাচ্ছি, আবার আসব। ভয় পেয়ো না। শঙ্করের সেবক তুমি—এ কথা সর্বদা মনে রাখলে আর ভয় থাকবে না।”

ধীরে ধীরে তিনি আশ্রম-প্রাঙ্গণের আলো-আঁধারিতে মিলাইয়া গেলেন। কিঙ্কর প্রত্যাশা করিয়াছিল, পরদিন আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই।

কিঙ্কর প্রহৃত ক্ষপণকদের এড়াইয়া চলিতেছিল। কিন্তু সহসা কোথাও সে জীবিকা-নির্বাহের উপায় আবিষ্কার করিতে পারিল না। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও পুনরায় তাহাকে সেই বৌদ্ধ আশ্রমেই ফিরিয়া যাইতে হইল। প্রহৃত ক্ষপণকগণ রাজপুরুষদের সহায়তায় দস্যুদলের সন্ধান করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা সফলকাম হইলেন না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন দস্যুদল কিঙ্করকে হয়তো মারিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহারা হৃষ্ট হইলেন এবং পুনরায় পূর্বকর্মে নিয়োগ করিলেন। কিঙ্কর গোরক্ষনাথের সংবাদ সযত্নে গোপন করিয়া রাখিল। এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল, কিছুদিন পরে একদিন কিঙ্করকে তাহার ভাগ্য-দেবতা স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পাটলিপুত্র-নিবাসী মণিবজ্র এই বৌদ্ধ ক্ষপণকদের মঠে যাতায়াত করিতেন। নানা সূত্রে তাঁহার সহিত ইঁহাদের যোগ ছিল। কিঙ্করের কর্মতৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি একদিন মঠাধিপতিকে অনুরোধ করিলেন, আমার পান্থশালায় একটি ভৃত্যের নিতান্ত দরকার। আপনি যদি অনুমতি করেন কিঙ্করকে আমি লইয়া যাই। মঠাধিপতি তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

কিঙ্কর যখন পাটলিপুত্রে গিয়া মণিবজ্রের পান্থশালায় নিযুক্ত হইল, তখন সবে মাত্র নিরঞ্জনার জন্ম হইয়াছে। নিরঞ্জনাকে সে

শিশুকাল হইতেই মানুষ করিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ তাহাকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা সে বিস্মৃত হইল না। বাহিরে বৌদ্ধ-সঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেও অন্তরে শৈবধর্মের প্রতি তাহার নিষ্ঠা অটুট রহিল। গোরক্ষনাথ যে মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহাও সে বিস্মৃত হয় নাই, সুযোগ পাইলেই সে মন্ত্র সে প্রত্যহ জপ করিত।

এই ভাবে প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। নিরঞ্জনা তাহার নয়নের মণি হইয়া উঠিল। তখনও কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে, এই নিরঞ্জনার কথাই গোরক্ষনাথ তাহাকে দীক্ষা দিবার পূর্বেই ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। ইহাকেই যে বৌদ্ধ-নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, ‘ইহাকে দীক্ষা দিবার জন্যই যে গুরু গোরক্ষনাথ আর একবার হিমালয় হইতে নামিয়া আসিবেন—এ সব কথা তাহার মনে জাগে নাই। গোরক্ষনাথের নির্দেশ অনুসারে সে অবশ্য আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ করে নাই, প্রায়ই আশ্রমে যাইত এবং খোঁজ রাখিত কেহ আসিয়াছে কি না! আশ্রমটি সংস্কার-অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছিল। বৌদ্ধ ক্ষপণকগণ আর একবার সেখানে বাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৌতিক উপদ্রবে বিপর্যস্ত হইয়া পুনরায় তাঁহাদের পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সকলের মনে এই ধারণাই ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছেল যে, ভৈরবী, শুক্লচন্দ্র এবং গৃহগোবিন্দের প্রেতাত্মা এই আশ্রমে অদৃশ্যভাবে বসবাস করিতেছে, তাহারা আর কাহাকেও সেখানে থাকিতে দিবে না। কিঙ্করের কিন্তু ভয় ছিল না, ক্ষপণকদের যে কে বিপর্যস্ত করিতেছে তাহা গোরক্ষনাথ তাহাকে বলিয়াছিলেন। সে সুযোগ পাইলেই আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইত

এবং আশ্রমের যে ঘরটি তখনও পড়িয়া যায় নাই সেই ঘরে গিয়া গোরক্ষনাথের জন্য অপেক্ষা করিত। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি যখন আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন তখন আসিবেনই। মাঝে মাঝে ওই ঘরটিতে গিয়া সে রাত্রিবাসও করিত। নিরঞ্জনার উপর অত্যাচার যখন চরমে উঠিত, তখন নিরঞ্জনাকেও সে মাঝে মাঝে সেখানে লইয়া যাইত। নিরঞ্জনা তাহার মুখ হইতে গোরক্ষনাথের কথাও শুনিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে গোরক্ষনাথের বিষয়ে নানারূপ অসম্ভব কাহিনী শুনিয়া তাহার মনে গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত অলৌকিক ধারণা হইয়া গিয়াছিল। কিঙ্কর যখন বলিত—"তিনি হিমালয়ে থাকেন, মানসসরোবরে স্নান করেন, কৈলাসে তপস্যা করেন, মহাশক্তি মহাপুরুষ তিনি। তিনি আবার আসবেন, আমাকে ব'লে গেছেন আসবেন। তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে না। তিনি এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে। তুমি কিন্তু এসব কথা কাউকে ব'লো না যেন—" তখন নিরঞ্জনার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া উঠিত, মনে হইত কবে সেই ত্রাণকর্তা আসিবেন।

নিরঞ্জনার জীবন ক্রমশ বিষময় হইয়া উঠিতেছিল। সুরা-উন্মত্ত ধনী কামুকের দল তাহার মনে যে কামনা উদ্দীপ্ত করিত তাহাতে কিছু উন্মাদনা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রেমহীন বলিয়া তাহার কদর্য রূপ অচিরেই প্রকট হইয়া পড়িত; তাহার সমস্ত দেহমন পাশবিক কামের কলুষে যেন সর্বাদা ক্লেদাক্ত হইয়া থাকিত, তাহাতে আনন্দ ছিল না, তাহার বীভৎসতায় সে ভীত বিমর্ষ মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছিল। এ দুর্বহ জীবনভার সে যেন আর বহিতে পারিতেছিল না।

একদিন গভীর রাত্রে এক বর্বর বণিকের আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করিয়া সে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। ছুটিতে ছুটিতে সে অন্ধকার এক বৃক্ষতলে গিয়া আত্মগোপন করিল বটে; কিন্তু তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল, প্রমত্ত বর্বরটা হয়তো তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে। তাহার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। লোকটা পশ্চাদ্ধাবনই করিয়াছিল, কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তাহার পদদ্বয় স্থির ছিল না, কিছুদূর অসংলগ্ন ভাবে ছুটিবার পর তাহার পদস্খলন হইল, সে পথের ধারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। কিঙ্কর ছিল না। সে আশ্রমে গিয়াছিল। রাত্রে হয়তো সে আর ফিরিত না, কিন্তু একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্য তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল। সে দেখিতে পাইল, নিরঞ্জনা ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। একটু পরে প্রমত্ত বণিকটাকেও সে দেখিতে পাইল, তাহার পতনও লক্ষ্য করিল। তাহার পর সে যাহা করিল তাহা অদ্ভুত। হতচেতন বণিকটার পা ধরিয়া টানিতে টানিতে সে লইয়া গেল এবং কিছুদূরে গিয়া একটি কূপের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে গেল নিরঞ্জনার কাছে। নিরঞ্জনা যে একটা গাছের তলায় আত্মগোপন করিয়াছে তাহা সে দেখিতে পাইয়াছিল। গাছের কাছাকাছি আসিতেই কিন্তু নিরঞ্জনা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সেই মাতালটাই বুঝি আসিতেছে। সে আবার ছুটিতে লাগিল, কিঙ্করও পশ্চাদ্ধাবন করিল। চীৎকার করিয়া সে নিরঞ্জনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত, কিন্তু নিরাপদ নহে বলিয়া তাহা আর করিল না।

কাছাকাছি আসিয়া নিম্ন কণ্ঠে সে বলিল, "নিরঞ্জনা, শোন, শোন, আমি কিঙ্কর।"

নিরঞ্জনা দাঁড়াইয়া পড়িল। সে হাঁপাইতেছিল।

কিঙ্কর আছে আসিয়া বলিল, "আমি আশ্রম থেকে আসছি। শুভ সংবাদ আছে। গুরু গোরক্ষনাথ এসেছেন। তিনি তোমাকে ডাকছেন, দীক্ষা দিতে চান।"

"আমাকে ?"

"তোমাকে দীক্ষা দিতেই এসেছেন তিনি। চল।"

"আমার মতো মেয়ের দীক্ষা নিয়ে কি লাভ হবে কোনও ?"

"হবে। না হ'লে তিনি আসতেন না। তিনি যখন এই জন্যেই এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে তাঁর। আর দেরি করা চলবে না, চল তুমি।"

সেই রাত্রেই গোরক্ষনাথ নিরঞ্জনাকে যথাবিধি দীক্ষা দিয়া বলিলেন, "জীবনের বাইরের রূপ দেখে বিচলিত হ'য়ো না। সে রূপ কখনও ভীষণ, কখনও সুন্দর, কিন্তু তা ক্ষণিক। তোমার জীবনে অনেক দুঃখ আসবে। অনেক প্রণয়ী আসবে, অনেক সুখ আসবে, অনেক কামনা আসবে। তোমার ঐশ্বর্য অতুল হবে, খ্যাতিও অনেক হবে। দুঃখও কম পাবে না। কিন্তু বিচলিত হ'য়ো না। ধ্রুব সত্যের উপর বিশ্বাস রেখো। যদি রাখতে পার সেই বিশ্বাসই তোমাকে সকল প্রকার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবে, তোমার মুক্তি হবে। আমার কর্তব্য শেষ হ'ল। এবার আমি

চললাম। আশীর্বাদ করি শিবের করুণা বর্মের মতো তোমাদের রক্ষা করুক।”

গোরক্ষনাথ চলিয়া গেলেন।

নিরঞ্জনার দীক্ষা হইয়া গেল বটে। কিন্তু কিঙ্কর লক্ষ্য করিতে লাগিল, কামনার যে বিষ তাহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা ক্রমশই যেন ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। পিতার পান্থশালায় সে অবাঞ্ছিত পুরুষের সংস্রবে আসিতে চাহিত না বটে, কিন্তু মনোমত যুবক পাইলে খুশীই হইত। ক্রমশ কিঙ্করকেও সে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। সমস্ত দিনটা সে প্রায় বাহিরে বাহিরেই কাটাইয়া দিত। কিছুদিনের মধ্যেই নৃত্যগীত-প্রিয় একদল যুবকও তাহার চারিদিকে জুটিয়া গেল। তাহাদের সঙ্গে সে বাহিরে বাহিরে—কখনও নদীর ধারে,কখনও কোন ভগ্নপ্রাকারের অন্তরালে, কখনও বা জনবিরল পথে পথে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। পিতা-মাতাকে সে আর ভয় করিত না, পিতামাতাও ইহা লইয়া তাহাকে আর ভর্ৎসনা করিতেন না। কারণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন সে ফিরিত, কিছু অর্থ লইয়াই ফিরিত। এই ভাবে কিছুদিন কাটিল।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। মণিবজ্রের দলের একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হেরুকচরণ অনেক দিন হইতেই কিঙ্করের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, কিঙ্করের চক্রান্তেই তাঁহারা নিরঞ্জনাকে নিজেদের গুহ্যসাধনামার্গে সহচরীরূপে পান নাই। একদিন গভীর রাত্রে তিনি গোপনে নিরঞ্জনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, কিঙ্কর তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। ইহাও তাঁহার সন্দেহ ছিল যে, কিঙ্কর যদিও নিজেকে বৌদ্ধ

বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু আসলে সে বিধর্মী। বিধর্মী না হইলে একদিন সে নিজেই নিরঞ্জনাকে লইয়া গুহ্যধর্মে যোগ দিত। তাহার গুহ্যধর্মে যোগ দিবার আগ্রহ নাই, সে আবার কি রকম বৌদ্ধ? কিঙ্করকে প্রকাশ্যে কিছু বলিবার উপায় ছিল না, কিঙ্করই মণিবজ্রের পান্থশালার মেরুদণ্ডস্বরূপ, তাহার অভাবে পান্থশালা অচল হইয়া পড়িবে। কিঙ্কর না থাকিলে যোগিনীরও চলিত না, কারণ যোগিনীও ক্রমশ সুরাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, গৃহের যাবতীয় কর্ম, এমন কি রন্ধন পর্যন্ত, কিঙ্করই করিত। সুতরাং প্রকাশ্যে কিঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করিবার উপায় ছিল না। হেরুকচরণের সে সাহস হইত না, কিন্তু কোনও ছুতায় কিঙ্করকে জব্দ করিবার জন্য তিনি মনে মনে ওৎ পাতিয়া থাকিতেন।

একদিন তিনি সুযোগ পাইলেন। মণিবজ্রের পান্থশালা হইতে কিছুদূরে একটি নাতিবৃহৎ অরণ্য ছিল এবং সে অরণ্যের মধ্যে একটি ভগ্নস্তূপ ছিল। কিন্তু সে ভগ্নস্তূপটি যে আসলে একটি প্রাচীন মন্দির এবং তাহার ভিতরে যে একটি শিবলিঙ্গ বর্তমান—এ কথা অনেকেই জানিত না। কারণ স্থানটি দুর্গমও ছিল, ভয়াবহও ছিল, লোকে বলিত—ওই স্থানে শঙ্খচূড় সাপ নাকি বাস করে! কিঙ্কর কিন্তু শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব জানিত, অবসর পাইলে সেখানে নির্জনে সে শিবপূজাও করিত।

একদিন সে হেরুকচরণের নিকট ধরা পড়িয়া গেল। হেরুক-চরণ এক কিশোরী চণ্ডালকন্যাকে লইয়া ওই গভীর বনে সম্ভবত গুহ্যধর্ম পালনমানসে গিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার নজর পড়িল কিঙ্কর উক্ত ভগ্নস্তূপের পিছন হইতে বাহির হইতেছে, তাহার হাতে

কিছু বিল্বপত্র এবং আকন্দ ফুল। হেরুকচরণ বিস্মিত হইলেন। সর্পসঙ্কুল বলিয়া সাধারণত কেহ ওই ভগ্নস্তূপের কাছাকাছি যায় না, কিঙ্কর ওখানে কি করিতেছে? হেরুকচরণ কৌতূহলী হইলেন। কিঙ্কর যখন চলিয়া গেলেন, তিনি সাবধানপদবিক্ষেপে ভগ্ন মন্দিরের সমীপবর্তী হইয়া শিবলিঙ্গটি আবিষ্কার করিলেন। শুধু তাহাই নহে, দেখিলেন, শিব যে নিয়মিত পূজিত হন তাহার চিহ্নও বর্তমান। কিঙ্করের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া হেরুকচরণ পুলকিত হইলেন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, ইহা লইয়া এখনই যদি হৈ-হৈ করা যায়, কিঙ্কর হয়তো ব্যাপারটা অস্বীকার করিবে। তিনি স্থির করিলেন, কিঙ্করকে একদিন হাতে-নাতে ধরিতে হইবে, সঙ্গে একজন সঙ্গীও লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। কিঙ্কর একদিন হাতে-নাতেই ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু ফল যাহা হইল তাহা ভয়ানক। হেরুকচরণ মহামাতঙ্গ নামক জিঘাংসা-পরায়ণ রাজপুরুষদের প্রিয় একজন বৌদ্ধকে লইয়া গিয়াছিলেন। উভয়ে যখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন কিঙ্কর মহাদেবকে প্রণাম করিতেছিল। মহামাতঙ্গ কিঙ্করের পশ্চাদ্দেশে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া বলিল, "তুই শালা বাইরে নিজেকে বৌদ্ধ ব'লে পরিচয় দিস, এ কি করছিস তুই?"

এ ভাবে আক্রান্ত হইয়া কিঙ্কর ক্ষেপিয়া গেল। নিকটে একটা ত্রিশূল ছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া সে মহামাতঙ্গের শির লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূলটা গিয়া বিঁধিল বুকের মাঝখানে। মহামাতঙ্গকে ধরাশায়ী হইতে হইল। হেরুকচরণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

"এ কি করলে, এ কি করলে কিঙ্কর ?"

কিঙ্কর উত্তর দিল, "আমি করি নি, স্বয়ং শিব করেছেন।"

"তুমি কি শিব হয়ে উঠেছ আজকাল ?"

"আমি শিবের ভক্ত। তিনিই আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছেন। ভক্তের অপমান ভগবান সহ্য করেন না।"

সহসা হেরুকচরণ লক্ষ্য করিলেন মহামাতঙ্গের কান দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে, নিশ্বাস পড়িতেছে না। তিনি একটু ভীত হইয়া পড়িলেন এবং যাহা করিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত তো বটেই, একটু হাস্যকরও। কোনও কিছু না বলিয়া হঠাৎ তিনি উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন। কিঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ মৃতদেহটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সেও ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যায় নর-হত্যার অপরাধে রাজপুরুষেরা কিঙ্করকে বন্দী করিলেন। এক সপ্তাহ পরে তাহার বিচার হইল। বিচারক ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, কিঙ্কর এতকাল বৌদ্ধধর্মের মুখোশ পরিয়া সকলকে ছলনা করিতেছিল—আসলে সে শৈব, তখন কিঙ্করের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি হইল না। অকস্মাৎ ক্রোধের বশে মহামাতঙ্গকে দৈবাৎ মারিয়াছে বলিয়া তিনি ইচ্ছা করিলে কিঙ্করকে লঘু শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু ভণ্ড আচরণের কথা শুনিয়া সে ইচ্ছা তাঁহার হইল না। তিনি কিঙ্করের মৃত্যুদণ্ড দিলেন। বলিলেন, কেবল একটি শর্তে সে প্রাণে বাঁচিতে পারে। সে যদি সর্বসমক্ষে শিবলিঙ্গের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অনুতপ্তচিত্তে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহা হইলেই কিছু অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে তিনি মুক্তি দিতে পারেন। কিঙ্কর এ শর্তে মুক্তি ক্রয় করিতে সম্মত হইল না। সে মৃত্যুই বরণ করিল। ত্রিশূল-

আঘাতে মহামাতঙ্গকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া বিচারক তাহাকে শূলে দিবার আদেশ দিলেন।

যে স্থান দিয়া কিছুকাল পূর্বে কিঙ্কর নিরঞ্জনাকে গোপনে গোরক্ষনাথের নিকট লইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই স্থানেই শূল প্রোথিত হইল। জল্লাদগণ কিঙ্করকে হস্তপদবদ্ধাবস্থায় শূলের উপর চড়াইয়া দিল। কিঙ্কর কোনও আপত্তি করিল না, কোনও আর্তনাদও করিল না। সে তারস্বরে শিবনাম কীর্তন করিতে করিতে শূলে আরোহণ করিল। কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞান হইয়া গেল। সে শূল তাহার দক্ষিণ স্কন্ধ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল। অজ্ঞান অবস্থাতেও তাহার অধরোষ্ঠ নড়িতেছিল, মনে হইতেছিল সে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে। কেহ কেহ বলে, সে দুই-একবার নাকি 'জয় গুরু' 'জয় গুরু'ও বলিয়াছিল। তাহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

কিঙ্করের যখন মৃত্যু হইলে তখনও নিরঞ্জনা কিশোরী, তাহার বয়স তখন বারো বৎসর। বলা বাহুল্য, কিঙ্করের এই শোচনীয় মৃত্যু তাহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করিল; কিন্তু তখন ইহা তাহার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব ছিল যে, এই নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করিয়া কিঙ্কর প্রকৃত শান্তিলাভই করিয়াছে। বরং ঠিক বিপরীত কথাটাই সে যেন বুঝিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, সৎপথ মানেই বিপদসঙ্কুল পথ। ভাল লোক সর্বদাই বিপন্ন, তাহার কিছুতেই যেন নিস্তার নাই, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে মরিতে হইবে। এই ব্যাপারের পর হইতে ধর্ম সম্বন্ধে তাহার কেমন যেন ভয়ই হইয়া গেল, সৎপথ তাহার নিকট ভয়ঙ্কর

বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ভাল পথে গিয়া দরকার নাই, এত কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব না।

যৌবনে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার প্রণয়ী জুটিয়াছিল। প্রতিবেশী ছোঁড়ার দল সুযোগ পাইলেই তাহার অনুসরণ করিত, এমন কি অনেক বৃদ্ধও তাহাকে প্রলোভন দেখাইত। এ-জাতীয় প্রণয় ব্যাপারে কিছু অর্থাগম হয়। সে অর্থ দিয়া সে প্রসাধন-দ্রব্য, শাড়ি, অলঙ্কার প্রভৃতি কিনিত। ফলে, তাহার পিতামাতা ক্রমশ তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তাহার উপার্জিত অর্থে একমাত্র তাঁহাদেরই ন্যায্য অধিকার আছে—ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। নিরঞ্জনা বাহিরে কাটাইলেই তাঁহারা প্রত্যাশা করিতেন, উপার্জিত অর্থ সে তাঁহাদের আনিয়া দিবে। কিন্তু নিরঞ্জনা সব সময় দিত না, ফলে অশান্তির সৃষ্টি হইতে লাগিল। যোগিনী তাহাকে তিরস্কার করিতেন, প্রহার পর্যন্ত করিতেন। ফলে মাঝে মাঝে তাহাকে বাড়ির বাহিরে রাত কাটাইতে হইত। অনেক সময় নগরপ্রাকারের পার্শ্বে—যেখানে অন্ধ খঞ্জ ভিখারীর দল শ্বাপদ-সরীসৃপের সঙ্গে রাত্রি কাটায়—সেইখানে নিরঞ্জনাও রাত্রি কাটাইত। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কিঙ্কর ছিল না, অন্য কাহারও হাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতেও তাহার সাহস হইত না, সুতরাং পলায়ন করিয়াই তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইতেছিল।

একদিন অত্যধিক প্রহৃত হইয়া সে নগর-সিংহদ্বারের নিকট বসিয়া রোদন করিতেছিল, এমন সময় এক প্রৌঢ়া মহিলা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রৌঢ়াকে দেখিলেই মনে হয়, এককালে তিনি অপরূপ রূপসী ছিলেন। ক্ষণকাল নিরঞ্জনাকে

নিরীক্ষণ করিয়া সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ওমা, সোনার প্রতিমা এমন ভাবে ধূলোয় লুটোচ্ছে কেন। কার মেয়ে তুমি, তোমার বাপ-মা কোথা ?"

নিরঞ্জনা কোনও উত্তর দিল না। আনত নয়নে চুপ করিয়া রহিল।

"কাঁদছিলে কেন বল তো ? এমন চাঁদপানা মুখ, কিসের দুঃখ তোমার ? তোমার বাপ-মা কোথা ?"

এবার নিরঞ্জনা উত্তর দিল।

"আমার বাবা মাতাল, মা কৃপণ।"

"তারা তোমাকে মারধোর করে নাকি ?"

নিরঞ্জনা মাথা নাড়িল। প্রৌঢ়া তখন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, "বাপ-মা যদি অমন হয় কি দরকার তাদের কাছে থাকবার ? আমার সঙ্গে যাবে ? তোমাকে দেখে বড় ভাল লেগেছে আমার। আমার সঙ্গে চল তো, খুব যত্ন ক'রে রাখব তোমায়। মাথায় ক'রে রাখব। আহা, কি চেহারা ! যেন টগর ফুলটি ! আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব তোমার। কি জাত তোমরা ?"

"আমার বাবা বৌদ্ধ—"

"আমার ছেলে, নিজের মুখে বলতে নেই, ঠিক যেন রাজপুত্র। যদি আস আমার সঙ্গে, দেখতেই পাবে। যাবে ?"

"যাব।"

সেই প্রৌঢ়ার সঙ্গে নিরঞ্জনা সেই দিনই পাটলিপুত্র ত্যাগ করিল এবং কিছুদিন পরে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রৌঢ়া মহিলাটি অন্য কেহ নহেন—বিখ্যাত নর্তকী মিশ্রকেশী,

যাহাকে লোক সংক্ষেপে একদা মিশরি বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার রূপ-যৌবন অন্তর্হিত হইয়াছিল, আর তিনি নাচিতে বা গাহিতে পারিতেন না, কিন্তু নৃত্য-বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে রূপসী বালিকা সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাদিগকে রীতিমত নাচ শিখাইতেন এবং তাহারা পারদর্শিনী হইলে বড়লোকদের প্রমোদ-উৎসবে তাহাদের ভাড়া দিতেন। ইহাই তাঁহার জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় ছিল। নিরঞ্জনাকে দেখিবামাত্র তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাকে যদি ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়, নর্তকী হিসাবে ইহার ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল। এমন অপরূপ দেহের গঠন, এমন লাবণ্য সচরাচর দেখা যায় না। ইহাও তাঁহার মনে হইয়াছিল, ইহাকে সত্যই যদি আপনার করিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎও কম উজ্জ্বল হইবে না। নৃত্য-গীত-পটিয়সী নিরঞ্জনার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে তিনি কঠোরভাবে বেত্রহস্তে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একটু বেসুরা বা বেতালা হইবার উপায় ছিল না, হইলেই তিনি বেত্রাঘাত করিতেন। নিরঞ্জনার অন্য কোথাও যাইবার উপায় ছিল না, মিশ্রকেশী সর্বদাই তাহার উপর কড়া নজর রাখিতেন। কিন্তু সে সর্বাপেক্ষা বেশী মুশকিলে পড়িয়াছিল মিশ্রকেশীর পুত্র শ্রীমন্তকে লইয়া। শ্রীমন্ত ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির। সে যদি প্রেম করিত নিরঞ্জনা হয়তো আপত্তি করিত না, কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাহার ছিল না; কারণ সে ছিল অক্ষম পৌরুষহীন। কখনও সে কোনও স্ত্রীলোকের প্রেম অর্জন করিতে পারে নাই, যত স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে সে আসিয়াছিল সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে।

তাই স্ত্রীজাতির উপর সে জাতক্রোধ হইয়া উঠিয়াছিল। স্ত্রীলোক-দের নির্যাতন করিয়াই সে আনন্দ পাইত। নিরঞ্জনাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া সে নানাভাবে তাহাকে নির্যাতন করিতে লাগিল। সে নিরঞ্জনার গালে আঁচড়াইয়া দিত, চিমটি কাটিয়া তাহার বাহুমূলে ক্ষত সৃষ্টি করিত, কখনও কখনও পিছন হইতে ছুঁচও ফুটাইয়া দিত। তাহার মায়ের মতো সেও নিরঞ্জনার ভবিষ্যৎ যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিল, বুঝিতে পারিয়াছিল নিরঞ্জনা বহুভোগ্যা রূপজীবিনী হইবে। এই জন্য সে আরও হিংস্র হইয়া উঠিত, ঈর্ষায় ক্ষোভে তাহার সমস্ত চিত্ত মথিত হইয়া যে বিষ উদ্গিরিত হইত তাহা ভয়ঙ্কর, তাহার একমাত্র প্রকাশ ছিল নির্যাতনে। নিরঞ্জনা তাহার না হইয়া অপরের হইবে ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য নির্যাতনের নব নব উপায় সে উদ্ভাবন করিত।

কিন্তু তাহার একটি গুণ ছিল। সে নাচের অদ্ভুত নকল করিতে পারিত, যে কোনও নাচের। যদিও তাহা বিকৃত নকল, কিন্তু মুখভঙ্গী অঙ্গভঙ্গী দ্বারা এমন একটি রসের সৃষ্টি করিতে পারিত যাহা প্রকৃতই হাস্যরস এবং উপভোগ্য। শুধু হাস্যরসই নয়, মুখভাব এবং অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা সে সর্বপ্রকার ভাব, এমন কি গভীর প্রেমের ভাবও চমৎকার ফুটাইয়া তুলিতে পারিত। তাহার নিকট হইতে নিরঞ্জনা এই বিদ্যাটাও শিখিতে লাগিল। নারী-বিদ্বেষী শ্রীমন্তের নিকট হইতে শেখা কিন্তু সহজ ছিল না। শিখাইবার ছলে সে কেবল নানা যন্ত্রণা দিত। নিরঞ্জনা কিন্তু দমিল না। বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও সে নৃত্য, গীত এবং মূক অভিনয় এই ত্রিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। কোনও

নির্যাতনই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সে নির্যাতনে অভ্যস্তই ছিল, বাল্যকালে তাহার নিজের পিতা-মাতাই তো তাহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছেন। সুতরাং দৈহিক নির্যাতন তাহার পক্ষে নূতন কিছু ছিল না। সে সাগ্রহে শিক্ষা করিতে লাগিল। প্রৌঢ়া নর্তকী মিশ্রকেশীর কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও সে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। কারণ তাঁহার ব্যবহার যতই কঠোর হউক না কেন, নৃত্যগীত-বিদ্যায় তিনি যে পারঙ্গমা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। নিরঞ্জনাকে তিনি যে অন্তরের সহিত শিক্ষা দিতেছেন, তাহাও নিরঞ্জনা বুঝিতে পারিত। সুতরাং তাঁহার পদ্ধতি যতই নিষ্ঠুর হউক, নিরঞ্জনা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল; কারণ তাহার ভবিষ্যৎ তিনিই নির্মাণ করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জনার যখন বয়স বাড়িল, নৃত্যে গীতে মূক অভিনয়ে সে-ও যখন পারদর্শিনী হইল, তখন মিশ্রেকেশী তাহাকে ধনীদের উৎসব-সভায় পাঠাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, অর্থের বিনিময়ে। এইখানেই মিশ্রকেশীর সর্বনাশের সূত্রপাত হইল। নিরঞ্জনা ধনী রসিকদের রসবোধকে তৃপ্ত করিতে লাগিল, ক্রমশ তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইল। বর্বর-প্রকৃতির ধনী কুশীদজীবীরা অনেক সময় উৎসবশেষে তাহাকে নিজেদের বাগান-বাড়িতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। নিরঞ্জনা আপত্তি করিত না, কারণ সে তখনও প্রণয়ের আস্বাদ পায় নাই। অর্থমূল্যই তাহার নিকট পর্যাপ্ত ছিল।

একদিন কিন্তু এক অভিজাত বংশীয় যুবক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে রাত্রে সে যুবকদের এক প্রীতি-সম্মিলনে নাচিতে

গিয়াছিল। নৃত্য শেষ হইয়া গেলে নগর-কোটালের অনিন্দ্যকান্তি যুবক পুত্র যৌবন-উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া প্রণয়গদগদ ভাষায় সহসা তাহাকে সম্বোধন করিল। যাহা বলিল তাহা হাস্যকর, কিন্তু যুবকের মুখ দেখিয়া নিরঞ্জনার হাসি পাইল না। যুবক বলিল, "নিরঞ্জনা, আমি তোমার—সর্বতোভাবে তোমার। আমি তোমার মাথার মুকুট, অঙ্গের বসন, চরণের পাদুকা। তুমি তোমার পাদুকাকে যেমন পদদলিত করছ, আমাকেও তেমনি কর। আমার সোহাগই তোমার মুকুট হোক, আমার প্রেমই বসনের মতো তোমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকুক। সুন্দরী নিরঞ্জনা, তুমি চল আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতে চল। বাইরের পৃথিবী বাইরে প'ড়ে থাক্। পৃথিবীকে ভুলে যাও তুমি—"

নিরঞ্জনা যুবকটির দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সত্যই সে রূপবান। তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল, মুখের গৌরবর্ণ তৃণবৎ সবুজ হইয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, মনে হইল দৃষ্টির সম্মুখে যেন একটা মেঘ নামিয়া আসিতেছে, যুবকের আমন্ত্রণ কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহার সহিত গেল না। যুবকের উন্মুখ আগ্রহ, আন্তরিক অনুরোধ ব্যর্থ হইল। তখন সে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে গেল, তাহাতেও কোন ফল হইল না। নিরঞ্জনার মধ্যে যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব দুর্দমনীয় শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে বর্মাবৃত করিয়া দিল। নগর-কোটালের রূপবান পুত্র মৃগপতির অনুরোধ, আবেদন, বলপ্রয়োগ তুচ্ছ হইয়া গেল তাহার কাছে। সে দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রেমোচ্ছ্বাসকে ব্যাহত করিয়া দিল। নিজের আচরণে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল সে।

নিরঞ্জনার ব্যবহারে অন্যান্য অতিথিরা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। মৃগপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা তো যে কোনও নটীর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। নিরঞ্জনার মতো সামান্য একটা নটী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! তাঁহারা নিরঞ্জনার সুবুদ্ধির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, মেয়েটা হয়তো পাগল।

মৃগপতিকে কিন্তু সে রাত্রে একাই ফিরিতে হইল। শুধু তাহাই নহে, সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া প্রণয়জ্বরে সে জর্জরিত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, নিরঞ্জনাকে না পাইলে সে আর বাঁচিবে না। পরদিন প্রভাতে সে প্রচুর পুষ্প-সম্ভার লইয়া নিরঞ্জনার দ্বারদেশে পুনরায় যখন উপস্থিত হইল, তখন তাহার আকৃতি ভয়াবহ—চোখের কোলে কালি, চুল বিস্রস্ত, মুখের বর্ণ মলিন। নিরঞ্জনা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। কিন্তু সে দূরেই রহিল, কাছে আসিল না। সেও কষ্ট পাইতেছিল, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিল না—কষ্টটা কিসের, কষ্টটা কেন! নিজেকেই সে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছিল, এ রকম হইল কেন, কেন তাহার কিছু ভাল লাগিতেছে না, একটা অনির্দিষ্ট বেদনা কেন সারা মন জুড়িয়া রহিয়াছে! তাহার প্রণয়ীর অভাব ছিল না, মৃগপতি ছাড়া আরও অনেকে তাহার দ্বারে হানা দিয়াছিল, কিন্তু সে কাহারও সহিত দেখা করিল না, সকলকেই বিদায় করিয়া দিল। কাহারও সান্নিধ্য সে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে ঘরের খিল পর্যন্ত খুলিল না, দিবালোককে পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করিতে দিল না। বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া সমস্ত দিন কেবল কাঁদিল।

মৃগপতি ধনীর পুত্র। শুধু তাহাই নহে, গণ্যমান্য একজন রাজপুরুষের পুত্র সে। এত সহজে নিরস্ত হইবার লোক সে নয়। সে জোর করিয়া নিরঞ্জনার গৃহের দ্বার উন্মোচন করাইল। নিরঞ্জনাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতাও তাহার ছিল। কিন্তু ততটা সে করিল না। সে রসিক ব্যক্তি, সে জানিত জোর করিয়া দেহটাকে হয়তো স্বাধিকারে আনা যায়, কিন্তু মন পাইতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সে প্রত্যহ আসিয়া নিরঞ্জনাকে অনুনয় করিতে লাগিল, উপহারে উপহারে তাহার গৃহ ও সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল। শেষে অবাধ্য শিশুকে লোকে যেমন স্নেহের ভর্ৎসনা করে, তেমনি ভর্ৎসনাও তাহাকে করিল, ভয়ও দেখাইল। তবু কিন্তু নিরঞ্জনার হৃদয়-কপাট খুলিল না। তাহার বাড়িতে যাইতে নিরঞ্জনা সহজে রাজী হইল না। পুরুষের প্রথম প্রণয়-স্পর্শে কুমারী যেরূপ ভীত হয়, সে নিজে একদিন যেমন হইয়াছিল, ঠিক তেমনি এক কুমারী-সুলভ ভয় তাহাকে পাইয়া বসিল। মৃগপতির সহস্রবিধ অনুনয়ের উত্তরে সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল—না, না, না, না।

এক পক্ষ অতিবাহিত হইল, তখন সে নিজের অন্তর বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল সে মৃগপতির প্রেমে পড়িয়াছে, বুঝিতে পারিল অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে ঘিরিয়া এক অপূর্ব স্বপ্নলোক নামিয়া আসিয়াছে। আর সে দ্বিধা করিল না। মৃগপতির সঙ্গে একদিন তাহার বাড়িতে গেল, আর ফিরিল না। যে জীবন তাহারা যাপন করিতে লাগিল তাহা মধুময়, স্বপ্নময়, অপূর্ব। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাদের যেন

তৃপ্তি হইত না। কি যে বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইত না, পাইলেও ভাষা জুটিত না, শিশুদের মতো অর্থহীন অসংলগ্ন আলাপেই তাহারা পরস্পরের মনের কথা বুঝিতে পারিত। সময়ের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছিল। কখনও গঙ্গার শুভ্র বালুসৈকতে, কখনও ঝাউবনে, কখনও রজনীর নিবিড় অন্ধকারে, কখনও জ্যোৎস্নার গভীর আবেশে তাহারা নিজেদের হারাইয়া ফেলিত, আবার ফিরিয়া পাইত। কখনও বা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাহারা পর্বতের সানুদেশে চলিয়া যাইত, সেখানে বন্যকুসুম চয়ন করিতে করিতে প্রভাত দ্বিপ্রহরে উত্তীর্ণ হইত তবু তাহাদের খেয়াল হইত না যে, বাড়ি ফিরিতে হইবে। একই পাত্র হইতে সুরাপান করিত তাহারা। নিরঞ্জনা যখন একটি আঙুর মুখে তুলিত তখন তাহার বিম্বাধরধৃত সেই আঙুরটিই মৃগপতি নিজ অধর দিয়া তাহার মুখ হইতে তুলিয়া লইত।

মিশ্রকেশী একদিন ক্রোধভরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মৃগপতিকে বলিলেন, "নিরঞ্জনা আমার কন্যা ও আমার নয়নের মণি, ওকে আমি দিতে পারব না। তুমি ওকে ছেড়ে দাও—"

মৃগপতি প্রচুর অর্থ দিয়া নয়নের মণির মূল্য শোধ করিয়া দিল। মিশ্রকেশী চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার লোভের অন্ত ছিল না। আরও অর্থের লোভে তিনি পুনরায় মৃগপতির বাসভবনে হানা দিলেন। মৃগপতি আর তাঁহাকে অর্থ দিল না, নগররক্ষকের সহায়তায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল। বিচারের সময় আবিষ্কৃত হইল, তিনি বহু অপরাধে অপরাধিনী। বহু বালিকার তিনি সর্বনাশ করিয়াছেন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। তাঁহার মৃতদেহ বন্য পশুদের নখদন্তে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

নিরঞ্জনা নিজের কল্পনার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়া মৃগপতিকে ভালবাসিয়াছিল। তাহার স্বভাবসুলভ শিল্পপ্রতিভা যেন কিছু-কালের জন্য মৃগপতির মধ্যে চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করিয়াছিল। সে যখন মৃগপতিকে বলিত, 'আমি চিরকাল তোমারই ছিলাম' তখন সে বাণী তাহার মর্ম হইতেই উৎসারিত হইত, তাহার মধ্যে কপটতা ছিল না। মৃগপতিও যখন বলিত, 'তুমি অনন্যা। তোমার মতো আমি আর কাউকে কখনও দেখি নি' তখন তাহার মধ্যেও ভণ্ডামি ছিল না। একটা রঙীন স্বপ্ন তাহাদের ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

স্বপ্ন কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই ভাঙিয়া গেল। সহসা একদিন নিরঞ্জনা আবিষ্কার করিল, তাহার হৃদয় শূন্য, সে একাকিনী। তাহার স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনা মৃগপতিকে যে রূপ অর্পণ করিয়াছিল তাহা সহসা অন্তর্ধান করিল, মৃগপতির রূপান্তর ঘটিল, তাহাকে আর সে যেন চিনিতে পারিল না। স্বপ্নলোক মেঘের প্রাসাদের মতো শূন্যে বিলীন হইল। ইহাতে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল সে। তাহার মনে হইল, মৃগপতির এ পরিবর্তন কেমন করিয়া ঘটিল! যে অসাধারণ অসামান্য ছিল, কোন্ মন্ত্রবলে সে সামান্য সাধারণ হইয়া গেল! যে প্রেমকে সে অমর ভাবিয়াছিল, তাহার প্রাণহীন শবমূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

অবশেষে মৃগপতিকে ত্যাগ করিয়াই একদিন সে চলিয়া গেল। যে মৃগপতিকে সে মৃগপতির মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাকেই আর কাহারও মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—ইহাই হইল তাহার গোপন প্রেরণা। তাহার ইহাও মনে হইল, যাহাকে

কখনও ভালবাসি নাই তাহার সঙ্গে বাস করা বরং কম দুঃখজনক, কিন্তু যাহাকে একদিন ভালবাসিয়াছি কিন্তু এখন আর বাসি না, বাসিতে পারি না, তাহার সহিত প্রেমহীন জীবন যাপন করা নিদারুণ ।

সে আবার পথচারিণী হইল।

মন্দিরে মন্দিরে যে সব সেবাদাসী নগ্ন নৃত্য করিয়া দেবতা-পূজার ছলে কামুক ধনীদের বাসনা তৃপ্ত করে, গঙ্গাবক্ষে নৌকা-বিহার করিয়া অথবা উদ্যানবাটিকায় প্রমোদ-উৎসবে মাতিয়া যাহারা রূপ-যৌবনের পসরা পণ্যের মতো ফেরি করিয়া বেড়ায়, নিরঞ্জনা অবশেষে তাহাদেরই দলে যোগ দিল। প্রমত্তা নগরীর বিলাস-ব্যসন কোনটাই সে বাদ দিল না, প্রমোদের ঘূর্ণাবর্তে সে আবর্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল রঙ্গমঞ্চ। যে রঙ্গমঞ্চে নানা দেশ হইতে আগত নট-নটীরা সহস্র সহস্র লোলুপ দর্শকের চিত্তকে লোলুপতর করিয়া তোলে, সেই রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করিয়া তাহার স্বপ্ন আবার রঙীন হইয়া

সে নর্তকীদের, অভিনেত্রীদের—বিশেষ করিয়া যাঁহারা পৌরাণিক চরিত্রে বা দেবীদের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিতেন তাঁহাদের—বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিত। বুঝিতে চেষ্টা করিত, কি নৈপুণ্যবলে, কোন্ মন্ত্রে তাঁহারা দর্শকদের হৃদয় হরণ করিয়াছেন! কিছুকাল পর্যবেক্ষণ করিবার পর তাহার ধারণা হইল, সুযোগ পাইলে সেও ভাল অভিনয় করিতে পারিবে। রঙ্গমঞ্চের মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে

একদিন নিজের গোপন অভিলাষ ব্যক্তও করিয়া ফেলিল। তাহার অসামান্য রূপ ও অল্প বয়স দেখিয়া, মিশ্রকেশী সযত্নে তাহাকে যে নাচ গান মূক অভিনয় শিখাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া রঙ্গমঞ্চ-স্বামী মুগ্ধ হইলেন। নিরঞ্জনা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল এবং নর্তকী তিষ্য-রক্ষিতার ক্ষুদ্র ভূমিকায় একদিন অবতীর্ণও হইল।

তাহার অভিনয় মন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহা লইয়া খুব একটা হৈ-চৈ হইল না। রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। পূর্বার্জিত প্রশংসার অলৌকিক দ্যুতি পুরাতন অভিনেত্রীদের মস্তকে যে মহিমামুকুট পরাইয়া দর্শকদের উত্তেজিত করিয়া তোলে তাহা নিরঞ্জনা তখনও অর্জন করিতে পারে নাই, সুতরাং তাহার প্রথম অভিনয়-রজনীতে প্রেক্ষাগৃহ করতালিমুখরিত হইয়া উঠিল না। কিন্তু কয়েক মাস ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করিবার পর তাহার সৌন্দর্যের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চ ক্রমশ প্রভাবিত হইল। শেষে এমন প্রবলভাবে প্রভাবিত হইল যে, সমস্ত নগরী চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাকে দেখিবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ যেন ভাঙিয়া পড়িল। নিরঞ্জনার বিপুল খ্যাতির টানে বড় বড় রাজপুরুষে এবং ধনী নাগরিকগণ তো গেলেনই, সামান্য মুটে-মজুররাও আহারের পয়সা বাঁচাইয়া রঙ্গমঞ্চের প্রবেশমূল্য সংগ্রহ করিল। নিরঞ্জনার উদ্দেশে কবিরা কবিতা লিখিলেন। গম্ভীর দার্শনিকরাও তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। যখন নিরঞ্জনার সুসজ্জিত শিবিকা মন্দির বা মঠের পাশ দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তাঁহারাও স্থির থাকিতে পারিতেন না, তাহাকে লইয়া অনেক সময় তাহার বিরুদ্ধেই অলঙ্কারময়ী বক্তৃতায় মুখরিত হইয়া উঠিতেন। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা সাহস করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন না,

মুখ ফিরাইয়া লইতেন। তাহার গৃহদ্বারে অগুরুচন্দনসুরভিত পুষ্পমাল্য স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। তাহাকে লইয়া মাঝে মাঝে কলহও তুমুল হইয়া উঠিত, অনেক সময় শোণিতপাতও। বহু প্রণয়ী তাহার চরণকমলে অহরহ অজস্র স্বর্ণমুদ্রা ঢালিতে লাগিল, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণেরাও পশ্চাৎপদ রহিলেন না, তাঁহাদের সযত্নসঞ্চিত ধনরাশিও নদীর স্রোতের মতো নিরঞ্জনার কামনা-সঙ্গমতীর্থের অভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিরঞ্জনার চিত্ত প্রসন্ন হইল। জনসাধারণের চিত্ত জয় করিয়া গর্বে আনন্দে সত্যই সে বিজয়িনীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, স্বর্গের দেবতারাও বুঝি তাহার মস্তকে অদৃশ্য পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। যে আত্মধিক্কার একদিন তাহার চিত্তকে বিষময় করিয়া রাখিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। সকলের ভালবাসা পাইয়া সে নিজেকেও ভালবাসিতে শিখিল।

ইন্দ্রপ্রস্থের বিপুল অভিনন্দন কিছুদিন ভোগ করিবার পর একদিন একটা অদ্ভুত বাসনা তাহার মনে জাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, পাটলিপুত্রে ফিরিয়া যাইবে। যেখানে একদিন তাহার বাল্যকাল নিদারুণ দুঃখে লজ্জায় দৈন্যে দুর্দশায় অতিবাহিত হইয়াছিল, যেখানে একদিন সে ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষীণকায় ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো পথে-প্রান্তরে পঙ্কে-পুষ্পে আহারের সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল সেইখানেই সে ফিরিয়া যাইবে আবার। খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের তাহার অভাব ছিল না, সুতরাং ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না। সত্যই সগৌরবে সে একদিন পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিল। পাটলিপুত্রও অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি করিল না। নিরঞ্জনার খ্যাতি দেশে দেশে

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, রূপসী কলাকুশলা নর্তকী, প্রতিভাময়ী অভি-নেত্রী নিরঞ্জনাকে পাটলিপুত্র সাগ্রহে সম্বর্ধনা করিয়া তাহাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিল। পাটলিপুত্রেও তাহার অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের ভীড় হইতে লাগিল, পাটলিপুত্রেও প্রণয়ীর অভাব ঘটিল না। প্রণয়ীরা কিন্তু আর নিরঞ্জনাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না, প্রণয়ীদের সম্বন্ধে তাহার মোহই কাটিয়া গিয়াছিল। আর কাহারও মধ্যে মৃগপতিকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাহার আর ছিল না।

পাটলিপুত্রে যাঁহারা নিরঞ্জনার গৃহে প্রায় প্রত্যহই পদার্পণ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক সিন্ধুপতিও ছিলেন, যদিও তিনি নিজেকে 'নিষ্কাম' বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিতেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার আলাপ এবং ব্যবহারও ভদ্রজনোচিত ছিল। তাঁহার গভীর জ্ঞান বা উচ্চাঙ্গের ভাববিলাস কিন্তু নিরঞ্জনাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রেমেও সে পড়ে নাই, বরং তাঁহার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গোক্তিতে সে মাঝে মাঝে বিরক্তই হইত। আর একটা কারণও ছিল। সিন্ধুপতি ছিলেন সন্দেহবাদী, অলৌকিক বা অসম্ভব কোন কিছুতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। নিরঞ্জনার সব কিছুতেই বিশ্বাস ছিল। সে ভগবানকে বিশ্বাস করিত, শয়তানকেও বিশ্বাস করিত। অদৃষ্ট মানিত, তুকতাক মানিত, পাপপুণ্যও মানিত। তপজপেও তাহার আস্থা ছিল। গোরক্ষনাথকে সে ভোলে নাই, মহাদেবের অস্তিত্বে তাহার বিশ্বাস ছিল। শুধু মহাদেবই নয়, বৌদ্ধ হিন্দু সমস্ত দেবদেবীকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কুসংস্কারও কম

ছিল না—কুকুর বিড়াল কাঁদিলে সে ভীত হইয়া পড়িত, কাকের অশ্রান্ত চীৎকার বা পেচকের বিশেষ একটা ডাক তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। এমন কি বশীকরণেও তাহার বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস করিত যে, রক্তাক্ত মেষলোমে পরিস্রুত সুরা পান করাইলে প্রণয়ী বশীভূত হয়। তাহার মনের প্রবণতাই ছিল ওইরূপ। অজ্ঞাত অসম্ভবের দিকে তাহার চিত্ত সর্বদাই যেন আশায় আশঙ্কায় উন্মুখ হইয়া থাকিত। মানহীন পরিচয়হীন কাহাকে যেন সে মনে মনে আহ্বান করিত এবং অহরহ আশা করিত—সে আসিবে, অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিবে। ভবিষ্যৎ ভীতিপ্রদ ছিল তাহার কাছে। কিন্তু ওই ভবিষ্যৎকে জানিবার আগ্রহও কম ছিল না তাহার। বহু জ্যোতিষী, বহু যাদুকর, বহু তান্ত্রিককে সে প্রশ্রয় দিত। ইহাও সে বুঝিত যে তাহারা অনেকেই প্রতারক, তবু তাহাদের দূর করিয়া দিতে পারিত না। মৃত্যুভয়ও প্রবল ছিল তাহার, সর্বত্র সে মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাইত। যখন সে বিলাসস্রোতে ভাসমান বা প্রণয়ীর বাহুপাশে নিষ্পিষ্ট, তখন সহসা তাহার মনে হইত কাহার তুষারশীতল অঙ্গুলি যেন তাহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিত।

সিন্ধুপতি তাহাকে আশ্বাস দিতেন: "পলিতকেশে জরাজীর্ণ হয়ে অনন্ত অন্ধকারে চিরকালের মতো অবলুপ্ত হয়ে যাওয়াই যদি আমাদের নিয়তি হয়, আজকের এই স্বর্ণকিরণোজ্জ্বল দিনই যদি আমাদের জীবনের শেষ দিন হয় তাতে হয়েছে কি? তাতে ভয় পাচ্ছ কেন? যতক্ষণ বেঁচে আছ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ ক'রে নাও। ভোগের পরিমাপই জীবনের পরিমাপ। ছোট ভাবে ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে যদি ভোগ কর, তোমার জীবনও ক্ষুদ্র

শঙ্কিত সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সমষ্টিই আমাদের বুদ্ধি, আর এই জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করারই অপর নাম তো প্রেম। যা আমরা জানি না, যা জানবার উপায় নেই, যার আছে কি নেই বলা অসম্ভব—সে সব নিয়ে নিজেকে এমন ক'রে কষ্ট দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না—"

এ সব কথা শুনিয়া নিরঞ্জনা আশ্বস্ত হইত না, রাগিয়া উঠিত।

সিন্ধুপতির বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে সে ক্রোধভরে বলিত, "আপনারা সুবিধাবাদী ভীরু, তাই নাস্তিকতার ভান ক'রে সব জিনিস এড়িয়ে যেতে চান। আশা করবার সাহস নেই আপনাদের, অনিবার্যকে ভয় করবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। আপনাদের এ আস্ফালন একটুও ভাল লাগে না আমার। আমি আপনাদের মতো এড়িয়ে যেতে চাই না। আমি জানতে চাই, জানতে চাই—"

জীবনের রহস্য জানিবার জন্য সে নানাবিধ দর্শনের পুস্তক পড়িত। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিত না। শৈশবের অতীত জীবন মনে পড়িত তাহার। শৈশবের কথা বহুবার বহুরূপে ভাবিত সে। ভাবিতে তাহার ভাল লাগিত। অনেক সময় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে সেই সব গলিতে, সেই সব পান্থশালায় অথবা নদীতীরের সেই সব স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, যেখানে একদিন অতি দুঃখে তাহার শৈশব কাটিয়াছিল। স্থানগুলির পূর্বরূপ আর ছিল না, অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, অনেক স্থানের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। তবু তাহারই মধ্যে সে নিজের শৈশবের দিনগুলির সন্ধান করিত। তাহার পিতামাতার মৃত্যু তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিত, কিন্তু পিতামাতাকে সে যে ভালবাসিতে পারে নাই—এ বেদনার কোন সান্ত্বনাই সে খুঁজিয়া পাইত না।

একদিন রাত্রে এক কৃষ্ণ পরিচ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে নিজের কুঞ্চিত চিকুরদাম ঢাকিয়া সে পাটলিপুত্র নগরীর উপান্তে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সে একটি মন্দিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শুনিতে পাইল মন্দিরের ভিতর শিব-স্তোত্র পঠিত হইতেছে—

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষ গুণং
গুণহীন-মহীশ-গণাভরণং
রণ-নির্জিত-দুর্জয়-দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।

তখন শৈব-নির্যাতন অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল, শৈবগণ নির্ভয়ে তখন প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারিতেন। নিরঞ্জনা উৎকর্ণ হইয়া গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত স্তোত্রপাঠ শুনিতে লাগিল। মন্দিরের বদ্ধ দ্বারের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল আলোক দেখা যাইতেছিল। নিরঞ্জনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বদ্ধ দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। নিরঞ্জনা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বহু লোক সমবেত হইয়াছে। শুধু পুরুষ নয়, বহু স্ত্রীলোকও আছে, বালক বালিকাও অনেক। শিবস্তোত্রের পবিত্র সূত্রে সকলেই যেন পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন কি বালক-বালিকারাও মুদিত নয়নে নতজানু হইয়া এক বিরাট সমাধির সম্মুখে আবেগভরে শ্রদ্ধাপূত চিত্তে স্তোত্র পাঠ করিতেছে। সমাধিটি নিষ্কলঙ্ক শ্বেত-প্রস্তরনির্মিত, বিল্বপত্রে ও ধুস্তুরপুষ্পে সজ্জিত। অগুরু ধূপের গন্ধ মন্দিরের বায়ুমণ্ডলকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছে। চতুর্দিকে অসংখ্য ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে।

মন্দিরগাত্রে শিবপুরাণের বহু কাহিনী চিত্রে উৎকীর্ণ। কোথাও নটরাজ মূর্তি, কোথাও সতীশব স্কন্ধে তাণ্ডবনৃত্যমত্ত ধূর্জটি, কোথাও তিনি মদনভস্ম করিতেছেন, কোথাও বা আবার কিরাত-বেশে অর্জুনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, কোনও চিত্রে বিষপান করিতেছেন, কোথাও বা প্রসন্ন হাস্যে বরদান করিতেছেন তপস্বিনী অপর্ণা উমাকে। স্তবগান সহসা থামিয়া গেল। গৈরিকবসনপরিহিত পুরোহিতগণ প্রণত হইলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রণত হইল। নিরঞ্জনার মনে হইল, এই মন্দিরের অপূর্ব পরিবেশে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে, নিবিড় আনন্দের সহিত নিবিড় বেদনার মধুর সংমিশ্রণ, জীবনের আনন্দ এবং মৃত্যুর বিভীষিকা সঙ্গীতে ভঙ্গীতে ভক্তিতে শক্তিতে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর ভক্তগণ উঠিয়া সমাধিটিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। নিরঞ্জনা লক্ষ্য করিল, ইহারা কেহই ধনী নহে, সকলেই সামান্য লোক, চেহারা দেখিলে মনে হয় সকলেই কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে। তাহাদের আড়ম্বরহীন সরলতা নিরঞ্জনাকে মুগ্ধ করিল। তাহাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, মুখের শিশুসুলভ কমনীয়তা মন্দিরের পবিত্রতাকে যেন পবিত্রতর করিতেছিল। সকলেই একে একে সমাধিকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। জননীরা ছোট ছোট শিশুদেরও দুই হাতে তুলিয়া তাহাদের মাথা সমাধির সম্মুখে নত করাইয়া দিল।

নিরঞ্জনা একজন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কেন আজ এখানে এসেছেন ? এখানে কি বিশেষ কোনও উৎসব ছিল ?"

পুরোহিত উত্তর দিলেন, "ভদ্রে, আজ আমরা পরমশৈব

কিঙ্করের স্মৃতিপূজা করিতে এসেছি। তিনি শৈব ছিলেন—এই অপরাধে সেকালের বৌদ্ধ রাজপুরুষদের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। মিথ্যা অপরাধের ছলে তাঁরা তাঁকে এই স্থানে শূলবিদ্ধ ক'রে হত্যা করে। তিনি হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মত্যাগ করেন নি। তাঁরই স্মৃতিপূজা করবার জন্য আজ আমরা সমবেত হয়েছি। এটি তাঁরই সমাধি—"

নিরঞ্জনা নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নয়ন দুইটি কখন যে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই। যখন সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, দেখিল পুরোহিত চলিয়া গিয়াছেন। তখন ধীরে ধীরে সেও জানু পাতিয়া সমাধির সম্মুখে বসিল এবং প্রণাম করিল। অর্ধবিস্মৃত কিঙ্করের মুখচ্ছবি তাহার মানসপটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মন্দিরের পবিত্র পরিবেশে, অগুরু চন্দনের গন্ধে, ফুলের শোভায়, প্রদীপের আলোকে সে ছবি ধীরে ধীরে মহিমময় হইয়া উঠিল।

নিরঞ্জনার মনে হইল—কিঙ্কর ভাল লোক ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ সে যে-লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে তাহার গুরুত্ববিচার সাধারণ ভালমন্দের মানদণ্ডে করা যায় না। আজ সে মহৎ, আজ সে সুন্দর। তাহার স্থান আজ মানবতার বহু ঊর্ধ্বে। কোন্ শক্তিবলে সে এত ঊর্ধ্বে উঠিল? কি সে শক্তি যাহা পার্থিব ধনসম্পদকে অবহেলা করিয়া, দৈনিক প্রমোদ-বিলাসকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে চিরন্তন মহানন্দলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়? কিঙ্কর কি পাইয়াছিল? সে আর দূরে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া গিয়া সমাধিপ্রস্তরের খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিঙ্কর তাহার যে চোখ দুইটি ভালবাসিত সেই চোখে অশ্রুবিন্দু

টলমল করিতেছিল, সহসা ঘৃতপ্রদীপের কিরণ-ছটায় সেই অশ্রুবিন্দু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নিরঞ্জনা পুনরায় জানু পাতিয়া বসিল, বহু কামনার উদয়-অবসানের লীলাপীঠ যে অধর, সেই অধর শীতল প্রস্তরে সংলগ্ন করিয়া সে পরম শৈব কিঙ্করের সমাধিকে শ্রদ্ধাভরে চুম্বন করিল।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সিন্ধুপতি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। অঙ্গে তাঁহার অভিসারের বেশ। বেশ সুরভিত, অঙ্গে স্বর্ণাভ রেশমের অবিন্যস্ত অঙ্গচ্ছদ। তিনি নীতিবিষয়ক একটি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। নিরঞ্জনাকে দেখিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন।

"কি কষ্টই দিয়েছ তুমি আমাকে আজ!"—সিন্ধুপতির কণ্ঠস্বরে হাসির লহর খেলিয়া গেল: "তোমার অপেক্ষায় ব'সে ব'সে আমি কি করছিলাম জান? এই শুষ্ক কঠোর নীতির বইটার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। কিন্তু এই নীতির অরণ্যে অদ্ভুত সব জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি। ধর্ম-উপদেশ নয়, অহঙ্কারের স্বরূপনির্ণয়ও নয়। এই নীরস বইটার পাতায় পাতায় আমি আবিষ্কার করেছি অসংখ্য নিরঞ্জনাকে। তারা সব আকারে ছোট ছোট, আমার আঙুলের চেয়ে কেউ বেশী বড় হবে না। কিন্তু কি তাদের রূপ, কি তাদের মহিমা! মনে হ'ল এক তুমিই যেন বহু রূপ ধারণ করেছ। কারও অঙ্গে স্বর্ণখচিত রক্তাম্বর, কেউ স্বচ্ছ শুভ্র মেঘের স্বপ্নে ভাসমানা। কেউ আবার যেন পাষাণী প্রতিমার মতো—নগ্না, ভাষাহীনা এবং সেই জন্যেই যেন বেশী আকাঙ্ক্ষিতা। সর্বশেষে দেখলাম, তাদের মধ্যে দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে সামনে এসে দাঁড়াল, দুজনে দেখতে ঠিক একরকম, তফাত বোঝা যায় না।

দুজনেই আমার দিকে চেয়ে হাসলে। একজন বললে, 'আমি প্রেম'—আর একজন বললে, 'আমি মৃত্যু'।"

এই সব বলিতে বলিতে নিরঞ্জনাকে তিনি বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। নিরঞ্জনার চোখের ঘৃণাব্যঞ্জক তীব্র দৃষ্টি লক্ষ্য করিলে তিনি হয়তো থামিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া তিনি নিজের কবিত্বই আস্ফালন করিতে লাগিলেন। বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার একটি কথাও নিরঞ্জনার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

তিনি বলিয়া চলিলেন, "আমি যখন পড়ছিলাম 'আত্মসংযম থেকে কখনও ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়' তখন আমি তার অর্থ করছিলাম 'নিরঞ্জনার চুম্বনমদিরা অগ্নির চেয়েও তপ্ত, মধুর চেয়েও মিষ্ট'। আমার মতো দার্শনিকের এ মতিভ্রম কেন হয়েছে জান? তোমারই জন্য। তুমিই নীতিশাস্ত্রের নূতন ভাষা সৃষ্টি করছিলে আমার মনে। তোমার ভিতর দিয়েই আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি নিত্য নূতনরূপে—" .

নিরঞ্জনা কিছুই শুনিতেছিল না। তাহার মন তখনও কিঙ্করের সমাধির নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিঙ্করের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার দীর্ঘশ্বাস পড়িল। দীর্ঘশ্বাসে চমকিত হইয়া সিন্ধু-পতি তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন।

"দীর্ঘনিশ্বাস কেন? এমন মন-মরা হয়ে আছ কেন বল তো? এই বাস্তব পৃথিবীটাকে ভুলে থাকতে পারলেই তো সুখ। ভোলবার উপায়ও জানি আমরা। তবে দেরি করছ কেন? এস জীবনের সুখ-দুঃখকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাই আমরা। এস না, অমন করছ কেন? তোমার প্রেমের তরঙ্গে অবগাহন করবার

আশায় কতক্ষণ ধ'রে ব'সে আছি। আমার দেহের প্রতি পরমাণু তৃষিত হয়ে রয়েছে—"

এইবার নিরঞ্জনা ক্ষেপিয়া উঠিল।

"প্রেম? ও-কথা উচ্চারণ করবেন না আর। আপনি কখনও কাউকে ভালবাসেন নি। আমিও আপনাকে ভালবাসি না। না, না, বাসি না। আমি আপনাকে ঘৃণা করি। আপনি চ'লে যান এখান থেকে। এখনি চ'লে যান। আপনার মতো অলস, কামুক ধনীদের ঘৃণা করি আমি। চ'লে যান আপনি এখান থেকে। যারা দরিদ্র তারাই ভাল, তারাই মহৎ। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন কিঙ্কর ব'লে এক চাকর ছিল আমার। সে শৈব ছিল ব'লে বৌদ্ধনামধারী কতকগুলো পিশাচ ধনী হত্যা করেছিল তাকে। সে-ই ভালবাসত আমাকে, সে-ই জানত প্রেম কাকে বলে। আপনি প্রেমের কি জানেন? আপনি তার পায়ের নখেরও যোগ্য নন। এই মুহূর্তে এখান থেকে চ'লে যান আপনি। আমি আর আপনার মুখদর্শন করব না—"

নিরঞ্জনা ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল সে। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এইবার কিঙ্করের আদর্শ অনুসরণ করিবে সে।

কিন্তু সঙ্কল্প করা সহজ, সে অনুসারে কাজ করা কঠিন। প্রভাতে উঠিয়াই আবার সে পূর্বের জীবনস্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। যে সব বিলাসের আয়োজন পূর্ব হইতেই করা ছিল, তাহা লইয়াই সে আবার মাতিয়া উঠিল। কিছুদিন হইতে আর একটা বিষয়ে সে সচেতন হইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, রূপযৌবন বেশীদিন থাকিবে না। যতদিন থাকে ততদিন যতটুকু সুখভোগ করা যায়

ততটুকুই তো লাভ। রূপযৌবনের বিনিময়ে যতটা গৌরব আহরণ করিতে পারা যায় ততটা আহরণ করিবার জন্য তাই সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল—তাহার অভিনয় আরও নিখুঁত হইল। ভাস্কর চিত্রকর কবিদের কল্পনাকে সত্যই যেন সে রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার অঙ্গচালনার ভঙ্গীতে এমন একটি সংযত নিখুঁত সঙ্গতিময় শাশ্বত রূপ মূর্ত হইয়া উঠিত যে, মনে হইত, ঠিক যতটুকু শোভন ততটুকু সে ব্যক্ত করিতেছে। রসিক ও গুণীরা বলিতেন, "নিরঞ্জনা শুধু শিল্পীই নয়, গণিতেও পারদর্শিনী।" যাহারা অজ্ঞ দরিদ্র অবনত ভীত তাহাদের সম্মুখে নিরঞ্জনা আত্মপ্রকাশ করিল, কিন্তু ভিন্নভাবে। তাহার অজস্র দানে অভিভূত হইয়া তাহারা তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া যাইত। তাহার যশের সৌরভে দশদিক যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু তাহার মনে সুখ ছিল না, মানসিক অশান্তি কিছুতেই যেন দূর হইতেছিল না, মৃত্যুভয় বাড়িতেছিল। তাহার রমণীয় প্রাসাদ, কমনীয় কানন পাটলিপুত্রের গৌরবস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রাসাদ-বাসিনীর কানন-বিহারিণী মনে শান্তি ছিল না।

বিদেশ হইতে বহু অর্থব্যয় করিয়া সে বহু রকম দুর্লভ গাছ আনাইয়া নিজের বাগানে লাগাইয়াছিল। একটি কৃত্রিম নদীও সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের মূলে জলসেচন করিবার জন্য কৃত্রিম হ্রদও ছিল একটি। হ্রদের চারিদিকে নিপুণ শিল্পীরা ঐতিহাসিক প্রাচীন স্তম্ভশ্রেণীর অনুকরণ করিয়া একটা পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যেন। বহু মর্মরমূর্তিও ছিল। মনে হইত

একদল নগ্না রূপসী নানা ভঙ্গীতে যেন হ্রদের জলে নিজেদের প্রতি-বিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছে।

শিলা-নিবাসটি ছিল এই বাগানের মধ্যেই। শিলা-নিবাস না বলিয়া অপ্সরী-নিবাস বলিলে যেন আরও শোভন হইত, কারণ বহুমূল্য মর্মর-নির্মিত গৃহটির ঠিক দ্বারদেশে তিনটি অপরূপ অপ্সরীর মূর্তি ছিল। শিল্পী তাহাদের এমনভাবে গড়িয়া ছিলেন যে মনে হইতেছিল, তিনটি তরুণী স্নানের পূর্বে গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিতেছেন এবং পাছে কেহ তাঁহাদের দেখিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন, নিকটে কেহ আছে কি না! মূর্তি তিনটি যেন জীবন্ত।

সম্মুখেই হ্রদের নীল জল। সেই নীল জলে প্রতিফলিত আলোকই শিলা-নিবাসকে আলোকিত করে। ঘরের ভিতর যে আলো প্রতিফলিত হয়, তাহা কোমল নীলাভ। দেওয়ালে নানা-রূপ ছবি মুকুট মাল্য বিলম্বিত ছিল। ছবিগুলি নিরঞ্জনারই নানা ভঙ্গীর ছবি। বিবিধ প্রকার মুখোশও টাঙানো ছিল—কোনটা সুন্দর, কোনটা বা বিষাদময়। তা ছাড়া ছিল রঙ্গমঞ্চের বহু দৃশ্যের বহু আলেখ্য। অদ্ভুত জন্তুর ছবিও ছিল—অদ্ভুতাকৃতি বামন, ভীষণাকৃতি দৈত্য; মানব এবং পশুর সমন্বয়ে প্রকৃতির নানারূপ মূর্তি ও চিত্রও ছিল কোথাও কোথাও। গৃহের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র নিকষ স্তম্ভের উপর ছিল পুষ্পধনু মদনের মনোহর একটি মূর্তি, —অপরূপ মূর্তি, হস্তিদন্তনির্মিত। সিন্ধুপতি এটি উপহার দিয়া-ছিলেন। এক স্থানে কুলুঙ্গিতে ছিল কষ্টিপাথরে নির্মিত একটি ছাগজননীর মূর্তি, ছয়টি শাবক তাহার স্ফীত স্তনের নিকট উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ছাগী ঘাড় বাঁকাইয়া সম্মুখের পা দুইটি তুলিয়া

পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ঘরের মেঝেতে কাশ্মীরী শাল পাতা রহিয়াছে, মাথার বালিশগুলি সিংহচর্মনির্মিত, তাহার উপর অদ্ভুত কারুকার্য। ঘরের কোণে কোণে স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত আতর সমস্ত ঘরটিকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে। পিছন দিকের দেওয়ালে একটি বিরাট কাছিমের খোলা ঠেসানো রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য সোনার পেরেক ঠোকা। বিশাল কূর্মটি ভারতসমুদ্রে ধরা পড়িয়াছিল। কূর্মটি এত বৃহৎ যে তাহার পৃষ্ঠাবরণটি দিয়া নিরঞ্জনার খাট প্রস্তুত হইয়াছে। দিনের বেলা খাটটি দেওয়ালে ঠেসানো থাকে। কল্লোল-ছন্দিত, পুষ্পবিচিত্র, গন্ধমদির এই পরিবেশে নিরঞ্জনা প্রত্যহ ওই কূর্মশয্যায় বিশ্রাম করে। রাত্রির আহারের পূর্বে হয় সে এখানে একা থাকে কিংবা কোনও বিশেষ বন্ধুর সহিত গল্প করে। রঙ্গমঞ্চের চিন্তা ছাড়া আর একটি চিন্তা সম্প্রতি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রতিদিন বয়স বাড়িতেছে—এই নিদারুণ সত্যটা ক্রমশ যেন তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন দ্রৌপদীর অভিনয় করিবার পর নিরঞ্জনা শিলা-নিবাসে বিশ্রাম করিতেছিল। দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ ছিল দর্পণে। নিজের ক্রমশ ক্ষীয়মাণ রূপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিতেছিল, এইবার ক্রমশ মুখে জরার চিহ্ন দেখা দিবে, মাথার চুলও ক্রমশ পাকিবে। বিশেষ কোনও মন্ত্রপাঠ করিয়া অথবা বিশেষ কোনও ঔষধ বা ধূপের ধোঁয়া এই অনিবার্য পরিণামের গতিরোধ করিবে—এই অলীক স্তোকবাক্যে তাহার মন আর প্রবোধ মানিতেছিল না।

অহরহ কে যেন মনের ভিতর বসিয়া বলিতেছিল, নিরঞ্জনা, তোমার যৌবন আর থাকিবে না, তুমিও বৃদ্ধা হইবে।...

তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দর্পণে আর একবার স্নেহভরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে যেন একটু আশ্বস্ত হইল। মনে হইল, পরে যাহাই হউক, তাহার রূপ এখনও কিন্তু অম্লান আছে, এখনও যাহা আছে তাহা বহু লোকের মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারে। কথাটা মনে হইতে তাহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিল। দর্পণকে সম্বোধন করিয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, 'এত বড় পাটলিপুত্রে আমার মতো আর কে আছে! আমার মতো কমনীয় নমনীয়তা আর কারো আছে কি, এমন লীলায়িত গতিভঙ্গী, এমন অপরূপ বাহুবল্লরী? তুমি কি জান না বাহুবল্লরীই প্রেমের নিগড় রচনা করে?'।

সহসা তাহার চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। দেখিল সম্পূর্ণ অপরিচিত অদ্ভুত এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চক্ষু জ্বলন্ত, শ্মশ্রু অবিন্যস্ত, কিন্তু অঙ্গে মহার্ঘ পরিচ্ছদ। দর্পণ ফেলিয়া সে আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সাবাণ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রূপসী নিরঞ্জনাকে দেখিয়া তাঁহার অন্তর মথিত করিয়া নীরবে প্রার্থনা উত্থিত হইতেছিল—ভগবান, এই অপূর্ব সৌন্দর্য আমার চিত্তকে যেন কলুষিত না করে, ইহার স্পর্শে আমি যেন ধন্য হই।

একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে তিনি কথা কহিলেন।

বলিলেন, "নিরঞ্জনা, অনেক দূর থেকে আমি এসেছি। তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি আমাকে তোমার কাছে টেনে এনেছে। শুনেছি তুমি অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী, অনুপমা মোহিনী, তোমার আকর্ষণে

উদ্বেলিত জনসমুদ্র নাকি তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে! তোমার ঐশ্বর্যের খ্যাতি, প্রেমের কাহিনী ঠিক যেন রূপকথার মতো। মনে হয় তুমি যেন পৌরাণিক ধীবরকন্যা সত্যবতী, নব কলেবর ধারণ ক'রে বহু পরাশরের হৃদয় হরণ করছ। তাই আমি এসেছি, শুধু তোমাকে দেখতে নয়, তোমার পরিচয় লাভ করবার জন্যে। যা স্বচক্ষে দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে, জনশ্রুতি তোমাকে সম্যক মর্যাদা দিতে পারে নি। যা শুনেছিলাম দেখছি তুমি তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী সুন্দর। শুধু রূপের নয়, বুদ্ধির দীপ্তিও তোমার মুখমণ্ডলকে আরও সুন্দর করেছে। তোমার কাছে এসে এ ভয়ও আমার হচ্ছে যে, আরও কাছে গেলে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারব না—আমার মতো তপস্বীরও হয়তো হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাবে। অর্থাৎ এ কথাটা আমি অনুভব করছি যে, তোমার কাছে এলেই আবিষ্ট হয়ে পড়তে হয়—তোমার আকর্ষণী শক্তি দুর্বার।"

সাবর্ণি ব্যঙ্গের স্বরে কথাগুলি বলিবেন ভাবিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা প্রণয়ীর উচ্ছ্বাসের মতো শুনাইল। তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া নিরঞ্জনার কিন্তু রাগ হইল না। সাবর্ণিকে দেখিয়া প্রথমে সে ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার পর সে বিস্মিত হইল। বন্য বর্বরের মতো কে এই লোকটা! চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি গম্ভীর কিন্তু আগ্রহপূর্ণ! এ রকম সমন্বয় তো প্রায় দেখা যায় না! তাহার কৌতূহল হইল। প্রত্যহ যে সব লোকের ভীড় দেখা যায় এ লোকটি তো তাহাদের কাহারও মতো নয়। বেশ একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।

ব্যঙ্গের সুরে নিরঞ্জনা উত্তর দিল।

"আগন্তুক অত সহজে আকৃষ্ট হ'য়ো না। আমার রূপের বহ্নি অনেককে পুড়িয়েছে, হয়তো তোমাকেও পোড়াবে। আমার দিকে আকৃষ্ট হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। লোকে বলে, আমি সর্বনাশিনী।"

সাবর্ণি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আমি তোমাকে ভালবেসেছি নিরঞ্জনা। আমি তোমাকে আমার জীবনের চেয়ে, এমন কি নিজের আত্মার চেয়েও বেশী ভালবাসি। তোমার জন্য আমি তপস্যা ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছি, নিজের ব্রত ভঙ্গ ক'রে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে যে সব কথা উচ্চারণ করছি তা কোন তপস্বীর পক্ষে গৌরবের নয়। আমার যা দেখা উচিত নয় তাই দেখেছি, যা শোনা উচিত নয় তা শুনেছি। সত্যিই আমার আত্মাকে বিচলিত করেছ তুমি। মনে হচ্ছে হৃদয়-দুয়ার সম্পূর্ণরূপে খুলে গেছে, উন্মুক্ত হৃদয়দ্বার দিয়ে নির্বারিত ধারায় মনের ভাবধারা বেরিয়ে পড়ছে, ঠিক যেন ঝরনাধারার মতো। মনে হচ্ছে সে ঝরনা-ধারায় বন্য কপোত-কপোতীরা বুঝি তৃষ্ণার জল পাবে। হিমালয়ের অরণ্য অতিক্রম ক'রে পায়ে হেঁটে তোমার জন্য আমি এসেছি। দিবারাত্রি হেঁটেছি—অসীম কষ্ট সহ্য ক'রে হেঁটেছি। পথে কঙ্কর কর্দম বৃশ্চিক কণ্টক সর্প কি না ছিল! কিন্তু আমি কিছুই গ্রাহ্য করি নি। অন্তরে প্রেম না থাকলে এ অসাধ্য-সাধন আমি করতে পারতাম না। সত্যিই আমি তোমাকে ভালবেসেছি নিরঞ্জনা। কিন্তু আমার কথা শুনে একটা ভুল তুমি ক'রো না। কামের তাড়নায় যারা তোমার কাছে ক্ষিপ্ত কুক্কুর বা মত্ত ষণ্ডের

মতো ছুটে আসে, আমাকে তাদের দলে ফেলো না। সিংহ হরিণকে যে কারণে ভালবাসে, তারাও ঠিক সেই কারণেই তোমাকে ভালবাসে। তাদের কামক্লিন্ন প্রেম তোমার আত্মাকে গ্রাস করছে প্রত্যহ। আমি যে প্রেম নিয়ে তোমার কাছে এসেছি তাতে কাম-গন্ধ নেই—তা পবিত্র, তা আধ্যাত্মিক। মহেশ্বরের বিরাট সত্তার একটা অংশরূপে তোমাকে আমি ভালবেসেছি, এ ভালবাসার নামই স্বর্গীয় প্রেম, এর তুলনা নেই, অন্তও নেই। এ প্রেম একটি মধু-রজনীতেই শেষ হয়ে যাবে না, এ প্রেম সত্যশিবসুন্দরের নিত্য উৎসবের অঙ্গ হয়ে থাকবে। এ প্রেম অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য—"

নিরঞ্জনার চোখে মুখে একটা সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, সার্বণির বক্তৃতা তাহার মনে রেখাপাত পর্যন্ত করে নাই। হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে দেখাও কোথায় তোমার সেই প্রেম। বিলম্ব ক'রো না। আর বক্তৃতা দিও না। বক্তৃতা আমাকে ক্লান্ত করে, বক্তৃতা আমি মোটেই ভালবাসি না। যে অদ্ভুত স্বর্গীয় প্রেমের কথা বললে কোথায় তা ? আমার কি মনে হয় জান, স্বর্গীয় প্রেম নেই। তুমি অনেক বক্তৃতা করলে বটে। কিন্তু সে প্রেম তুমি আমাকে দিতে পারবে না, আর পাঁচজনের মতো তুমিও অলীক স্বপ্নের জাল বুনছ খালি। স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলা সহজ, কিন্তু তা দেওয়া সহজ নয়। স্বীকার করছি তুমি কল্পনাকুশল কবি একজন। কল্পনার জোরে তুমি যে নিষ্কাম প্রেমের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছ, বাস্তবে তা নেই—তা অসম্ভব, অজ্ঞাত। প্রেমের রহস্য জানতে আর কারো বাকী নেই। পৃথিবীতে চুম্বনের আদানপ্রদান অনাদিকাল থেকে চলছে তো।

তোমার চেহারা দেখে বোধ হয় তুমি কোনও যাদুকর। প্রণয়ী হ'লে প্রেমের রহস্য অবিদিত থাকত না তোমার—তা নিয়ে এত বক্তৃতাও করতে না তুমি—"

"নিরঞ্জনা, ব্যঙ্গ ক'রো না। বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই সেই অজ্ঞাত প্রণয়ের পসরা তোমার কাছে ব'য়ে এনেছি—"

"তোমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে বন্ধু। কোনরকম প্রণয়ই আর অজ্ঞাত নেই আমার কাছে—"

"তুমি জান না নিরঞ্জনা—"

"সব জানি। কিছুই আমার অজানা নয়।"

"আমি যে প্রণয় তোমার কাছে আজ নিবেদন করতে এসেছি, তা সত্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তুমি এতদিন প্রেম ব'লে যা জেনেছ তা প্রেম নয়—কাম। তোমার সমস্ত জীবনই কাম-কলঙ্কিত—"

নিরঞ্জনার চোখে একটা আগুনের ঝলক ফুটিয়া উঠিল।

প্রদীপ্তনয়নে সে বলিল, "বন্ধু, যার আতিথ্য গ্রহণ করতে আজ তুমি এসেছ, তার সামনে এ কথা ব'লে তুমি শালীনতার পরিচয় দাও নি। হয়তো সাহসের পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু তা দুঃসাহস। আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি, আমাকে কি কলঙ্কিনী ব'লে মনে হয়! আমি তো আমার এ জীবনের জন্য একটুও লজ্জিত নই, আমার মতো এ জীবন যারা যাপন করে তাদের জন্যও নই। সকলে হয়তো আমার মতো ধনী বা রূপসী নয়, কিন্তু তবু তাদের কলঙ্কিনী মনে করবার কল্পনাও করি না আমি। লজ্জা কেন হবে বল? আমি অন্যায় তো কিছু করি নি। আমি আমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আজ পর্যন্ত কি পরিবেশন

করেছি জান ? আনন্দ। সেই জন্যেই আমি আজ বিখ্যাত। আজ পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী ব'লে যাঁদের নাম আছে তাঁদের চেয়েও বেশী ক্ষমতা আছে আমার, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই আমার পদানত হয়েছেন, আমার করুণাকণা পাবার জন্যে আমার পায়ে ধ'রে সেধেছেন। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ আমার দিকে, আমার এই ছোট পা দুটির দিকেও। এই পা দুটি চুম্বন করবার জন্যে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক হৃদয়-শোণিত বিসর্জন করতে প্রস্তুত। আমি হয়তো মহৎ নই, ইতিহাসের পাতাতেও আমার নাম থাকবে না, তবু আমি যা হতে পেরেছি তার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি, লজ্জা নয়। যে সব মহাত্মা ধর্মের উচ্চ-শিখরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাঁদের দৃষ্টিতে হয়তো আমি বালুকণার মতোই তুচ্ছ। কিন্তু এই অতি তুচ্ছ বালুকণাকে কেন্দ্র ক'রে কি আলোড়নই না চলছে, তা আশা করি, তোমার অবিদিত নেই। যে আনন্দ আমি পরিবেশন করছি তার কণামাত্র লাভ করবার উন্মাদনায় কত সুখ, কত দুঃখ, কত হতাশা, কত আশা, কত ঘৃণা, কত প্রেম যে উথলে উঠছে চারিদিকে—কত হত্যা, কত শিল্প, কত পাপ, কত পুণ্য যে লীলায়িত হচ্ছে অহরহ, তার তুলনা স্বর্গে-নরকে কোথাও আছে কি ? আমার মহিমায় দিগ্‌দিগন্ত সমুজ্জ্বল, আমাকে কলঙ্কিনী বলা কি শোভা পায় বন্ধু ?"

সাবর্ণি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

"অনেক সময় মানুষের চক্ষে যা মহিমময়, ঈশ্বরের বিচারে তাই কলঙ্কলিপ্ত। নিরঞ্জনা, তুমি আর আমি এক জগতের লোক নই। দুজনে দুই বিভিন্ন জগতে মানুষ হয়েছি, এত বিভিন্ন যে আমাদের চিন্তার মিল নেই, পরস্পরের ভাষাও আমরা বুঝতে পারছি না।

কিন্তু ভগবান ধূর্জটি সাক্ষী, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি তোমার সঙ্গে আমি একমত হবই, যতক্ষণ না আমার মতের সঙ্গে তোমার মতের মিল হয় ততক্ষণ তোমার সঙ্গ আমি ছাড়ব না। এ কাজ খুবই শক্ত তা আমি জানি, কিন্তু আমি নিরস্ত হব না। যদিও এখনও পর্যন্ত আমি জানি না কোন্ বহ্নিতে তোমাকে গলিয়ে নিজের আদর্শের ছাঁচে তোমাকে ঢালব। কিন্তু তবু আমি থামব না, প্রাণপণে চেষ্টা করব। তুমি অনবদ্যা, তোমাকে মহনীয়া করতে চাই। তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পেয়ে সম্পূর্ণ নূতন ক'রে সম্পূর্ণ নূতন রূপে রূপায়িত ক'রে চিরানন্দলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে চাই। যদি আমি সফলকাম হই, নিজেকে আমি ধন্য মনে করব। তুমিও স্বীকার করবে যে, সত্যিই তোমার নবজন্ম হ'ল। মন্দাকিনীর অমৃতধারা প্রবাহিত হবে তোমাকে ঘিরে, সে ধারায় স্নান ক'রে অপাপবিদ্ধা কুমারীর পবিত্র সৌন্দর্য লাভ করবে তুমি আবার। আহা, কোনও শক্তিবলে আমি নিজেই যদি এই মুহূর্তে মন্দাকিনীতে রূপান্তরিত হতে পারতাম, তা হ'লে এখনই তোমাকে আমি ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম অনন্তের দিকে—”

নিরঞ্জনার ক্রোধ প্রশমিত হইল।

সে নিজের সংস্কার অনুযায়ী ভাবিল, 'লোকটি যখন অনন্তের কথা বলছে, নব-জন্মের কথা বলছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও মাতুলী-টাতুলী আছে ওর কাছে। সম্ভবত কোন তান্ত্রিক। জরামৃত্যুকে জয় করবার মন্ত্র জানে। ওকে চটাব না, প্রত্যাখ্যান করব না। দেখাই যাক না কি হয়!'

সে ভয়ের ভান করিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গেল এবং ঘরের শেষ-প্রান্তে গিয়া বিছানায় উপবেশন করিয়া বুকের কাপড়

সামলাইতে সামলাইতে আনত-নয়নে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মসৃণ কপোলের উপর দীর্ঘ নয়নপল্লবের কোমল সূক্ষ্ম ছায়া, তাহার ত্রস্ত লজ্জিত দেহভঙ্গিমা, তাহার দোদুল্যমান চরণ-কমল দুটি অপরূপ করিয়া তুলিল তাহাকে। মনে হইল, কোন কুমারী বুঝি স্বপ্নের ঘোরে সহসা আত্ম-আবিষ্কার করিয়াছে।

মহর্ষি সাবর্ণি নির্নিমেষে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি বুঝি আর দাঁড়াইয়াও থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার তালু শুষ্ক হইয়া গেল, মস্তিষ্কের মধ্যে তুমুল আলোড়ন আরম্ভ হইল। পর-মুহূর্তেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। তাঁহার দৃষ্টিও আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মনে হইল দৃষ্টির সম্মুখে যেন সাদা মেঘ নামিতেছে। সহসা তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং মহাদেবই বুঝি নিরঞ্জনাকে তাঁহার দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া দিলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। মনে হইবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইল।

গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মনে হচ্ছে আমার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে তোমার আপত্তি নেই। এও হয়তো তুমি ভাবছ, তোমার এ আত্মসমর্পণ কেউ দেখতে পাবে না। তোমার এ শিলা-নিবাস নির্জন। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি কি লুকোতে পারবে?"

নিরঞ্জনা মাথা নাড়িল।

"ঈশ্বর! শিলা-নিবাসের উপর পাহারা দেবার জন্য কে তাঁকে সাধতে গেছে? আমার মতো সামান্য নটীর জন্য তিনি মাথা ঘামাতে যাবেন কেন? যদিই বা ঘামান, যদি আমার আচরণ তাঁর মনঃপূত না হয়, আমার ব'য়ে গেল। তিনি স্বচ্ছন্দে যা খুশী

করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের আচরণ তাঁর মনঃপূত হবেই বা না কেন? তিনিই তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের মধ্যে যদি কিছু মন্দ থাকে তা তাঁরই সৃষ্টি। সুতরাং তাঁর অন্তত আমাদের কামনা বাসনা দেখে রাগ করা উচিত নয়, আশ্চর্য হওয়াও উচিত নয়। সবই তো তাঁর দেওয়া। বড় বড় ধার্মিকরা তাঁর সম্বন্ধে যা বলেন তা অত্যন্ত অসঙ্গত ব'লে মনে হয় আমার। খুব সম্ভবত ওসব মন-গড়া কথা তাঁদের। ঈশ্বরকে কে জেনেছে বল? তুমি তাঁর কথা বলছ কোন্ অধিকারে? ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কি আছে তোমার?"

ইহা শুনিয়া সার্বর্ণি ধার-করা মূল্যবান পরিচ্ছদটি ঈষৎ উন্মোচন করিয়া নিরঞ্জনাকে নিজের গৈরিক উত্তরীয়টি দেখাইলেন।

"আমি হিমাচল অরণ্যের তপস্বী মহর্ষি সার্বর্ণি। সেখান থেকেই আমি এসেছি। পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার থেকে আমি এতকাল দূরে স'রে অরণ্যের গহনে শিবের ধ্যানে কালাতিপাত করেছি। মানবসমাজে এতদিন আমার অস্তিত্বই ছিল না। সহসা একদিন, কেন জানি না, তোমার মূর্তি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। আমি অনুভব করলাম, পাপের কবলে প'ড়ে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছ, মহামৃত্যু তোমাকে গ্রাস করছে। তাই তোমার কাছে আমি এসেছি, তোমাকে বাঁচাতেই এসেছি। নিরঞ্জনা, তুমি জাগো, ওঠো, আত্মস্থ হও।"

মহর্ষি সার্বর্ণির নাম নিরঞ্জনা শুনিয়াছিল। তাঁহার কথা, তাঁহার চেহারা, তাঁহার গৈরিক বসন দেখিয়া সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তপস্বীরা যে কত শক্তিশালী তাহা তাহার অবিদিত ছিল না।

তাঁহারা রুষ্ট হইলে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও লোকের সর্বনাশ করিয়া দিতে পারেন—এ অন্ধ বিশ্বাস তাহার ছিল। দুর্বাসা ও শকুন্তলার কাহিনী সে নিতান্ত অলীক কাহিনীমাত্র মনে করিত না। সে শশব্যস্ত হইয়া আলুলায়িত কুন্তলে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করজোড়ে মহর্ষি সাবর্ণির সম্মুখে সাশ্রুনয়নে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

বলিল, "যদি দোষ ক'রে থাকি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে কেন আপনি এসেছেন, কি আপনি চান, তা জানি না। না জেনে হয়তো অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জানি হিমালয়বাসী তপস্বীরা আমাদের মতো রূপজীবাদের ঘৃণা করেন। প্রায়ই আমাদের অভিশাপ দেন। আপনিও হয়তো আমাকে অভিশাপ দিতেই এসেছেন। কি আমার দোষ তা আমি জানি না, আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। আপনার তপোবলে আমার বিশ্বাস আছে, আপনাদের আমি ভক্তি করি। আমার উপর রাগ করবেন না, আমাকে ঘৃণাও করবেন না—এইটুকু শুধু আমার অনুরোধ। অনেকে আপনাদের নিয়ে উপহাস করে, বিশ্বাস করুন, আমি কখনও তা করি নি। আপনাদের স্বেচ্ছাকৃত দৈন্যকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি। আশা করি আমার এ ঐশ্বর্যকে আপনিও হীনচক্ষে দেখবেন না। আমি দেহ-চর্চা করেছি, হয়তো কিছু রূপও আমার আছে, নৃত্য-গীত-অভিনয়ই আমার বেশী—কিন্তু এসবের জন্য আমি তো দায়ী নই। আমার রূপ, আমার ভাগ্য, আমার প্রকৃতি—কিছুই আমি সৃষ্টি করি নি। আমি ভগবানের সৃষ্টি, তিনি আমাকে যেমন করেছেন আমি তেমনি হয়েছি। পুরুষকে মুগ্ধ করবার জন্যেই তিনি আমাকে সৃষ্টি

করেছেন, অন্য রকম হওয়ার আমার উপায় নেই। আপনি এখনি বললেন যে, আপনি আমাকে ভালবাসেন। তাই আশা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আবার তাই অনুরোধ করছি, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলবেন না। আমার ভয় করছে, আমাকে রক্ষা করুন আপনি—"

নিরঞ্জনা মহর্ষি সাবর্ণির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

মহর্ষি সাবর্ণি তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বলিলেন "ওঠ, ওঠ, কোন ভয় নেই তোমার। তোমাকে আমি ঘৃণাও করি না,অভিশাপ দিতেও আসি নি। আমি তাঁরই নির্দেশে তোমার কাছে এসেছি, যিনি মদনকে ভস্মীভূত ক'রেও পার্বতীর মনস্কাম পূর্ণ করেছিলেন।' তোমাকে আমি ঘৃণা করব কেমন ক'রে? আমি নিজেও তো নিষ্পাপ নই। ভগবান শঙ্কর যে শক্তি আমাকে দিয়েছেন তার অনেক অপব্যবহার আমি করেছি। বিশ্বাস কর, আমি ক্রোধবশে তোমার কাছে আসি নি, এসেছি অনুকম্পাভরে। সত্যই তোমাকে আমি ভালবাসি। হৃদয়ের আবেগই আমাকে তোমার দ্বারে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে হৃদয়াবেগের উৎস পরার্থপরতা, অন্য কিছু নয়। তোমার দৃষ্টি কামনা-কলুষে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা না হ'লে তুমি আমার এই হৃদয়াবেগে সেই পবিত্র বহ্নি প্রত্যক্ষ করতে, যা দেবাদিদেবের প্রসন্ন নয়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয়, যার স্নিগ্ধ স্পর্শ জ্বালাহীন, যা কাউকে দগ্ধ ক'রে অঙ্গার বা ভস্মে পরিণত করে না, যা পবিত্র করে, কৃতার্থ করে, আলোকিত ক'রে, যার স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়—"

নিরঞ্জনা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে আর সাবর্ণিকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহস করিল না।

"আপনার কথায় নিশ্চিন্ত হলাম, আমার ভারি ভয় হয়েছিল। হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীদের কথা আগে আমি অনেকবার শুনেছি। মহর্ষি কারণ্ডব আর তাঁর দুই শিষ্য হংসপক্ষ আর কঙ্কধীমান তো বিখ্যাত তপস্বী, তাঁদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য গল্প আমি শুনেছি। আপনার নামও আমার কাছে অজ্ঞাত নয়, আপনি অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, তপস্যার জোরে সাধনায় অনেক অগ্রসর হয়েছেন—এসব আগেও জানতাম। আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে, আপনার মতো লোক আমার কাছে আসবেন। আপনাকে দেখেই কিন্তু আমি বুঝেছিলাম যে, আপনি সাধারণ লোক নন। আচ্ছা, একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে, আশা করি কিছু মনে করবেন না। বলব কথাটা?"

"বল।"

"বৌদ্ধ ক্ষপণকরা, শ্মশানচারী তান্ত্রিকেরা, বৈদান্তিক বা সাংখ্য পণ্ডিতেরা, ম্লেচ্ছ বা যবন যাদুকরেরা যে আশ্বাস আমাকে দিতে পারেন নি, আপনি কি তা পারবেন? আপনি আমাকে ভালবাসেন বলছেন। আমাকে জরা-মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে পারবেন?"

"নিরঞ্জনা, যারা সত্যই বাঁচতে চায় তারা বাঁচে, মৃত্যু তাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। একটি কথা শুধু শোন। যে সব কুৎসিত ভোগবিলাস মানুষকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায় তা পরিত্যাগ কর। তোমার যে অনুপম দেহ, অনবদ্য রূপরাশি স্বয়ং শঙ্কর সৃষ্টি করেছেন, লোলুপ রাক্ষসদের হাতে তা তুলে দিও না। আমি বুঝতে পারছি, তোমার এসব ভাল লাগছে না। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, আমার সঙ্গে এসে নির্জনতার ক্রোড়ে বিশ্রাম নাও কিছুদিন। হিমালয়ের শান্তিতে অবগাহন কর কিছুকাল।

যা পাওয়ার জন্য তুমি উৎসুক নিজেই এসে আবিষ্কার কর সেটা। তুমি চাইছ আনন্দ, যে আনন্দ অমলিন, যা কখনও শেষ হবে না, কখনও নিষ্প্রভ হবে না। সে আনন্দ কি ক'রে পাওয়া যায় জান? দারিদ্র্য বরণ ক'রে, সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে, সমাধিস্থ হয়ে, ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে বিলীন ক'রে দিয়ে। আজ তোমার আচরণ হয়তো তোমাকে এই সত্য এই আনন্দ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কালই আবার তুমি সেই সত্য আনন্দের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারবে। যা সন্ধান করছ তাই পাবে। নিজেই তুমি বলবে, প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পেলাম—"

নিরঞ্জনা কিন্তু অনেক দূরের কথা ভাবিতেছিল।

"আচ্ছা, আর একটা কথা বলুন তো। আমি যদি আমার বিলাস ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতাপ করি, তা হ'লে স্বর্গে আমার যে নবজন্ম লাভ হবে তাতে আমার এই দেহ, এই রূপ বজায় থাকবে কি?"

"নিরঞ্জনা, আমি তোমার কাছে অনন্ত জীবনের বার্তা এনেছি। আমি যা বলছি তা সত্য—"

"আচ্ছা, এসবের কি প্রমাণ আছে কোনও? আপনি যা বলছেন তা সত্য নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি ধরুন আমি প্রমাণ চাই—"

"প্রমাণ স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর, প্রমাণ আমাদের শৈবশাস্ত্র পুরাণ ইতিহাস, প্রমাণ আমাদের জীবন। এই পথে যদি চল, তুমি নিজেই অজস্র প্রমাণ পাবে। আমাকে অবিশ্বাস ক'রো না।"

"মহর্ষি, আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। সত্যিই আমি জীবনে কোনও সুখ পাই নি। রাণীর চেয়েও ভাল ভাগ্য

নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, কিন্তু সারাজীবন পেয়েছি লাঞ্ছনা আর কষ্ট। সত্যই আমি পরিশ্রান্ত। অনেকে আমার ভাগ্যকে ঈর্ষা করে, কিন্তু আমি ঈর্ষা করি সেই স্থবিরা দন্তহীনা বৃদ্ধাকে, ছেলেবেলায় যাকে আমি নগরতোরণের পাশে ব'সে মিষ্টান্ন বিক্রি করতে দেখতাম। অনেকবার আমার মনে হয়েছে যে, দরিদ্ররাই ভাল লোক, তারাই সুখী, ভগবানের আশীর্বাদ তারাই পেয়েছে, সান্ত্বনাও পেয়েছে। ঠিকই বলেছেন আপনি, দীনতার মধ্যেই মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আপনি আমার মনের অন্ধকার দূর করেছেন, মনের অতলে যে সত্য ঘুমিয়ে ছিল, মনে হচ্ছে, যেন তার ঘুম ভেঙে গেছে। জেগে উঠেছে সে। কিন্তু তবু মনে প্রশ্ন জাগছে, কি বিশ্বাস করব, কাকে বিশ্বাস করব, কি আমার ভবিষ্যৎ, জীবনের অর্থই বা কি ?"

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি সার্বর্ণির মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। একটা স্বর্গীয় জ্যোতিতে যেন তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, "শোন, নিরঞ্জনা, আমি তোমার কাছে একা আসি নি। আর একজন এসেছেন আমার সঙ্গে। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না, কারণ তোমার চোখের দৃষ্টি এখনও স্বচ্ছ হয় নি, এখনও তোমার দৃষ্টির সামনে আবরণ রয়েছে, তাঁকে দেখবার যোগ্যতা এখনও লাভ কর নি তুমি। কিন্তু শীঘ্রই লাভ করবে, দেখবে সে মূর্তি কি মনোহর! তখন নিজেই তুমি বলবে, এমনটি আর কখনও দেখি নি। ইনিই প্রেমের দেবতা। একটু আগে তিনি যদি হাত বাড়িয়ে তোমাকে আমার দৃষ্টি থেকে ক্ষণিকের জন্য অবলুপ্ত ক'রে

না দিতেন, তা হ'লে হয়তো তোমার রূপে আকৃষ্ট হয়ে আমি পাপেই লিপ্ত হতাম, কারণ আমি এখনও দুর্বল। কিন্তু তিনি আমাদের দুজনকেই বাঁচিয়েছেন। তিনি মঙ্গলময়, তিনি শক্তিমান, তিনি ত্রাণকর্তা, তিনিই রুদ্র, আবার তিনিই আশুতোষ। তাঁর এক পলকপাতে প্রলয় ঘটতে পারে: কিন্তু তিনি পরম কারুণিক, সামান্য বিল্বপত্রেই সন্তুষ্ট। স্বয়ং কুবের তাঁর ধনরক্ষক, কিন্তু তবু তিনি অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারী, তবু তিনি দিগম্বর উদাসীন। তিনি মদনকেও ভস্ম করেন, আবার কুমার কার্তিকেয়কেও সম্ভব করেন উমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে। তিনি মহেশ্বর অথচ শ্মশানচারী। তিনি স্থাণু আবার তিনিই নটরাজ। তিনিই আজ আমার সঙ্গে এসেছেন তোমার দ্বারে।···প্রভু, তুমি কি আস নি? তোমার চোখে যে আমি জল দেখতে পাচ্ছি। আমাদের জন্য কাঁদছ তুমি? তোমার অশ্রুধারাই পরিশুদ্ধ করবে নিরঞ্জনাকে। তোমার ঠোঁট দুটি যেন নড়ছে। কি বলবে তুমি, বল। বল, আমি শুনছি।···নিরঞ্জনা, শোন শোন, এ আমার কথা নয়, তাঁর কথা। তোমাকে উদ্দেশ ক'রেই বলছেন—আমি যে তোমাকেই খুঁজছি, পথ হারিয়ে কোথায় তুমি চ'লে গেছ! এতদিন পরে পেয়েছি তোমাকে। আমার কাছ থেকে আর স'রে যেও না। কোনও ভয় নেই তোমার। আমার হাত ধর, আমার সঙ্গে চল, যদি চলতে না পার আমিই তোমাকে বহন করব। এস নিরঞ্জনা, আমার প্রিয় শিষ্যা, আমার কাছে এস। আমার সঙ্গে কাঁদ, সব পাপ ধুয়ে যাবে, সব তাপ শীতল হবে—"

মহর্ষি সাবর্ণি জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন।

নিরঞ্জনা দেখিল, তাঁহার মুখমণ্ডল অপূর্ব প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন স্বয়ং শিবকেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, তাহার অর্ধ-বিস্মৃত বাল্য-জীবন যেন তাহার চোখের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল কিঙ্করকে। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "পরম শৈব কিঙ্করকে মনে পড়ছে আমার। মনে পড়ছে গুরু গোরক্ষনাথকে। যে সময় আমার দীক্ষা হয়েছিল সেই সময়ই যদি আমার মরণ হ'ত, তা হ'লেই ভাল হ'ত বোধ হয়। এ ভোগ আমাকে ভুগতে হ'ত না।"

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি সাবর্ণি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং তাহার দিকে খানিকটা আগাইয়া গেলেন।

"তোমার দীক্ষা হয়েছিল! গোরক্ষনাথ তোমার গুরু! জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর, জয় দেবাদিদেব উমানাথ! কিসের টানে আমাকে যে তোমার কাছে টেনে এনেছে তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। তোমাকে দেখে কেন যে এত ভাল লাগছে—এ রহস্যের গূঢ় মর্মও আর আমার অবিদিত নেই। তোমার সঙ্গে অদৃশ্য মন্ত্রের ডোরে আমি বাঁধা আছি ব'লেই তোমার সন্ধানে তপোবন ত্যাগ ক'রে এই কলুষিত নগরে আমাকে আসতে হয়েছে। এস ভগ্নি, এস, তোমাকে চুম্বন করি।"

সাবর্ণি নিরঞ্জনার ললাট চুম্বন করিলেন। তাহার পর তিনি নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং শিবই এবার নিরঞ্জনার অন্তরে নিগূঢ় ভাষায় কথা বলিবেন, তাঁহার বক্তব্য আর কিছু নাই। নিরঞ্জনাও নত নেত্রে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন

করিতে লাগিল। শিলা-নিবাসে সহসা এক নিবিড় নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। নদীর মৃদু কলধ্বনি আর নিরঞ্জনার ক্রন্দনরব ছাড়া আর কোন শব্দই নিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিল না। মহর্ষি সাবর্ণিও যেন কতকটা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নিরঞ্জনার প্রবহমান অশ্রুধারা দুই গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। কিঙ্কর এবং গুরু গোরক্ষনাথের স্মৃতি তাহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। কৃষ্ণাঙ্গিনী ক্রীতদাসীরা প্রবেশ করাতে সে কতকটা আত্মস্থ হইল। ক্রীতদাসীরা পুষ্পমাল্য গন্ধদ্রব্য এবং নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী বহন করিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের দেখিয়া সম্বিত ফিরিয়া পাইল নিরঞ্জনা। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন হইল। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কেঁদে আর লাভ কি! যা হবার তা তো হয়েছে, হবেও। আপাতত যা কর্তব্য তাই করি। আজ রাত্রে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রাত্রে খেতে হবে আমাকে জীমূতবাহনের বাড়িতে। আরও দু-একটি সুন্দরী মেয়ের আসবার কথা আছে সেখানে। সুতরাং সাজতে হবে আমাকে একটু। তাদের কাছে একটু সেজে না গেলেও মান থাকে না। এরা আমাকে সাজাতে এসেছে। মহর্ষি, আপনি একটু আড়ালে বসবেন গিয়ে?"

"এরা কে?"

"এরা প্রসাধনকুশলা ক্রীতদাসী। অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে এদের কিনেছি। বিশেষ ক'রে সোনার আংটি-পরা কুন্দদন্তা এই মেয়েটি এ বিষয়ে পারঙ্গমা। একজন শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে অনেক টাকা দিয়ে একে কিনেছি।"

মহর্ষি সাবর্ণি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। একবার তাহার মনে হইল, নিরঞ্জনাকে নিমন্ত্রণে যাইতে দিবেন না, বাধা দিবেন—যথাসাধ্য দিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, হঠকারিতা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহাতে হয়তো উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে।

"জীমূতবাহন লোকটি কে? আর কে কে থাকবে সেখানে?"

"জীমূতবাহন নৌবিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি তো থাকবেনই, তা ছাড়া থাকবেন সিন্ধুপতি। আরও জনকয়েক দার্শনিক পণ্ডিতের আসবার কথা আছে। কবি চিন্ময়ও থাকবেন শুনেছি। নৌবিহারের মহাস্থবিরও আসবেন। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ধনী যুবকও আসবেন দু-একজন। তা ছাড়া আসবেন তরুণীরা, রূপ এবং যৌবনই যাদের একমাত্র পরিচয়।"

মহর্ষি সাবর্ণি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, যাও, আপত্তি করব না। কিন্তু আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি কোনও কথা বলব না, চুপ ক'রে তোমার পাশে ব'সে থাকব কেবল।"

নিরঞ্জনা হাসিয়া উঠিল।

"আপনি যাবেন? বেশ, চলুন। কিন্তু হিমাচলবাসী এক সন্ন্যাসীকে আমার প্রণয়ীরূপে দেখলে তারা ভাববে কি?"

ক্রীতদাসীরা তাহাকে সাজাইতে আরম্ভ করিল।

তৃতীয় অধ্যায়

মহর্ষি সাবর্ণির সহিত জীমূতবাহনের গৃহে উপস্থিত হইয়া নিরঞ্জনা দেখিল, অন্যান্য অতিথিগণও আসিয়া পড়িয়াছেন। একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি টেবিলের চারিদিকে মহার্ঘ কৌচগুলির উপর নানাভাবে অঙ্গবিস্তার করিয়া সকলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। টেবিলের উপর অনেকগুলি রৌপ্য থালি সুসজ্জিত রহিয়াছে, টেবিলের মধ্যস্থলে রহিয়াছে চারিটি অপ্সরীবাহিত একটি রৌপ্যভাণ্ড। ভাণ্ডের ভিতরে রহিয়াছে সুসিদ্ধ স্বাদু মৎস্যকে স্বাদুতর করিবার চাটনি।

নিরঞ্জনাকে দেখিয়া অতিথিবর্গ পুলকিত হইলেন এবং নানা বিশেষণে ভূষিত করিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইলেন।

"স্বাগত সৌন্দর্য-লক্ষ্মি!"

"স্বাগত সঙ্গীত-সরস্বতি!"

"বন্দে দেবমানবরঙ্গিণি!"

"নমস্তে চির আকাঙ্ক্ষিতে!"

"স্বাগত দুঃখদায়িনি, দুঃখতারিণি চ!"

"স্বাগত নির্মল-মুক্তে!"

"বন্দে পাটলিপুত্র-কমল-কিন্নরি!"

এই ধরনের সংস্কৃতবহুল হাস্যকর অভিনন্দনে নিরঞ্জনা ঈষৎ বিব্রত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অভিনন্দন-বর্ষণ সমাপ্ত হইলে জীমূতবাহনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "জীমূত, আমি একজন তপস্বীকে সঙ্গে ক'রে এনেছি। মহর্ষি সাবর্ণি—হিমালয়-বাসী পরম শৈব। এঁর সাধনা উজ্জ্বলা, এঁর বাণী অগ্নিগর্ভা—"

জীমূতবাহন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাবর্ণিকে অভ্যর্থনা করিলেন: "স্বাগত। শৈবধর্ম এখন সর্বত্র সম্মানিত। শৈবধর্মকে ব্যক্তিগতভাবে আমিও শ্রদ্ধা করি, যদিও নিজে আমি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ব'লেই এ বিশ্বাস আমার আছে যে, ভগবান তথাগতের সদ্ধর্ম সঙ্কীর্ণ নয়, তা সর্বপ্রকার সত্য ধর্মকে সানন্দে সম্মান দেখাতে পারে। আমাদের পূর্বপুরুষরাও বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক দেবতার মধ্যে, ধর্মের মধ্যে কিছু সত্যের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু ওসব কথা থাক্ এখন। আপনি আসাতে আমি কৃতার্থ হয়েছি—এইটেই এখন সব চেয়ে বড় কথা। পানাহার ক'রে আনন্দ লাভ ক'রে আমাকে ধন্য করুন—এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আসুন, এবার আমরা আরম্ভ করি। সময় তো আর বেশী নেই—"

জীমূতবাহন আন্তরিকতার সহিতই কথাগুলি বলিলেন। কিছু পূর্বেই তিনি নব উদ্ভাবিত নূতন ধরনের একটি রণতরীর সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক একটি বিরাট গ্রন্থের চতুর্থ পর্বও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মনটা বেশ খুশী ছিল। মহর্ষি সাবর্ণিকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন, "মহর্ষি, আমাদের সংসর্গ আশা করি আপনার খুব খারাপ লাগবে না। এখানে অনেকগুলি সজ্জন সমবেত হয়েছেন আজ। আলাপ করলে হয়তো আনন্দ পাবেন। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি এখানকার বিহারের মহাস্থবির হর্ষগম্ভীর। এঁরা তিনজন দার্শনিক—ইনি সিন্ধুপতি, ইনি শিখিকণ্ঠ আর ইনি নভোনীল। আর ইনি হচ্ছেন কবি চিন্ময়। আর এ দুজন হচ্ছেন আমার বন্ধুপুত্র চারুদত্ত আর শুভদত্ত—

এঁরা অশ্বব্যবসায়ী। আর ওঁদের কাছে ব'সে আছে রোহিণী আর রেবতী। ওদের পরিচয় আমি আর কি দেব! ওদের পরিচয় ওদের সর্বাঙ্গেই লেখা রয়েছে, চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

সিন্ধুপতি আগাইয়া আসিয়া সাবর্ণিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কানে কানে বলিলেন, "ফাঁদে পা দিয়েছ দেখছি। তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম, আবার করছি, রতিকে ঘাঁটিও না। তার পাল্লায় প'ড়ে তোমাকে কোথায় আসতে হয়েছে দেখ। তুমি ধার্মিক লোক, গহন অরণ্যের পর্ণকুটিরে তুমি অভ্যস্ত, কোথায় এনে ফেলেছে তোমায় বুঝতে পারছ? সাবধান ভাই, দেবতার উপর তোমার ভক্তি আছে, কিন্তু এর উপর টান হ'লে একেই সবার ওপরে স্থান দিতে হবে এবার। সর্বধর্মের সর্ব দেবতার জননী ব'লে নতি-স্বীকার করতে হবে ওর কাছে। তা না করলে তোমার নিস্তার নেই। রতিদেবী সোজা দেবী নন। পণ্ডিত জনার্দনের মতো গণিতশাস্ত্র বিশারদ কি বলেছিলেন জান? রতির কৃপা না হ'লে আমি ত্রিভুজের মর্ম বুঝতে পারতাম না—"

মহর্ষি সাবর্ণি সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না।

শিখিকণ্ঠ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাবর্ণির দিকে চাহিয়া ছিলেন। মনে করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছেন। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। সহর্ষে তিনি করতালি দিয়া উঠিলেন।

"হয়েছে, হয়েছে। ইনি অভিনয় দেখছিলেন। ওঁর চেহারা, ওঁর দাঁড়ি, ওঁর পোশাক তখনই খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল। নিরঞ্জনা যখন দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করছিল তখনই খুব মেতে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করছিলেন।"

"শৈব মহর্ষি? প্রণম্য ব্যক্তি তা হ'লে। সাবধানে আলাপ করতে হবে, ক্ষেপে গেলে শাপশাপান্ত ক'রে বসবেন হয়তো, চেহারা তো দুর্বাসার মতো, অন্তরে শঙ্করাচার্য আছেন সম্ভবত—"

রোহিণী ও রেবতী চক্ষু দিয়া নিরঞ্জনাকে যেন গ্রাস করিতেছিল। নিরঞ্জনার স্বর্ণাভ চিকুরে দুলিতেছিল নীলাভ অপরাজিতার একটি মালা। মালার প্রতি অপরাজিতাটিকে নীল নয়ন বলিয়া ভুল হইতেছিল, আবার কখনও মনে হইতেছিল তাহার নয়ন দুটিই বুঝি অপরাজিতা ফুল। নিরঞ্জনার রূপের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য, সে রূপের স্পর্শে নির্জীব অলঙ্কারও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। তাহার রূপালি-জরি-বসানো শাড়িটিও একটি বিশেষ ভাবের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রতিটি পাটে পাটে ভাঁজে ভাঁজে যেন বৈরাগ্যের সুর নীরবে বাজিতেছিল। তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িত, যদি তাহার কণ্ঠে স্বর্ণহার বা প্রকোষ্ঠে স্বর্ণকঙ্কণ থাকিত। কিন্তু সে সব ছিল না। বস্তুত সে সবের প্রয়োজনও ছিল না। নিরাভরণ কণ্ঠ ও বাহুর কামনীয়তাই তাহাকে অনন্যা করিয়া তুলিয়াছিল। রোহিণী ও রেবতী নিরঞ্জনার প্রসাধনরুচি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সে কথা তাহাকে বলিল না, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

রোহিণী বলিল, "সত্যি, কি অপরূপ সুন্দরী আপনি! আপনি প্রথমে যখন পাটলিপুত্রে এসেছিলেন তখন কি এর চেয়ে বেশী সুন্দরী ছিলেন? এর চেয়ে বেশী রূপ কি হতে পারে কারও! আমি তখন শিশু, আমার মা আপনাকে তখন দেখেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি, আপনি তখন নাকি অতুলনীয়া ছিলেন—"

রেবতী মুচকি হাসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার

নূতন প্রণয়ীটি কে? কোথায় পেলেন এঁকে, অদ্ভুত চেহারা! হঠাৎ মনে হয় হাতীর মাহুত। কোন্ দেশের লোক ইনি? গুহাবাসী, না, পাতালবাসী?"

রোহিণী রেবতীর মুখে হাত দিয়া বলিল, "বোকার মতো কি যা-তা বলছিস! প্রেমের রহস্য কি সহজে বোঝা যায়? তবে আমি ও-রকম লোকের চুমু খেতে রাজী নই। মুখ তো নয়—যেন আগ্নেয়গিরির গহ্বর। কিন্তু নিরঞ্জনা যেমন দেবীর মতো রূপসী, তেমনি দেবীর মতো করুণাময়ীও। কারো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। আমাদের সঙ্গে ওঁর ওইখানে তফাত। আমরা পছন্দসই লোক না হ'লে কাছে ঘেঁষতে দিই না—"

নিরঞ্জনা উত্তর দিল, "ওঁর সম্বন্ধে সাবধানে কথা ব'লো। উনি যে-সে লোক নন। অসাধারণ শক্তিশালী যাদুকর উনি একজন। খুব আস্তে আস্তে বললেও উনি সব কথা শুনতে পান। এমন কি মনের কথাও অবিদিত থাকে না ওঁর আছে। একটু অন্যমনস্ক হ'লে হয়তো হৃদয়টিই তোমার চুরি ক'রে নেবেন, আর তার জায়গায় রেখে দেবেন কঠিন পাথর একটা। কাল জল খেতে গিয়ে বিষম খেয়ে মারা যাবে—"

ইহার পর জীমূতবাহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "বন্ধুগণ, এইবার আপনারা নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করুন। ওহে, তোমরা এইবার মধু আর সুরা পাত্রে পাত্রে ঢালতে শুরু কর।"

ক্রীতদাসগণ পাত্রে পাত্রে সুরা ঢালিতে লাগিল।

জীমূতবাহন নিজের পাত্রটি তুলিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, অবলোকিতেশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন, যতক্ষণ একটি প্রাণীও বদ্ধ

থাকবে ততক্ষণ আমি নির্বাণে প্রবেশ করব না। যে জড়তায় আমরা আবদ্ধ, সুরা তা কথঞ্চিৎ নাশ করে। তাই সুরার এত আদর। বৈদিক ঋষিরা সুরাকে সোমরস নামে অর্চনা করতেন। আমরা মহাযানীরা কেবল নিজেরা নির্বাণ চাই না, আমরা চাই প্রত্যেকেই নির্বাণ লাভ করুক। সেই ঈপ্সিত আনন্দের যে পাথেয় প্রয়োজন, সুরাপানে আশা করি আমরা তা পাব। আসুন—”

মহর্ষি সাবর্ণি ব্যতীত আর সকলেই সুরাপান করিতে লাগিলেন। বিলাস-লালসা-ক্লিন্ন সুরাপায়ী লোকগুলির সান্নিধ্য সাবর্ণি পছন্দ করিতেছিলেন না ; কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। নিরুপায় হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

সুরাপাত্রটি এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া শিখিকণ্ঠ কহিলেন, “আমার পিতামহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হয়তো এই ধর্মের মর্ম বুঝতেন, আমার বাবাও আশা করি বুঝতেন, আমি কিন্তু কিছু বুঝি না। কোন ধর্মের মর্মই আমার মাথায় ঢোকে না। নির্বাণের প্রকৃত অর্থ কি তা আজও আমার বোধগম্য হ'ল না। অশ্বঘোষ এর যে অর্থ করেছিলেন তা যদি হয় অর্থাৎ নির্বাণ মানে যদি নিবে যাওয়া হয়, তা হ'লে সে নির্বাণ লাভ করবার আগ্রহ আমার নেই। আমি চিরকাল জ্বলতেই চাই। মনে হয় মহামাত্য জীমূতবাহনও তাই চান, না চাইলে তিনি রণতরী নির্মাণে এমন ভাবে আত্মনিযোগ করতেন না—”

জীমূতবাহন হাসিয়া উত্তর দিলেন, “শিখিকণ্ঠ, আমি জানি, সমাজ বিষয়ে তুমি উদাসীন, সামাজিক দায়িত্বের কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে। তোমার ধারণা, ধার্মিক হ'লেই বুঝি লোটাকম্বল নিয়ে সংসার ত্যাগ করতে হয়। আমি কিন্তু মনে করি, ধার্মিক

হয়েও দেশসেবা করা সম্ভব। আর এও মনে করি যে, দেশসেবা করতে হ'লে শক্তিশালী রাষ্ট্রের উচ্চকর্মচারী হিসাবে করতে পেলে অনেক সুবিধা হয়, অনেক বেশী সুযোগ পাওয়া যায়। ধর্মের মত রাষ্ট্রও মানবসভ্যতার একটা বড় সম্পদ। আর তারা পরস্পর-বিরোধীও নয়। রাষ্ট্রের সেবা করা আর ধর্মের সেবা করা অনেক সময় একই জিনিস। অদ্ভুত জিনিস এই রাষ্ট্র—"

দেখা গেল, চারুদত্ত বা শুভদত্ত নির্বাণ বিষয়ে তেমন কৌতূহলী নন। হর্ষগম্ভীরের উক্তির মাঝখানেই চারুদত্ত শুভদত্তকে বলিলেন, "শ্রেষ্ঠী মিত্রশেখরের মন্দুরায় যে নতুন ঘোড়াটা এসেছে দেখেছ? চমৎকার নয়? ঘোটকী হ'লে তন্বী বলতাম। কি ছিপছিপে গড়ন, কি গ্রীবাভঙ্গী—"

শুভদত্ত মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন "দেখেছি, কিন্তু তুমি যতটা উচ্ছ্বসিত হয়েছ, তেমন কিছু নয়। ক্ষুরগুলো দেখেছ? ক্ষুরগুলো কত ছোট লক্ষ্য করেছ? ও ঘোড়া বেশীদিন দৌড়তে পারবে না, কিছুদিনের মধ্যে খোঁড়া হয়ে পড়বে—"

ঘোড়ার আলোচনাতেও বাধা পড়িল। রেবতী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, আর একটু হ'লেই আমি মাছের কাঁটা গিলে ফেলেছিলাম একটা। কাঁটা তো নয়, কাটারি যেন একখানা। ভাগ্যে গিলে ফেলি নি! এ কাঁটা পেটে ঢুকলে আর রক্ষে ছিল না। ঠাকুর আমাকে ভালবাসেন, তাই বাঁচিয়ে দিলেন—"

"ঠাকুর ভালবাসেন না কি তোমাকে?" সিন্ধুপতি হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তা হ'লে ঠাকুরের মানুষের মতো দুর্বলতা আছে বলতে হবে। ভালবাসা মানেই দুঃখ পাওয়া। ঠাকুর-দেবতারাও

দুঃখ ভোগ করেন নাকি আমাদের মতো? তা হ'লে তাঁরাও তো নিখুঁত নন, আমাদের মতন হতভাগ্য।"

রেবতী চটিয়া গেল।

"আপনি চুপ করুন তো, বোকার মতো যা-তা বলবেন না। অদ্ভুত আপনার স্বভাব, কোন জিনিসের সোজা মানে বুঝতে পারেন না, মনে হয় বুঝেও যেন বোঝেন না। ইচ্ছে ক'রে সোজা জিনিসকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে দেবার মানে কি! ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না।"

রেবতী থামিতেই সিন্ধুপতি বলিলেন, "থেমো না রেবতী, তোমার যা খুশি ব'লে যাও, কিন্তু থেমো না। যতবার তুমি মুখ খুলছ ততবার তোমার দাঁতগুলি দেখতে পাচ্ছি আর মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তোমার দাঁতের কাছে কুন্দফুল সত্যিই হার মেনেছে—"

এই সময়ে ধীরপদে একজন বৃদ্ধ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি সাধারণ, বিলাস বা পারিপাট্যের কোন চিহ্ন নাই, মুখমণ্ডল গম্ভীর, গতিভঙ্গী যেন একটু উদ্ধত। তিনি অতিথিবর্গের নিকটবর্তী হইতেই জীমূতবাহন ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিলেন এবং নিজের পাশে বসাইলেন।

"আসুন, শীলভদ্র, আসুন। এইখানে বসুন আপনি। ইদানীং নূতন কোনও গ্রন্থে হাত দিয়েছেন নাকি? আমার যতদূর স্মরণ হয় বিরানব্বইটা অমর গ্রন্থ আপনার অক্লান্ত লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে। আমরা আরও আশা করি। আশার তো শেষ নেই।"

শীলভদ্র নিজের দুগ্ধশুভ্র শ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "দোয়েল পাখী সারাজীবন গান গেয়ে যায়। ওইটেই

তার পক্ষে স্বাভাবিক। নীতির মহিমাকীর্তন করাও আমার পক্ষে তেমনি। ও ছাড়া আমি আর কিছু করতে পারি না, ওই আমার একমাত্র কাজ। সারাজীবন ওই ক'রে চলেছি—"

শিখিকণ্ঠ। মহর্ষি শীলভদ্র, আপনি আমাদের সকলের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমাদের যে সব নীতিনিষ্ঠ গম্ভীরচরিত্র পূর্বপুরুষদের কাহিনী আমরা শুনি, আপনিই বোধ হয় তাঁদের শেষ প্রতীক। তাঁদের শুভ্রমহিমার আভাস আপনার মধ্যেই পাই কেবল। বর্তমানযুগের জনতায় আপনি একক। আপনার কথাও বোধ হয় সকলে বুঝতে পারে না।

শীলভদ্র। ওটা তোমার ভুল ধারণা শিখিকণ্ঠ। নীতির মহিমা আজও অম্লান আছে পৃথিবীতে। মগধে, ইন্দ্রপ্রস্থে, এমন কি গান্ধারেও আমার অনেক অকপট শিষ্য আছেন। শুধু ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরাই নয়, রাজা মহারাজা, শ্রেষ্ঠী বণিক, এমন কি অনেক ক্রীতদাসও বিশুদ্ধ নীতিধর্মের সমর্থন ক'রে প্রাচীন ঋষিদের সম্মান আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আর নীতিধর্ম যদি লোপই পায়, তা হ'লেই বা আমার ক্ষতি কি! নীতিধর্মের উত্থান-পতনের সঙ্গে আমার সুখদুঃখের কোন সম্পর্ক নেই, নীতিধর্মকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বও আমার নয়। নির্বোধেরাই নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা ক'রে শেষে অসুখী হয়। ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে, যা ইচ্ছা নয় তা হবে না—এইটেই আমি জানি। সেইজন্যই আমি সহজে বিচলিত হই না কোন কিছুতে। নির্বিকার না হ'লে সুখী হওয়া যায় না। নীতিধর্ম যদি লোপ পায় পাক, তাতে আমার মানসিক শান্তি একটুও বিঘ্নিত হবে না। জ্ঞানচর্চা ক'রে বা অভয়কে উপলব্ধি ক'রে আমি যে আনন্দ পেয়েছি এতেও ঠিক

সেই রকমই আনন্দ পাব। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানকে অনুকরণ করাই আমার সমস্ত প্রয়াসের মূল নীতি। আমার এও মনে হয় যে, ঈশ্বরের চেয়েও এই অনুকরণ বেশী মূল্যবান, কারণ এ অনুকরণ করা দুরূহ তপস্যাসাপেক্ষ।

সিন্ধুপতি। বুঝেছি। এরূপ তপস্যা যে দুরূহ তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। কিন্তু সুমহৎ ঈশ্বরকে নকল করাই যদি জীবনের লক্ষ্য হয় এবং তার জন্য অসীম কৃচ্ছ্র সাধনা করার নামই যদি তপস্যা হয়, তা হ'লে যে ব্যাঙটা নিজের দেহটাকে ফুলিয়ে ষাঁড়ের মতো হতে চেয়েছিল তাকেও একজন উঁচুদরের তপস্বী বলতে হবে।

শীলভদ্র। সিন্ধুপতি, তুমি ব্যঙ্গ করছ। ব্যঙ্গে তুমি সুনিপুণ। কিন্তু যে ষাঁড়ের কথা এখনই তুমি বললে তা সত্যিই যদি ঈশ্বর হয় এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনও ভেক সত্যই যদি তার সমতুল্য হতে পারে, তা হ'লে ষাঁড়ের চেয়ে ভেককেই তুমি কি বেশী বাহাদুরি দেবে না? ভেকের এ অসাধ্য-সাধনের কে না প্রশংসা করবে!

শীলভদ্রের কথা শেষ হইতে না হইতে মহার্ঘ পরিচ্ছদে সজ্জিত চারিজন ভৃত্য একটি কারুকার্যময় বিরাট রৌপ্যপাত্র বহন করিয়া প্রবেশ করিল। পাত্রের উপর ছিল একটি আস্ত বন্যশূকর। শূকরটি সম্ভবত শূল্যপক্ব নয়, সিদ্ধ করা। কারণ তাহার গাত্রের রোমাবলী নষ্ট হয় নাই। তাহার সঙ্গে ময়দার তৈরী কয়েকটি শূকরছানাও থাকাতে বোঝা যাইতেছিল যে ওটি শূকর নয়, শূকরী।

মহর্ষি সাবর্ণির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দার্শনিক নভোনীল বলিলেন, "খুবই আনন্দের কথা যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একজন

অতিথি আজ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সঙ্গদান ক'রে আমাদের কৃতার্থ করছেন। আরও আনন্দের কথা যে ইনি একজন অসামান্য ব্যক্তি। ইনি অরণ্যনিবাসী বিখ্যাত মহর্ষি সাবর্ণি। শুনেছি অরণ্যের নির্জনতায় শিবের ধ্যান ক'রে ইনি অদ্ভুত তপস্বী-জীবন যাপন ক'রে থাকেন।"

জীমূতবাহন। আমরাও শুনেছি সে কথা। ওঁকেই আজ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করতে আহ্বান করছি।

নভোনীল। কিন্তু আমি আর একটা কথাও বলতে চাইছি। ওঁকে শুধু প্রধান অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করলেই যথেষ্ট হবে না। ওঁর আনন্দবিধান করতে হবে। দেখতে হবে কি ওঁর সত্যিই ভাল লাগে! আমার নিজের ধারণা, খাদ্য বা পানীয়ের বৈচিত্র্য ওঁকে ততটা মুগ্ধ করবে না, যতটা করবে আলোচনার বৈচিত্র্য। উনি যে-ধর্মের সাধক সেই ধর্মের আলোচনাই নিঃসন্দেহে ওর পক্ষে প্রীতিকর হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমারও হবে, যদিও শৈবধর্মের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য, কিন্তু শিবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। বিশ্বের মঙ্গলার্থে যিনি বিষপান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে যে সব রূপক বা পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে তা অপরূপ। মহত্ত্বের অসংখ্য নিদর্শন আছে সে সবের মধ্যে। এ দেশে অনেক ধর্ম আছে যা ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যার মূল কথা ভয়ঙ্করকে নানাভাবে তোষামোদ ক'রে তুষ্ট করা। এদের যদি দেবতা আখ্যাও দেওয়া যায় তা হ'লেও বলতে হবে, এরা অতি নিম্নস্তরের দেবতা, নিম্নস্তরের লোকদেরই পূজা পাবার যোগ্য। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল থেকে আর্যঋষিরা শিবের যে সব কল্পনা করেছেন, তা সুস্পষ্ট হয়েও এত নিগূঢ়, এত ভয়ঙ্কর অথচ এত

মনোহর, এত আপাতবিরোধী অথচ এত সত্য যে, মনে হয়, মানুষ গ যুগে যে সব শক্তির কাছে মাথা নত করেছে মহেশ্বরই তার প্রতীক। তিনি ধ্বংসেরও দেবতা, সৃষ্টিরও দেবতা, তিনি ভস্ম করেছেন আবার পার্বতীরও মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। সমুদ্র-মন্থনের পর যখন বিষ উঠল, যখন সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম হ'ল, তখন বিষপান ক'রে সৃষ্টিরক্ষা করলেন তিনিই, যাঁর কাজ হচ্ছে সৃষ্টি ধ্বংস করা। এই পরস্পরবিরোধী-গুণসম্পন্ন দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের কাব্যে ধর্মে স্থপতিতে, এক কথায় আমাদের সমাজে প্রতিভার যে স্ফুরণ হয়েছে তা অলঙ্কৃত করেছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে। একটা বিশেষ কল্পনা রূপায়িত হয়েছে শিবকে কেন্দ্র ক'রে। সেই কল্পনা হচ্ছে এই যে, জীবন আর মৃত্যু বিভিন্ন নয়, একই ধারার বিভিন্ন প্রকাশ। দুটো অবস্থা বিচ্ছিন্ন নয়। জন্মে যার আরম্ভ, মৃত্যুতে তারই স্বাভাবিক পরিণতি, এবং সে পরিণতি সমাপ্তি নয়,—আর এক জন্মের, নবীনতর আর এক আরম্ভের সূচনা। প্রগতিশীল আর্যসভ্যতা যুগে যুগে নূতন দৃষ্টিতে দেখেছে জীবনকে, যুগে যুগে তার দর্শন বদলেছে, শিবকে যদি আমরা সে সবের সমন্বয় বা সার মনে করি, তা হ'লে—

শিখিকণ্ঠ। নভোনীল, একটু থাম ভাই। আগে আমার একটা কথা শুনে নাও। প্রগতিশীল আর্যসভ্যতার দর্শন-বৈচিত্র্য শুধু শিবকে কেন্দ্র ক'রে কেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে কেন্দ্র ক'রেও তো এ দেশে আবর্তিত হয়েছে—দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীকে কেন্দ্র ক'রেও। পুরাণ প'ড়ে দেখলেই আমার কথার যাথার্থ্য বুঝতে পারবে। বৌদ্ধধর্মের আওতাতেও যে সব দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মহিমাও কম বৈচিত্র্যময় নয়। বৈচিত্র্যকেই যদি

শিব-মহিমার মাপকাঠি হিসাবে ধরো, তা হ'লে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর দাবীটা অন্তত বিস্মৃত হ'য়ো না।

নভোনীল। দেখ ভাই শিখিকণ্ঠ, তর্ক ক'রে বৃহৎ সত্যকে কখনও ধরা যায় না। বৃহৎ উপলব্ধিকে অনুভবে বুঝতে হয়। নির্বাণ কি, বুদ্ধদেব তা ভাষায় বলতে পারেন নি। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা, এমন কি বুদ্ধিমান লোকেরাও তা বুঝতে পারেন নি। পেরেছেন তপস্বীরা। সত্যের উপলব্ধি তর্ক ক'রে হয় না, বুদ্ধি দিয়েও হয় না। তার জন্যে মনের একটা বিশেষ প্রস্তুতি, বিশেষ অনুভূতি চাই। শিবের কথা বলছিলাম, তাঁর সম্বন্ধেই বলি তাঁর অনেক নাম আছে। শিব, মহেশ্বর, ত্র্যম্বক, ধূর্জটি, নীলকণ্ঠ, জলমূর্তি প্রভৃতি অনেক নাম থেকে আমি এইটুকু শুধু বুঝেছি যে, ওগুলো বিভিন্ন তপস্বীর বিভিন্ন রকম উপলব্ধির ফল। শিবকে যিনি যেমনভাবে দেখেছেন, তিনি তেমনই নামকরণ করেছেন। বৃহৎ সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন নি সবাই, যিনি যতটুকু পেরেছেন তিনি ততটুকুকেই একটা বিশেষ নামে চিহ্নিত করেছেন। এ কথাও পুরাণকারেরা বলেছেন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মূলত একই সত্য, আমাদের বোঝবার সুবিধার জন্য আলাদা আলাদা নাম, আলাদা আলাদা রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের মহিমার বৈচিত্র্যও তাই কীর্তিত হয়েছে আলাদা আলাদা ক'রে—

শিখিকণ্ঠ। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্ত্রী দেওয়াও কি প্রয়োজন ছিল সে জন্য ?

নভোনীল। ছিল বই কি। আধ্যাত্মিক জগতে স্ত্রীলোকদের

বিশেষ মহত্বপূর্ণ স্থান আছে। এটা কারও অবিদিত নেই যে, জীবজগতে স্ত্রীলোকেরই প্রসবিতা, স্ত্রীলোকেরাই জননী। এর অর্থ বিশদ করলে এই দাঁড়ায় যে, অতি সূক্ষ্ম বীজকে ওঁরা গোপনে আহরণ করেন, গোপনে লালন ক'রে বড় করেন, তারপর প্রসব করেন সন্তানরূপে। এই ভাবে সমস্ত জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন ওঁরা। তাই ওঁদের জগদ্ধাত্রীরূপে অভিহিত করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতেও সেই এক ব্যাপার। সূক্ষ্মভাবকে মনের মধ্যে গ্রহণ ক'রে লালন করবার, পালন করবার এবং অবশেষে বৃহৎ রূপে প্রসব করবার অদ্ভুত শক্তি আছে ওঁদের। আমাদের দেশে তাই ওঁদের নামই দেওয়া হয়েছে শক্তি। পুরুষদের অনুভূতিতে যা এড়িয়ে যায়, পুরুষরা যা ধরতে পারেন না, তা ওঁদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে। শুধু ধরা পড়ে! সেই অনুভূতিকে লালন ক'রে ওঁরা আশ্চর্য সৃষ্টিতে পরিণত করতে পারেন। পুরুষে এ ক্ষমতা নেই। পুরুষও স্রষ্টা, অজস্র সৃষ্টির বীজ, অসংখ্য আধ্যাত্মিক প্রেরণা পুরুষই বিকিরণ করতে পারেন; কিন্তু তাকে সংহত ক'রে সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে পারেন নারীরা। সেইজন্যই পুরাণে প্রত্যেক স্রষ্টার সঙ্গে এক-একজন শক্তিও যুক্ত হয়ে আছেন। ব্রহ্মার সঙ্গে বাণী না থাকলে ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রকাশই পেত না। বাণী প্রকাশের দেবতা। বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী না থাকলে বিষ্ণু পালন করতে পারতেন না, কারণ লক্ষ্মীই প্রকৃত পালনের দেবতা, তাঁর শক্তি না পেলে বিষ্ণুর পক্ষে পালন করা সম্ভবপরই হ'ত না। মহাদেবের সঙ্গে আমরা কিন্তু দেখি সতীকে, পার্বতীকে আর আর কালীকে। পুরাণকারেরা এই তিনটি শক্তিকে এক ক'রে দেখবার নানা প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন,

দক্ষকন্যা সতী শিবনিন্দা শুনে আত্মহত্যা করেন। শিব তাঁর মৃতদেহকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ক্রমশ সেই মৃতদেহ খণ্ডীকৃত হয়ে ভারতের একান্ন স্থানে প'ড়ে একান্নটি পীঠস্থান হ'ল। তারপর পুরাণকারদের কল্পনায় সেই সতীই আবার মূর্ত হলেন পার্বতীরূপে, জন্মগ্রহণ করলেন হিমালয়-দুহিতা হয়ে—মেনকার ক্রোড়ে। তিনি তপস্যা ক'রে পেলেন মহাদেবকে পতিরূপে। এই পার্বতীরও আবার নানা রূপ। অর্ধস্ফুট কৈশোরে তিনি আলোকের মতো ব'লে উমা, কাঞ্চনবর্ণা ব'লে গৌরী। তারপর তিনি যখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন তখন তিনি দুর্গা। শুধু তাই নয়, বিভিন্নরূপে বিনাশ করেছেন তিনি। মহিষাসুরকে মেরেছেন মহিষমর্দিনীরূপে, রক্তবীজকে সংহার করেছেন কালীরূপে, শুম্ভকে মেরেছেন তারারূপে, নিশুম্ভকে বধ করেছেন ছিন্নমস্তারূপে। কখনও বা জগদ্ধাত্রীরূপে, কখনও বা দশভুজা হয়ে অসুরবাহিনী বিনাশ করেছেন তিনি। চণ্ডীমাহাত্ম্য নারী-মহিমারই কীর্তন। যে সব অসুর মানব-সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল তাদের বিনাশ করেছেন নারী-রূপিণী শক্তি, পুরুষেরা পারেন নি। ব্রহ্মকেও আবিষ্কার করেছেন নারীরা। উপনিষদে আছে, দেবতারা ব্রহ্মকে প্রথমে চিনিতে পারেন নি, পেরেছিলেন উমা। সেইজন্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের সঙ্গে একটি ক'রে শক্তিস্বরূপিণী নারীর সংযোগসাধন করেছেন পুরাণকারেরা।

শিখিকণ্ঠ। তোমার নারী-প্রশস্তির সঙ্গে আমার মতেরও কিছুমাত্র অমিল নেই। কিন্তু আমার আসল প্রশ্নটা ছিল নারী নয়, মহেশ্বরের মহিমা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর এই ত্রয়ীকে

যদি তিনটি পৃথক সত্তা ব'লে মনে কর এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়, তা হ'লে কেবল মহেশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলা শক্ত—

নভোনীল। দেখ, দেবতাদের মধ্যে কে বৃহত্তম, সে বিচার সাধারণ লোকেদের। যাঁরা তপস্বী তাঁরাও নিজেদের আরাধ্য দেবতাকে হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, না মনে করলে তাঁদের সাধনা হয়তো নিখুঁত হয় না। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে আমরা যখন বিচার করব তখন আমাদের দৃষ্টি উদারতর হওয়া উচিত। লাল শ্রেষ্ঠ, কি নীল শ্রেষ্ঠ, কি সবুজ শ্রেষ্ঠ—এ বিচার যেমন হাস্যকর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—সে বিচারও তেমনি হাস্যকর। আমি কেবল বলবার চেষ্টা করছিলাম যে মহাদেবকে যখন দেবাদিদেব বলা হয়েছে, তখন মনে হয় এ দেশের কবিরা মহাদেবের মধ্যেই বোধ হয় সর্বপ্রথম ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরও স্বরূপ কল্পনা করেছিলেন। ব্রহ্মার শক্তিরূপে পরে যিনি সরস্বতী হয়েছেন, তিনিই হয়তো সতী; বিষ্ণুর লক্ষ্মীকে হয়তো প্রথমে তাঁরা পার্বতীরূপে চিত্রিত করেছেন। এসব অবশ্য আমার কল্পনা, সত্য না-ও হতে পারে। ভাই, সত্যকে পাওয়ার উপায় বিজ্ঞানও নয়, কল্পনাও নয়। আনন্দময় উপলব্ধি ছাড়া সত্যের নাগাল পাওয়া যায় না।

হর্ষগম্ভীর। এ কথাটা খুব ঠিক বলেছ নভোনীল। আনন্দই হ'ল তাঁর স্বরূপ। দেহ বা মন সে আনন্দলাভ করতে অক্ষম, পারে শুধু আত্মা। দেহের জড়তা অতিক্রম ক'রে মায়াময় মনোজগৎ পার হয়ে বিশুদ্ধ আত্মাই সে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে। তখন তার কাছে মৃত্যু নবজন্মের সূচনারূপে প্রতিভাত হয়, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে সে তখন একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করে, তখনই সে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ ক'রে অস্তিত্বের চরমশিখরে উঠে

সমাধিস্থ হয়। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর নেই। এই অবস্থারই বিশেষণ নির্বিকার নিখুঁত নির্গুণ। এই অনাদি এই অনন্ত অস্তিত্ব।

সিন্ধুপতি। চমৎকার বলেছেন। কিন্তু দেখুন, আমার মাঝে মাঝে একটু খটকা লাগে। অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের মধ্যে আমি কেমন যেন গুলিয়ে ফেলি, কোনও প্রভেদ দেখতে পাই না। ভাষা দিয়ে এদের তফাত কি বোঝানো যায়? যা আপনি অনন্ত অস্তিত্ব ব'লে বর্ণনা করলেন তা আমার কাছে ভয়ঙ্কর শূন্য ব'লে মনে হ'ল। কারণ শূন্য ছাড়া আর কি অনাদি বা অনন্ত হতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হ'ল, একেবারে শূন্য কোন কিছু কল্পনা করাও শক্ত। আপনি যে অবস্থাকে নির্বিকার নিখুঁত নির্গুণ ব'লে বর্ণনা করলেন, তা পেতে হ'লে আমরা অস্তিত্ব বলতে যা বুঝি সেটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হবে। তা হ'লে আর রইল কি! ভগবানকেও এই শোচনীয় অবস্থায় ফেলেছেন দার্শনিকেরা; কারণ তাঁকেও তাঁরা নির্বিকার নির্গুণ নিখুঁত ব'লে কল্পনা করেছেন। শূন্যের মধ্যে যদি সব হারিয়ে যায়, তা হ'লে অস্তিত্ব আর নাস্তিত্বের কোনও প্রভেদ থাকে না! তখন মনে হয়, আমরা কিছুই জানি না। লোকে বলে, দার্শনিকদের মধ্যে মতের মিল হয় না। যাঁরা দার্শনিক নন, তাঁদের মধ্যেও মতের মিল নেই। কিন্তু আমার মনে হয় সকলের সঙ্গে সকলের মিল শেষ পর্যন্ত হবেই, আমরা পথটা খুঁজে পাচ্ছি না।

জীমূতবাহন। দর্শনশাস্ত্রের রহস্যময় জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামালে সময় মন্দ কাটে না। অবসর পেলে আমিও মাঝে মাঝে জট ছাড়াই। কিন্তু আমার ভাল লাগে কৌটিল্যদর্শন। ওহে,

আরও মাধ্বী সুরা আন। সকলেরই পানপাত্র খালি হয়ে গেছে দেখছি। ভ'রে দাও আবার।

চিন্ময়। সুরা-প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কথা মনে পড়ল একটা। যখন সুরাপান করি না, তখন সমাজের সুখ শান্তি ঐশ্বর্যের মহিমা মনকে মুগ্ধ করে। মনে হয় লোকে পেট ভ'রে খাচ্ছে, প্রাণ ভ'রে ঘুমুচ্ছে, প্রেমে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, কাব্যে প্রেরণা পাচ্ছে—এই সবই বুঝি আনন্দের চরম অভিব্যক্তি। কিন্তু আপনার উৎকৃষ্ট মাধ্বী সুরা পেটে পড়লেই মনের অবস্থা বদলে যায়। তখন যুদ্ধের সাধ জাগে। মনে হয় সমাজের উন্নতির জন্য যুদ্ধ করা কিংবা স্বাধীনতার জন্য রণাঙ্গনে ছুটে যাওয়ার চেয়ে বেশী আনন্দ বুঝি আর কিছুতে নেই। শান্তিময় সামাজিক জীবনকে অত্যন্ত হীন মনে হয় তখন, সে জীবন যাপন করছি ব'লে লজ্জা অনুভব করি। মনে হয় এ শান্তি পরাধীনতার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু নয়। তখন ইচ্ছা করে, স্বাধীনতার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন আমিও তেমনি করি। স্বাধীনতার গান গাইতে গাইতে অসিহস্তে রণাঙ্গনে লুটিয়ে পড়ি রক্তাক্তদেহে—

জীমূতবাহন। আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু সে স্বাধীনতাও সঙ্কীর্ণ ছিল, তা সকলের জন্য ছিল না। তাঁরা যেটা সর্বজনীন স্বাধীনতা নামে অভিহিত করতেন, সেটা তাঁদেরই বাহুবলার্জিত স্বেচ্ছাচার কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ আছে। একটা জাতির পক্ষে স্বাধীনতা যে পরম সম্পদ তা আমি জানি। কিন্তু যতই বয়স বাড়ছে ততই বুঝতে পারছি যে, কেন্দ্রে শক্তিশালী শাসনকর্তা বা শাসন-পরিষদ

না থাকলে দেশের মঙ্গল হয় না। সাধারণ লোকেরা তাদের সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতাও নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে না। শাসনব্যবস্থা দুর্বল বা শিথিল হ'লেই প্রজাদের বিপদ। সেজন্য যাঁরা বক্তৃতা দিয়ে বা অন্য কিছু ক'রে শাসনব্যবস্থাকে শক্তিহীন করবার প্রয়াস পান, তাঁরা প্রজাদের মিত্র নন। এটাও আমি অনুভব করেছি, যাবনিক গণতন্ত্রবাদ প্রচলিত হবার আগে প্রজারা ধার্মিক শক্তিশালী রাজাদের রাজত্বেই সুখে বাস করত।

হর্ষগম্ভীর। আমার মতে কিন্তু, ভাই জীমূতবাহন, কোনও শাসনব্যবস্থাই সুব্যবস্থা নয়। কোনও সুব্যবস্থা যে হবে সে আশাও আমার আর নেই। যবনেরা অনেক রকম ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু কিছুই টেঁকে নি। আমি তো কোথাও কোন আশা দেখি না। লক্ষণ দেখে বরং মনে হয় সমাজ ক্রমশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, সমস্ত মানবজাতিটাই ক্রমশ যেন ধাপে ধাপে নেবে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার মনে হয় এই শোচনীয় অধঃপতনে সাহায্য করাই বুঝি আমাদের একমাত্র কর্তব্য। আর কিছুই তো করতে পারছি না আমরা। আমাদের সমস্ত বুদ্ধি বিজ্ঞান ধর্মের আদর্শ দিয়ে আমরা কি আর করছি বল? মানব-জাতির আসন্ন মরণটাকে অনুভব করছি কেবল, উপভোগ করছি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

জীমূতবাহন। পশু-প্রকৃতির মানব ভয়ঙ্কর সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজকোষে যদি অর্থ থাকে, নৌবহর এবং সেনাবাহিনী যদি শক্তিশালী থাকে, তা হ'লে—

হর্ষগম্ভীর। ওই ভয়ঙ্কর পশু-প্রকৃতিই জয়ী হবে শেষে। আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে লাভ কি? সাম্রাজ্য যত বড়ই হোক, তা একদিন

ধ্বংসোন্মুখ হবেই এবং সেই ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যকে অসভ্য বর্বরের দল একদিন লুটে খাবেই—এই ইতিহাসের সাক্ষ্য। এই ভারতবর্ষে আর্য-মহিমার আলো একদিন দশ দিক উদ্ভাসিত করেছিল, এইখানেই একদিন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রাজত্ব করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক। এইখানে ভবিষ্যতে আসবে উন্মত্ত পশুর দল। সর্বত্রই আসবে। পৃথিবীতে উচ্চাঙ্গের শিল্প সাহিত্য বা দর্শন ব'লে কিছু আর থাকবে না। ভবিষ্যতের শিল্প সাহিত্য বা দর্শন পশুত্বেরই জয়গান করবে। কেবল মন্দির থেকে নয়, মানুষের হৃদয় থেকেও দেবতারা বিতাড়িত হবেন। মহারাত্রি কালরাত্রি ঘনিয়ে আসবে। অসভ্য পশুরা কি বেদ উপনিষদ বেদান্ত সাংখ্য ত্রিপিটকের মর্ম বুঝতে পারবে কখনও? পারবে না। ভিত্তি টলছে, সব ধ্বংসে যাবে। যে ভারতবর্ষ একদিন জ্ঞানবিজ্ঞানে পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল, সেই ভারতবর্ষেই জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্মশান রচিত হবে। ভয়ঙ্কর মহাকালের ব্যায়ত আনন আমি দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমিই বোধ হয় শেষ মন্দিরের শেষ পুরোহিত—

এই সময় ঘরের পরদা সরাইয়া এক অদ্ভুতাকৃতি কুব্জ মনুষ্যমূর্তি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কেশহীন মস্তক গম্বুজের মতো। পরিধানে নীলরঙের আলখাল্লা, লালরঙের পায়জামাটি স্বর্ণতারকা-খচিত। মহর্ষি সাবর্ণি একেশ্বরবাদী পণ্ডিত অগ্নিদেবকে অবিলম্বে চিনিতে পারিলেন। এই লোকটিকে তিনি বড় ভয় করিতেন। ইনি শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের সঙ্কীর্ণতাকে প্রখর যুক্তিবলে ছিন্নভিন্ন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইনি প্রচলিত সর্বপ্রকার ধর্মসম্প্রদায়েরই শত্রু। মহর্ষি সাবর্ণির

আশঙ্কা হইল, এই দুর্ধর্ষ লোকটা তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এখনই হয়তো চীৎকার করিয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি করিবে। অর্বাচীন পণ্ডিতদের অসার বাহ্বাস্ফোটে তিনি এতক্ষণ বিচলিত হন নাই, অগ্নিদেবকে দেখিয়া কিন্তু তিনি ভীত হইলেন। তাঁহার একবার ইচ্ছা হইল উঠিয়া পলায়ন করেন; কিন্তু নিরঞ্জনার দিকে চাহিয়া সে ইচ্ছা তিনি দমন করিলেন। তিনি অনুভব করিলেন, নিরঞ্জনার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দেবীত্বে উন্নীত হইতে তাহার আর বিলম্ব নাই। অগ্নিদেব সত্যই যদি ক্ষেপিয়া উঠেন, নিরঞ্জনাই তাঁহাকে রক্ষা করিবে। নিরঞ্জনা তাঁহার পাশেই বসিয়া ছিল, তিনি বাম হাত দিয়া তাহার অঞ্চলটি ধরিয়া রহিলেন। মনে মনে শঙ্করকেও স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অগ্নিদেবের আবির্ভাব সকলকেই পুলকিত করিল। তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং বাগ্মিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলেই সহর্ষে তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইলেন।

হর্ষগম্ভীরই প্রথমে কথা কহিলেন—

"আপনার আগমনে আমরা সকলেই আনন্দিত হয়েছি অগ্নিদেব। খুব ভাল সময়ে এসেছেন আপনি। শৈবধর্ম নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা চলছিল। আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে নূতন কিছু শুনতে পাব নিশ্চয়ই। শৈবধর্ম সম্বন্ধে যে সব কথা বাজারে চলতি আছে তারই পুনরুক্তি চলছিল। আপনি নতুন কিছু শোনান। নভোনীল অনেক কথা শোনালেন আমাদের। নভোনীলকে আপনি তো চেনেন, যুক্তির চেয়ে উপমার দিকে ওঁর প্রবণতা বেশী। মহর্ষি সাবর্ণির চিত্তবিনোদনের জন্য শৈবধর্ম নিয়ে যে আলোচনা করছিলেন, তাকে কাব্য বললে খুব অন্যায় হয়

না। মহর্ষি সাবর্ণি কোনও জবাব দেন নি। সম্ভবত মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে আছেন উনি। শৈব সাধুরা ও-রকম করেন মাঝে মাঝে। যাক, নগাধিরাজের দেবতাই সম্ভবত ওঁর মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছেন, তা না হ'লে আমরাও ওঁর কাছ থেকে কিছু পেতাম। আপনিও ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারেন। আমরা সবাই জানি, আপনি এককালে শৈবধর্ম নিয়ে খুব মেতেছিলেন, বড় বড় রাজসভাতে এ নিয়ে বক্তৃতা পর্যন্ত করেছেন, শৈবধর্ম সম্বন্ধে অনেক অভিনব তথ্যও নাকি আবিষ্কার করেছিলেন শুনেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর এই তিনজনই কি ভগবান? আমার তো ধারণা ভগবান একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অগ্নিদেব। আমারও তাই ধারণা। ভগবান এক, তাঁর বাপ-মা নেই, তিনি অজাত, তিনি মৃত্যুহীন, তিনি অনাদি অনন্ত, তাঁর থেকেই নিখিল বিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ওসব ছেলে-ভোলানো রূপকথা মাত্র।

সিন্ধুপতি। এ কথা আমরাও জানি অগ্নিদেব যে, আপনার ঈশ্বরই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু একটা কথা মনে হ'লে ঈশ্বরের উপর একটু অনুকম্পা হয়। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেকায়দায় থাকতে হয়েছিল। অনন্তকাল ধ'রে নিশ্চয় তাঁকে ইতস্তত করতে হয়েছিল, সৃষ্টি করবেন কি-না! নিশ্চয়ই মানবেন, এ অবস্থা সুখকর নয়। নির্গুণ থাকবার জন্য তাঁকে নির্বিকার থাকতে হয়েছিল, তার মানে নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হ'লে নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় থাকাও মুশকিল। তাই আপনারা বলছেন যে, তিনি অবশেষে সৃষ্টি করাই ঠিক করলেন। আপনার কথায় বিশ্বাস

করলাম অগ্নিদেব। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য নিজের নির্বিকারত্ব নষ্ট ক'রে সৃষ্টির জটিল ঝামেলায় মেতে উঠে ঈশ্বর খুব সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন ব'লে মনে করি না। সে যাই হোক, ভগবান কেমন ক'রে সৃষ্টি করলেন সেইটেই বলুন আমাদের, শোনা যাক।

অগ্নিদেব। যাঁরা নিজেরা হিন্দু নন—যেমন নভোনীল এবং হর্ষ-গম্ভীর—তাঁরাও জ্ঞান অর্জন করবার আগ্রহে হিন্দুধর্মের অনেক তথ্য জেনেছেন; তাঁরা জানেন ভগবান স্বয়ং কিছুই সৃষ্টি করেন নি, করেছিলেন অন্য আর একটা জিনিসের মাধ্যমে। তাকে জিনিস বা বস্তু বললে ঠিক তার স্বরূপ বোঝানো যায় না অবশ্য। কিন্তু তার মাধ্যমেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বস্তুত সে-ই সৃষ্টি করল, ঈশ্বর নয়। এই যে মাধ্যম—নানাধর্মে এর নানরকম নাম আছে।

হর্ষগম্ভীর। ঠিক বলেছেন। যবনরা একেই বোধ হয় হার্মিস, অ্যাপোলো, অ্যাডোনি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন—

অগ্নিদেব। আমি কিন্তু ভারতীয় আর্যবংশধর, আমি একে বলব—শূন্য। এই শূন্যই একদা স্পন্দিত হ'ল, সেই স্পন্দনই ক্রমশ রূপান্তরিত হ'ল সৃষ্টিতে। শূন্যের সেই স্পন্দনই সৃষ্টিকর্তা—হংসবাহন ব্রহ্মা, গরুড়বাহন বিষ্ণু বা ষণ্ডবাহন মহেশ্বর নন। ওসব স্বল্পবুদ্ধি কবিদের উদ্ভট কল্পনামাত্র। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে মূর্তিরূপে কল্পনাই করা হয় নি, হয়েছে সূর্যের জ্যোতিরূপে। বেদ বা ব্রাহ্মণসংহিতায় ব্রহ্মার উল্লেখই নেই, আছে হিরণ্যগর্ভের। মহাদেব তো স্বয়ম্ভু। বেদে রুদ্র আছে, মহাদেব নেই। কারও মতে রুদ্র অগ্নিরই অন্য নাম। মোট কথা, নানারকম অবিশ্বাস্য রূপকথা উপকথার সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরকে

নিয়ে। বুদ্ধি একটু কম না হ'লে ওসবে আস্থাস্থাপন করা কঠিন।

মহর্ষি সাবর্ণি বিবর্ণমুখে সব শুনিতেছিলেন, এই কথায় তাঁহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল, চক্ষুর দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন না।

অগ্নিদেব বলিয়া চলিলেন, "শূন্যের ওই স্পন্দনকে ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বর মনে করলেও ওঁদের কিছুতেই ঈশ্বর বলা চলবে না। কারণ শূন্যের ওই স্পন্দন ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের প্রেরণা মাত্র। সিন্ধুপতি, ঈশ্বরকে নিয়ে উপহাস ক'রো না। তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তিনি মুটে-মজুরের মতো মাটি কেটে বা হাতুড়ি চালিয়ে এই নিখিল বিশ্ব নির্মাণ করেন নি। তাঁর প্রেরণায় শূন্য স্পন্দিত হয়ে নিখিল বিশ্বরূপে আপনি বিকশিত হয়েছে, ফুল যেমন আপনি বিকশিত হয়। তাঁর প্রেরণায় স্পন্দিত শূন্যই স্রষ্টা, তাই সে বিশ্ব নিখুঁত হয় নি, তাই তা বদলাচ্ছে; কারণ ঈশ্বর নিজে তা সৃষ্টি করেন নি, করলে তা সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ত—ভাল-মন্দের এমন জগা-খিচুড়ি হ'ত না।

সিন্ধুপতি। আপনাদের মতে কি ভাল কি মন্দ সেইটে তা হ'লে বুঝিয়ে বলুন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর হর্ষগম্ভীরই প্রশ্নটির উত্তর দিবার প্রয়াস পাইলেন। টেবিলের উপর ধাতুনির্মিত একটি ক্ষুদ্র গর্দভের মূর্তি ছিল, আর তাহার পিঠের দুই দিকে ঝুলিতেছিল দুইটি ঝুড়ি। একটিতে ছিল কালো ফল, আর একটিতে সাদা।

হর্ষগম্ভীর গর্দভটিকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এটির দিকে চেয়ে দেখ। কালো সাদা দু রকম ফলই চমৎকার দেখাচ্ছে

আমাদের চোখে। কিন্তু এই ফলগুলির যদি ভাববার ক্ষমতা থাকত তা হ'লে সাদা ফলগুলি বলত, 'ফলের পক্ষে সাদা হওয়াটাই ভাল, কালো হওয়াটা মন্দ।' আর কালো ফলগুলিও ঘৃণা করত সাদা ফলগুলিকে। কিন্তু আমাদের চোখে দুইই ভাল। ভগবানের চোখেও তেমনি সব ভাল। আমরা ফলগুলিকে যেমন পক্ষপাত-শূন্য দৃষ্টিতে দেখছি, ভগবানও নিখিল বিশ্বকে ঠিক তেমনি ভাবে দেখছেন। আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আমরা সবটা দেখতে পাই না, তাই ভাল-মন্দের চূড়ান্ত বিচারও করতে পারি না। আমাদের চোখে মন্দটাই অনেক সময় ভাল ব'লে মনে হয়। কিন্তু যা কুৎসিত নিঃসন্দেহে তা কুৎসিত, তা সুন্দর নয়। সব সুন্দর হ'লে সুন্দর ব'লে কিছু থাকতও না। কারণ তুলনা ক'রেই আমরা সুন্দরকে সুন্দর বলতে পারি। আর সেই জন্যই বোধ হয় সৃষ্টিতে সুন্দরের চেয়ে অসুন্দরের প্রাধান্য এবং এক হিসেবে তা বোধ হয় ভালই।

শীলভদ্র। কিন্তু সমস্যাটা নীতির দিক দিয়ে বিচার করা উচিত। যা মন্দ, তা মন্দই। সে মন্দে অসীম সৃষ্টিকাব্যে হয়তো ছন্দপতন হয় না। কিন্তু মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনকাব্যে হয়। যে পাপী মন্দ আচরণ করে তার পদস্খলন হয়, এবং সেটা কাম্য নয়।

জীমূতবাহন। বাঃ, বেশ বলেছেন এটা। যুক্তিটা চমৎকার!

শীলভদ্র। এটাও অবশ্য মানতে হবে, এই সৃষ্টি এক মহাকবি রচিত বিয়োগান্ত নাটক। সেই মহাকবির নাম ঈশ্বর। তিনি তাঁর নাটকে প্রত্যেককে একটি ক'রে নির্দিষ্ট ভূমিকা দিয়েছেন। তিনি যদি তোমাকে ভিক্ষুক, রাজপুত্র বা খঞ্জ ক'রে সৃষ্টি ক'রে থাকেন,

তোমার কর্তব্য সেই ভূমিকাটির মর্যাদা রক্ষা করা। বস্তুত তা না ক'রেও বোধ হয় উপায় নেই, তোমার স্বাভাবিক প্রকৃতিই তোমাকে সেই দিকে নিয়ে যাবে, তোমার নীতিজ্ঞানও তদনুযায়ী হবে।

সিন্ধুপতি। তা হ'লে খঞ্জকে চিরকাল ন্যাংচাতে হবে, পাগল চিরকাল ঊনপঞ্চাশৎ পবনের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে থাকবে, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের আর সুচরিত্রা হবার উপায় থাকবে না, বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাতকই থাকতে হবে, প্রতারক ক্রমাগত মিথ্যাই বলবে, খুনী চিরকাল খুনই করবে। তারপর নাটক যখন শেষ হবে তখন সমস্ত অভিনেতা—রাজা প্রজা, ন্যায়বান অত্যাচারী, সতী অসতী, মহৎ ক্ষুদ্র, ভদ্র খুনী—সবাই কবির কাছ থেকে সমান প্রশংসা পাবে। এই কি আপনার বক্তব্য?

শীলভদ্র। সিন্ধুপতি, তুমি আমার বক্তব্যটাকে দুমড়ে মুচড়ে যা-তা ক'রে দিলে, সুশ্রী কুমারী রাক্ষসীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল যেন। তুমি এসব ব্যাপার কিছু বোঝ না। সৃষ্টি ঈশ্বর, ন্যা অন্যায়, নীতি দুর্নীতি—এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তোমার। থাকলে এসব বলতে না। তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে।

সিন্ধুপতি একটু স্মিত হাস্য করিলেন শুধু। কোনও প্রত্যুত্তর দিলেন না।

নভোনীল। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিন্তু ভাল-মন্দ উভয়েরই অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এও আমি বিশ্বাস করি, কোন মানুষই একটি মাত্র পথে চ'লে মুক্তি পেতে পারে না, তা সে পথ যত মহৎই হোক না কেন। মুক্তির সন্ধানে মন্দও প্রয়োজনীয় পাথেয়। পুরাণে এ নিয়ে অনেক গল্প আছে। রাবণ যদি সীতাকে

হরণ না করতেন তা হ'লে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেতেন না, অহল্যা যে মুহূর্তে পাপাচরণ ক'রে পাষাণী হলেন সেই মুহূর্তেই শ্রীরাম-চন্দ্রের উপর তাঁর একটা দাবি জন্মাল। সুতরাং পাপকে ঘৃণা করা বা পাপীকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা আমার মতে অর্থ-হীন। পাপই নানামূর্তিতে ভগবানকে আকর্ষণ করে। পাপ আছে ব'লেই ঈশ্বরের ত্রাতা নাম সার্থক। সুতরাং ভাল এবং মন্দ দুটোরই প্রয়োজন, তাই সংসারে দুটোরই অস্তিত্ব আছে।

অগ্নিদেব। ঠিকই বলেছ তুমি। মুক্তি-প্রাসাদের সব কটা ইঁটই ভাল নয়। মন্দও অনেক আছে। হয়তো বনিয়াদটাই মন্দ দিয়ে তৈরী, কে জানে!

নভোনীল। ভাল-মন্দর সঙ্গে কিন্তু সৎ-অসতের অনেক সময় গোলমাল হয়। যার অস্তিত্ব আছে তাই সৎ, যার নেই সেই অসৎ। এই সৎকেই নানা রূপে, নানা আলোতে, নানা দৃষ্টিতে দেখেছেন নানা যুগের ঋষিরা। মায়া এই সৎকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে ব'লে অনেকে মায়ার নিন্দা করেন, মায়াকে অসৎ বলেন। কিন্তু এ কথাও না মেনে উপায় নেই যে, সতের সঙ্গে মায়ারূপী অসৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এই মায়া নিয়ে নানা রূপক রচিত হয়েছে আমাদের কাব্যে পুরাণে। এই মায়াকে কখনও বলা হয়েছে বিষ, কখনও লোভ, কখনও কাম, কখনও দম্ভ, কখনও বা আর কিছু। আপনাদের অবশ্য অবিদিত নেই কিছু, আপনারা যদি অনুমতি দেন তা হ'লে বক্তব্যটা আর একটু বিশদ ক'রে বলি—

প্রায় সকলেই নভোনীলকে তাঁহার বক্তব্য বিশদতর করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠিক এই সময়ে বংশীধ্বনির তালে তালে

পা ফেলিয়া বারোজন সুন্দরী তরুণী ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিল। দেখা গেল, তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে এক-একটি সুচিত্রিত বৃহদাকার ঝাঁপি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ঝাঁপিতে রহিয়াছে বিবিধ প্রকার ফল। তাহারা টেবিলের উপর ফলগুলি সাজাইয়া দিয়া একে একে চলিয়া গেল। চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বংশীও নীরব হইল।

নভোনীল আরম্ভ করিলেন, "সমস্ত সৃষ্টিকে যদি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হ'লে পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের গল্পটা একটা অপরূপ দার্শনিক তত্ত্বের প্রতীক ব'লে মনে হবে। এই মায়াময় সৃষ্টি-সমুদ্রকে দেব-দানব মিলে চিরকালই মন্থন করছে। সে মন্থনে সহায়তা করছেন স্বয়ং কূর্মরূপী ভগবান, মন্থনরজ্জু হয়েছেন মহাতপস্বী বাসুকী। কিন্তু মন্থনদণ্ড হয়েছেন মন্দর পর্বত—একটা বিরাট বস্তুপিণ্ড, একে আমি তামসিকতার প্রতীক বলব। এই তামসিকতাকে কেন্দ্র ক'রেই দেব-দানবের সমুদ্রমন্থন চলছে চিরকাল। এ মন্থনে জ্ঞানীরাও যে চিরকাল সহায়তা করেছেন তার ইঙ্গিত রয়েছে তপস্বী বাসুকীর মন্থন-রজ্জু হওয়াতে। ভগবান লীলাময়, সব লীলাতেই তিনি থাকেন, কিন্তু এই তামসিকতার লীলায় তিনি কূর্মরূপ ধারণ করেছেন। মায়াময় বিষয়-সমুদ্র মন্থন ক'রে তাই উঠল—যা মানুষ চিরকাল চেয়েছে—অমৃত, ধন্বন্তরী, লক্ষ্মী, সুরা, চন্দ্র, রম্ভা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ, পারিজাত, সুরভি, ঐরাবত, শঙ্খ আর ধনু। এর প্রত্যেকটির গুণ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে বৈষয়িক জীবনে অর্থাৎ বস্তুর জগতে এসবের বেশী কাম্য মানুষের আর কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এ রূপকের নৈতিক মহত্ব তখনই

ভাবে প্রকটিত হ'ল যখন পুরাণকার দেখালেন যে, বিষয়-সমুদ্রকে বেশী মন্থন করলে শেষ পর্যন্ত বিষ ওঠে। বিষ উঠলও। আর সে বিষ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য তা পান ক'রে মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ। এইখানেই মহাদেবের মহত্ত্ব, মহাকালের চিরন্তন লীলা। এই বিষটাকেও আমি অসৎ মনে করি না, এও সৎ, কারণ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এক-মাত্র মহাদেবের মতো যোগীই এই বিষকে আত্মসাৎ করতে পারেন, তাই তিনি দেবাদিদেব, আর তাই সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ভাল-মন্দ দুইই ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। রামায়ণের স্বর্ণমৃগের কাহিনী, সীতাহরণ, অহল্যার ব্যভিচার প্রভৃতি এই সত্যেরই নানা রূপ। বিভিন্ন কবিরা আপন আপন কল্পনা অনুসারে যুগে যুগে নবরূপে সৃষ্টি করেছেন এই চিরন্তন সত্যকে।

হর্ষগম্ভীর। তারও পূর্বে যম-যমীর কাহিনীতেও হয়তো এরই ইঙ্গিত আছে। যা এখন আমরা অন্যায় ব'লে মনে করি, তা না করলে মনুষ্যজাতিই হয়তো অবলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু তবু এটা মানতেই হবে, ওসব আচরণ এখন আর সমর্থনযোগ্য নয়। যে অন্যায় মানুষ একদিন বাধ্য হয়ে বা মোহগ্রস্ত হয়ে করেছে সে অন্যায়কে সভ্যযুগে টেনে আনা অসঙ্গত।

নভোনীল। আমি কিন্তু মনে করি এই অন্যায় বা মন্দ বা পাপ —যে নামই দিন একে—এটা সত্যেরই একটা অঙ্গ, একটা অংশ। আমাদের বিচারে তা অন্যায় বা অসঙ্গত হ'লেও সৃষ্টি থেকে তা মুছে ফেলা যাবে না। অহল্যা সীতা মেনকা সূর্পণখা সবাই চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। রাম-রাবণ পরস্পরের পরিপূরক, ওরা চিরকাল জন্মাবে।

চিন্ময়। আমি কিন্তু জানতে চাইছি, এ যুগে কোথায় তারা জন্মেছে! বিশেষ ক'রে মেনকার খবরটা জানতে পারলে খুশী হতাম।

নভোনীল। তা জানতে হ'লে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা দরকার তা কবিদের সম্ভবত নেই। কবিরা জ্ঞানী নয়, তারা কারিকর। কথার বেসাতি করে তারা, তাদের হাব ভাব বুদ্ধি অনেকটা শিশুর মতো। কথায় কথা গেঁথে অলীক রূপকথা বুনে আর ছন্দের টুং টাং শুনে তারা মেতে থাকে, আর পাঁচজন শিশু-প্রকৃতির লোককেও মাতায়।

চিন্ময়। ঘরোয়া ভাবে যা বললেন, তা বাইরে বিদ্বৎসমাজে কখনও যেন উচ্চারণ করবেন না। করলে গাল খাবেন। এটা কি আপনার জানা নেই যে, পৃথিবীতে প্রথম মহাকাব্য উচ্চারিত হয়েছিল কবিতায়! আপনি যে সব উদাহরণ এখন দিলেন, তা মহাকবিদের কাব্য থেকে সঙ্কলন ক'রে দিলেন। একমাত্র কবিতাই মানুষের অন্তরতম সত্য প্রকাশ করতে পারে। কবিতা দেবতাদের প্রিয়, তাই সমস্ত দেবমন্ত্র কবিতায় রচিত। এ কথা সকলেই জানে যে, কবিরাই দ্রষ্টা, তাঁদের চোখে সবই রহস্যময় অথচ সবই সুস্পষ্ট। আমি কবি, আমি তাই জানি—এ যুগের মেনকা কোথায় আছেন। আপনাকে রহস্য ক'রে প্রশ্নটা করে-ছিলাম, খবরটা আমার জানা আছে। বেশী দূরে নয়, আপনার কাছেই আছেন তিনি। ওই দেখুন, নীল মখমল উপাধানে হেলান দিয়ে ব'সে আছেন সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মী, তাঁর চোখের কোণে টলমল করছে অশ্রু, অধরকোণে চুম্বন। ওই যে ব'সে আছেন তিনি। শুধু পাটলিপুত্রের নয়, শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত এশিয়ার গৌরব

উনি। একদা সুরসভাতলে যিনি নৃত্য করেছিলেন, বিশ্বামিত্রের যিনি তপোভঙ্গ করেছিলেন, এ যুগে তাঁর নাম নিরঞ্জনা—

রেবতী। ওমা, কি বলছেন আপনি! বিশ্বামিত্র ঋষি কি আজকের লোক! নিরঞ্জনা দেবি, সত্যি আপনি তাঁর তপোভঙ্গ ক'রে ছিলেন না কি? তাঁর কি দাড়ি ছিল?

চারুদত্ত। তাঁর দাড়ি ছিল কি না জানি না, কিন্তু এক রকম বুনো ঘোড়ার দাড়ি আছে জানি। বিশ্বামিত্র ঋষি ছিলেন, না, ঘোড়া ছিলেন—

"আমি আর বসতে পাচ্ছি না বাবা। শুলুম।" এই বলিয়া শুভদত্ত মাটিতে গড়াইয়া পড়িলেন।

চিন্ময় দাঁড়াইয়া সুরাপাত্রটি আস্ফালন করিতে করিতে বলিলেন, "সুরাপান করতে করতে যদি মৃত্যু হয় তবে তা সুখ-মৃত্যু হবে, তাতে কোনও গ্লানি থাকবে না।"

বৃদ্ধ জীমূতবাহন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বসিয়াই ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার কেশহীন প্রকাণ্ড মস্তকটি বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

শিখিকণ্ঠও আর নিজের দার্শনিকত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে নিরঞ্জনার নিকট আগাইয়া গেলেন এবং তাহার পাশে বসিয়া মৃদুগুঞ্জনে নিবেদন করিলেন, "নিরঞ্জনে, আমি দার্শনিক, আমার মোহমুক্ত থাকাই উচিত। কিন্তু তুমি আজ আমাকে মুগ্ধ করেছ, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি—"

নিরঞ্জনা। এতদিন বাসেন নি কেন?

শিখিকণ্ঠ। তাই মনে হচ্ছে উপবাস ক'রে আছি।

নিরঞ্জনা। আমিও আজ কিছু খাই নি, জল খেয়ে আছি কেবল। ভালবাসার কথা ভাল লাগছে না এখন, আমাকে ক্ষমা করুন।

শিখিকণ্ঠ আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া রেবতীর নিকট চলিয়া গেলেন। রেবতী দৃষ্টির ইঙ্গিতে তাঁহাকে ভূশায়ী শুভদত্তকে দেখাইয়া দিল। তাহাকে তুলিতে বলিল। শিখিকণ্ঠকে রেবতীর নিকট যাইতে দেখিয়া নভোনীল নিরঞ্জনার নিকট উঠিয়া গেলেন, কোন ভূমিকা না করিয়া বা অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, একেবারেই তাহার অধর চুম্বন করিয়া বসিলেন।

নিরঞ্জনা। আমি আপনাকে বেশী ধার্মিক মনে করেছিলাম।

নভোনীল। কোনও সঙ্কীর্ণ ধর্ম আমি মানি না, মানবধর্মের সম্পূর্ণতায় আমি সর্বদা পরিপূর্ণ।

নিরঞ্জনা। ও! নারী-সংসর্গে আপনার আত্মা কলুষিত হবে—এ ভয় বুঝি আপনার নেই?

নভোনীল। নারী-সংসর্গ দৈহিক ব্যাপার, ওর সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই।

নিরঞ্জনা। তা হ'লে আপনি আমার কাছ থেকে স'রে যান। যিনি আমাকে কায়মনোবাক্যে, সমস্ত দেহ দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে ভালবাসতে পারেন না, তাঁকে আমি প্রশ্রয় দিই না। দার্শনিকরা যে এত নির্বোধ—এ ধারণা আমার ছিল না।

ভোজনকক্ষের দীপগুলি একে একে নিবিয়া যাইতেছিল। ভোরের আলো ক্রমশ পরদাগুলির ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিয়া

অতিথিবর্গের জাগরণক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতাকে ধীরে ধীরে স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে লাগিল। মেঝের উপর শুভদত্তের পাশে চারুদত্তও পড়িয়া ছিল। নেশার ঘোরে সে ঘোড়ার স্বপ্ন দেখিতে-ছিল। নভোনীল রোহিণীকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া-ছিলেন। শিখিকণ্ঠ হাস্যোদ্বেলিতা রেবতীর দুগ্ধধবল গ্রীবার উপর বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিতবর্ণ সুরা ঢালিতেছিলেন। পদ্মরাগ-মণিসন্নিভ সুরাবিন্দুগুলি তাহার নগ্ন গ্রীবা ও স্তন বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। শিখিকণ্ঠ অধর বাড়াইয়া তাহাই পান করিতেছিলেন।

প্রবীণ শীলভদ্র সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং সিন্ধুপতির স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আপনি এখনও খাড়া আছেন দেখছি! চলুন, ওদিকে যাওয়া যাক।"

তাঁহারা ভোজনকক্ষের পশ্চাদ্দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শীলভদ্র। মনে হচ্ছে, আপনি ভাবছেন কিছু একটা। কি ভাবছেন ?

সিন্ধুপতি। বিশেষ কিছু নয়। মনে হচ্ছিল, এই রূপজীবাদের প্রণয়লীলা অনেকটা কার্তিক পূজোর মতো।

শীলভদ্র। তার মানে ?

সিন্ধুপতি। এরা প্রত্যেকেই কার্তিক পূজা করে জানেন বোধ হয়। কন্দর্পকান্তি কার্তিককে নানা বেশে সাজিয়ে ময়ূরের উপর চড়িয়ে খুব সমারোহ ক'রে পূজো করে তার। কিন্তু পূজো ওই একদিন। পরদিনই বিসর্জন। ওদের রূপও ওই রকম, প্রণয়ও ওই রকম, শুধু ক্ষণিকের খেলা।

শীলভদ্র। হোক না। সবই তো ক্ষণভঙ্গুর, সবই তো ছায়ার

মতো। আসক্তিটাই খারাপ। ওদের প্রতি আসক্ত হওয়াটাই ভুল।

সিন্ধুপতি। ওদের রূপটা যদি ছায়ার মতো হয়, কামনাটা তা হ'লে আলো। দুটোই ক্ষণিকের মায়া। তা হ'লে আসক্ত হবই না বা কেন? কামনাটা তো উড়িয়ে দিতে পারি না, সেটা থাকবেই। আলোর প্ররোচনায় ছায়ার পিছু পিছু ছুটলে তা হ'লে ক্ষতি কি?

শীলভদ্র। আপনার যুক্তি শুনে হাসি পাচ্ছে। বিশ্বাস করুন, একমাত্র নিরাসক্তিতেই পৌরুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত।

সিন্ধুপতি। যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ নিরাসক্ত হবে কেমন ক'রে?

শীলভদ্র। শুনুন তা হ'লে বলি। বললেই বুঝবেন শীলভদ্র কি ক'রে নিরাসক্ত থাকতে পেরেছে।

শীলভদ্র একটি মর্মর স্তম্ভে হেলান দিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। উষার অরুণভাতি তাঁহার ললাট স্পর্শ করিল, তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য হর্ষগম্ভীর এবং অগ্নিদেবও তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাঁহারা সুরাপ্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে অসংলগ্নভাবে উন্মত্তবৎ চীৎকার বা হাস্য করিলেন, কিন্তু তাহা শীলভদ্রের গম্ভীর ভাষণকে ব্যাহত করিতে পারিল না। তাহা এমন সুষ্ঠু, এমন চমকার হইল যে অগ্নিদেব বলিলেন, "সত্যিই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করবার যোগ্যতা হয়েছে আপনার।"

হর্ষগম্ভীর মন্তব্য করিলেন, "জ্ঞানীদের হৃদয়েই তো ভগবান থাকেন।"

তাঁহার পর তাঁহারা মৃত্যু বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। শীলভদ্র যেন এই আলোচনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন, "মৃত্যু যখন আমার কাছে আসবে তখন সে যেন আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে না পায়, সে যেন দেখে আমি আত্মসংশোধনে এবং কর্তব্যকর্মে নিরত আছি। বলিষ্ঠ দু হাত আকাশের দিকে তুলে আমি যেন বলতে পারি—ভগবান, তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরে নিজেকে যেরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলে আমি তার অমর্যাদা করি নি। আমার জীবনের অক্লান্ত সাধনা মালার মতো গেঁথে গেঁথে পরিয়ে দিয়েছি তোমার গলায়, অঞ্জলির মতো সমর্পণ করেছি তোমার চরণে। তোমার অমোঘ বিধান বর্ণে বর্ণে পালন ক'রে আমার জীবন সার্থক হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে। যথেষ্ট বেঁচেছি—"

দুই হাত তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। দিব্য প্রভায় তাঁহার মুখমণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর নিজেকে সম্বোধন করিয়া সহর্ষে তিনি বলিলেন, "জীবনের মায়া এবার কাটাও শীলভদ্র। যে বৃক্ষ তোমাকে লালন করেছিল, যে ধরণী তোমাকে ধারণ করেছিল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পক্ক ফলের মতো এবার খ'সে পড় জীবনের বৃন্ত থেকে। এবার বিদায় নাও।"

এই বলিয়া সহসা তিনি নিজের পরিচ্ছদের ভিতর হইতে একটি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া নিজের বক্ষে তাহা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। সিন্ধুপতি, হর্ষগম্ভীর এবং অগ্নিদেব তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া যখন তাঁহাকে ধরিলেন, তখন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

নারীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। সুরাঘোরে আচ্ছন্ন অতিথিগণ বিঘ্নিত-তন্দ্র হইয়া অসম্বদ্ধ ভাষায় অস্ফুট আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, প্রভাত-বায়ুতে দোদুল্যমান পরদাগুলির ছায়াসমূহ হইতেও যেন মৃদু দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল। হর্ষগম্ভীর এবং সিন্ধুপতি ধরাধরি করিয়া বিবর্ণ শীলভদ্রকে একটি শয্যায় শায়িত করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ জীমূতবাহনের তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল, তিনি সৈনিক-সুলভ তৎপরতার সহিত শীলভদ্রের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন, "চিকিৎসক সুরসেনকে অবিলম্বে ডেকে আন।"

সিন্ধুপতি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমরা যে ভাবে প্রণয় কামনা করি, উনি ঠিক সেই ভাবেই মৃত্যু কামনা করেছেন। আমাদের সকলেরই মতো নিজের কামনারই তৃপ্তি সাধন করেছেন উনি। ওঁর কামনা পূর্ণ হয়েছে, এখন উনি কামনাহীন দেবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন।"

জীমূতবাহন ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ছি ছি, এত জিনিস থাকতে মৃত্যু কামনা করলেন উনি! বেঁচে থাকলে এখনও কত কাজ করতে পারতেন! কি দুর্দৈব!"

মহর্ষি সাবর্ণি এবং নিরঞ্জনা নিস্পন্দভাবে পাশাপাশি বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই হৃদয় ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহারা আশার আলোকও দেখিতে পাইলেন—পলায়নের এই তো সুযোগ।

সহসা সাবর্ণি নিরঞ্জনার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর যাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিল তাহাদের ডিঙাইয়া, যাহারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া ছিল তাহাদের এড়াইয়া তিনি

নিরঞ্জনাকে সেই শোণিত-সুরাপিচ্ছিল পরিবেশ হইতে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন।

পাটলিপুত্রে তখন প্রভাত হইতেছিল। মনে হইতেছিল, পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত হর্ম্যশ্রেণীর চূড়াগুলি আকাশের আলো-আঁধারিতে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। পথের দু ধারে যদিও উচ্ছিষ্ট মাটির বাসন, শালপাতা, ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ রোমহীন দুই-একটি কুকুর প্রভাতের সৌন্দর্যের সহিত ঠিক খাপ খাইতেছিল না, তথাপি কিন্তু প্রভাতের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মহর্ষি সাবর্ণি প্রথমেই সিন্ধুপতির দেওয়া মূল্যবান পরিচ্ছদটি অঙ্গ হইতে খুলিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিলেন এবং পদতলে তাহা দলিত করিতে লাগিলেন।

তাহার পর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ওদের কথা তো শুনলে! কি না বললে ওরা! মদের চাটের সঙ্গে সৃষ্টিমাহাত্ম্যকে পর্যন্ত ওরা চিবিয়ে দিলে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর দানব-মানব দেব-দেবী সীতা-অহল্যা রাম-রাবণ—সকলকে এক ঢেঁকিতে ফেলে কি জঘন্যভাবে কুটলে ওরা বল তো? তোমার সঙ্গে তুলনা দিলে মেনকার! ছি ছি ছি ছি! ওর মধ্যে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর লোক ওই অগ্নিদেব। সবজান্তা নাস্তিক লোক। উনি শাক্ত-বৈষ্ণব শৈব-গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম চেখে চেখে এখন হয়েছেন শূন্যবাদী। ও শব্দটির অর্থ কি জান? মিথ্যাবাদী। বাকী দার্শনিকগুলোর কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক। সকলের সামনেই তোমার দিকে লুব্ধ বাহু বাড়াতে সাহস করলে ওরা। তুমি যখন তাড়িয়ে দিলে তখন বেশ সপ্রতিভ ভাবে চ'লে গেল আর এক দলের কাছে। তার পর

আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে কি ভাবে মাটিতে লুটোতে লাগল তা তো নিজের চোখেই দেখলে নিজেদেরই বমিতে লিপ্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ক্রীতদাসীদের পদপ্রান্তে। পশু—পশু—পশু সব। ওই যে পাগল বুড়োটা নাটকীয় ভঙ্গীতে আত্মহত্যা ক'রে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ক'রে বসল, ওর কি কখনও মুক্তি হবে ভেবেছ? আত্মঘাতীর কখনও মুক্তি হতে পারে? তোমার চোখের সামনেই যে এসব ঘটল, এঁর জন্য শঙ্করকে কোটি কোটি প্রণাম জানাচ্ছি। তিনিই ঘটালেন এসব তোমার চোখ ফোটাবার জন্যে। তুমি নিজেই আজ মর্মে মর্মে অনুভব করলে, কি জঘন্য বীভৎস ভয়ঙ্কর পরিবেশে এত কাল তোমার জীবন কেটেছে। নিরঞ্জনা, নিরঞ্জনা, বল, তুমি নিজেই বল, তুমি কি ওদের মতো হতে চাও? ওদের কদর্য ইঙ্গিত, কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গী, অশ্লীল ভাষণের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওই সব নারীরূপী বানরীদের সাহচর্যে তুমি থাকতে পারবে কি আর? বল, তুমি কি ওদের মতো হতে চাও? উত্তর দাও—"

নিরঞ্জনার সমস্ত অন্তরও গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পুরুষদের প্রেমহীন বর্বরতা, নারীদের অশোভন আচরণ সত্যই তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। রাত্রিজাগরণের ক্লান্তিতেও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল সে।

সে উত্তর দিল, "প্রভু, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। আমার মাথা ঘুরছে, কপালের শিরগুলো দপ দপ করছে, সমস্ত শরীর অবসন্ন। মনে হচ্ছে, কেউ যদি আমাকে এখন অমৃতও এনে দেয়, হাত তুলে আমি তা নিতে পারব না। বিশ্রাম ছাড়া এখন আমার আর কিছু কাম্য নেই। কিন্তু কোথায় কেমন ক'রে তা পাব?"

"ভয় পেয়ো না বোন, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্রামের সময় আসছে তোমার এবার। তোমার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত মলিনতাও এবার ধুয়ে যাবে। শুভ্র মেঘের মতো নির্মল হবে তুমি। কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে চল।"

ক্রমশ মহর্ষি সাবর্ণি নিরঞ্জনার গৃহের সমীপবর্তী হইলেন। দেখিতে পাইলেন,শিলা-নিবাসের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষচূড়াগুলি শিশিরস্নাত হইয়া প্রভাতের মৃদু কিরণে কম্পিত হইতেছে। মর্মরমূর্তি-পরিবেষ্টিত একটি প্রাঙ্গণে কয়েকটি শিলাসন ছিল, নিরঞ্জনা তাহারই একটিতে বসিয়া পড়িল, সাবর্ণির দিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে তা হ'লে কি করতে হবে বলুন।"

সাবর্ণি উত্তর দিলেন, "তোমাকে যিনি খুঁজতে এসেছেন তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। যারা সুরা প্রস্তুত করে তারা যেমন প'চে যাবার আগেই আঙুরগুলি লতা থেকে তুলে নেয়, তিনিও তেমনি ভাবে তোমাকে সরিয়ে নিচ্ছেন সংসার থেকে। এখনই এখান থেকে আমরা চ'লে যেতে চাই। এখনই যদি সোজা আমরা পশ্চিম দিকে বেরিয়ে পড়ি তা হ'লে সন্ধ্যার কিছু পরে শিবানী-আশ্রমে পৌঁছব। সেখানে কেবল শিবের উপাসিকারা থাকেন। অনেক তপস্বী আছেন সে আশ্রমে। আশ্রমের নিয়মগুলি এত সুন্দর, জ্ঞান ও ভক্তির এমন অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে সেগুলিতে যে, মনে হয় যদি কোনও ছান্দসিক গায়ক ওগুলি সঙ্গীতে গেঁথে বীণা-তম্বুরা সহযোগে গান করেন তা হ'লে ধর্মকাব্য হিসাবে রসিক সমাজে তা চিরকাল আদর পাবে। যে সব তপস্বিনী সেখানে থাকেন, তাঁরাও দেবী-স্বরূপিণী। ধরণীর মৃত্তিকার উপর তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন বটে, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ স্বর্গের দিকে।

মর্ত্যলোকেই দেবলোক সৃষ্টি করেছেন তাঁরা ; মনে হয় তাঁরা মানবী নন, দেবকন্যা। মহাভিক্ষুক শিবের প্রসাদ লাভ করবার জন্মে তাঁরা সকলেই ভিখারিণী হয়েছেন, কেউ উমার মতো, কেউ বা সতীর মতো শিবের তপস্যা করছেন। শুনেছি স্বয়ং শিবও নাকি মাঝে মাঝে নানা বেশে দেখা দেন তাঁদের, উমার কাছে যেমন এসেছিলেন বৃদ্ধের রূপে, অর্জুনের কাছে কিরাতবেশে। এই শিবানী-আশ্রমেই তোমাকে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়ে ওঁদের সাহচর্য লাভ ক'রে নিজেই তুমি বুঝবে কি পবিত্র স্থানে তুমি এসেছ। তাঁরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন, তুমি গেলেই ভগ্নীর মতো সস্নেহে সাদরে তোমাকে সম্বর্ধনা করবেন তাঁরা। আশ্রমজননী শুভ্রধারা নিজে আশ্রমদ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার ললাট চুম্বন ক'রে বলবেন, "কন্যা, স্বাগত।"

নিরঞ্জনা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "শুভ্রধারা! রাজকন্যা শুভ্রধারা!"

"হ্যাঁ, তিনিই। বিলাসবেশ পরিত্যাগ ক'রে তিনি গৈরিক ধারণ করেছেন বহুকাল পূর্বে। যিনি বহু লোকের উপর কর্তৃত্ব করতে পারতেন, একজনের সেবিকা হয়ে তিনি ধন্য মনে করেছেন নিজেকে।"

নিরঞ্জনার হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইল। সে সাগ্রহে বলিল, "আমাকে নিয়ে চলুন তাঁর কাছে।"

তাঁহার অভিযান সফল হইয়াছে দেখিয়া মহর্ষি সাবর্ণ হৃষ্ট হইলেন। নিজের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টতর করিয়া বলিলেন, "সেখানেই তো নিয়ে যাব তোমাকে। নিয়ে গিয়ে প্রথমে পৃথক একটি ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করব তোমার। প্রথমে তোমাকে কিছুদিন

অনুতাপ করতে হবে। নির্জন ঘরটিতে ব'সে বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতাপ করবে তুমি। নিষ্পাপ না হওয়া পর্যন্ত শিবানী-আশ্রমের উপাসিকাদের সঙ্গে মেশাটা সমীচীন হবে না তোমার পক্ষে। তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে গেলে তখন তুমি মিশবে। তোমাকে একটি ঘরে পুরে স্বহস্তে তাতে তালা লাগিয়ে দেব। ভয় পেয়ো না, তোমার এ বন্দিত্ব মুক্তিরই সূচনা। যে মুহূর্তে তুমি যোগ্যতা অর্জন করবে সেই মুহূর্তে স্বয়ং শিব এসে তোমার দ্বার উন্মোচন ক'রে দেবেন। আমার কথা অবিশ্বাস ক'রো না, সত্যিই তিনি আসবেন। যখন আসবেন তখন নিজেই তুমি বুঝতে পারবে, তোমার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আনন্দ-শিহরণ জাগবে, মনে হবে যেন অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হয়েছ—"

নিরঞ্জনা পুনরায় বলিল, "শুভ্রধারার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।"

সাবর্ণি পুলকচিত্তে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। যে পার্থিব সৌন্দর্যকে তিনি এতকাল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই পার্থিব সৌন্দর্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। চক্ষু দিয়া তাঁহার অন্তর যেন আলোকধারা পান করিতে লাগিল, কোথাকার অজানা সমীরণ তাঁহার তপ্ত ললাট স্নেহভরে স্পর্শ করিয়া গেল। সহসা প্রাঙ্গণের এক কোণে শিলা-নিবাসের প্রবেশপথটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। করিবামাত্র তাঁহার মনে পড়িল, সমীরণ-কম্পিত যে তরুশীর্ষগুলিকে তিনি এতক্ষণ সানন্দে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন সেগুলি এতকাল এই রূপজীবার পাপ-নিবাসকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাও মনে হইল, যে প্রভাত-সমীরণকে এখন এত পবিত্র মনে হইতেছে, তাহা বহু ব্যভিচারী

লম্পটের নিশ্বাসবায়ুতে দূষিত। এসব মনে হওয়াতে তাঁহার অন্তর দুঃখে বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এত কষ্ট হইল যে, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার গণ্ড বাহিয়া তপ্ত অশ্রুধারা টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তিনি বলিলেন, "নিরঞ্জনা, আমরা কোন দিকে না চেয়ে এখনই এখান থেকে পালাই চল। কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে। যে সব উপকরণ, বিলাসের যে দ্রব্যসম্ভার তোমার কলুষিত অতীত জীবনের সাক্ষী হয়ে আছে, যে সব জিনিস তোমাকে এতকাল মিথ্যা মোহবন্ধনে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিল—ওই পরদা, ওই বিছানা, ওই ফুলদানি, ধূপদানি, ওই দীপাধার, ওই সব পরিচ্ছদ, তুমি চ'লে গেলেও তারা তো তোমার কুকীর্তি ঘোষণা করতে থাকবে। এই অশুচি জিনিসগুলোকে নিয়ে যাওয়াও চলবে না। ওদের মধ্যে পাপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, ওদের সংসর্গ করলেই প্রচ্ছন্ন পাপ আবার প্রকট হয়ে উঠবে, নানা ইঙ্গিতে কথা কইবে, দুর্নিবার আকর্ষণে আবার টানবে তোমাকে। ওদের অস্তিত্ব লোপ করতে হবে। যা যা তোমার অতীত জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ছিল, সব ধ্বংস ক'রে ফেল। দেরি ক'রো না, এই সুযোগ। শহরের লোকেরা এখনও জাগে নি, সবাই ঘুমুচ্ছে। তোমার ক্রীতদাসদের আদেশ দাও, এই প্রাঙ্গণের মাঝখানে তারা কাঠ স্তূপীকৃত করুক, তাতে আগুন দিয়ে, এস, তোমার অতীত জীবনের পাপের প্রতীকগুলোকে অগ্নিমুখে সমর্পণ করি। ভস্মীভূত হয়ে যাক তারা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।"

নিরঞ্জনা সম্মত হইল।

বলিল, "আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন। আপনি ঠিকই বলেছেন,

অশরীরী প্রেতাত্মারা অনেক সময় প্রাণহীন জিনিসকে আশ্রয় ক'রে থাকে। আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। গভীর রাত্রে এক-একটা জিনিস যেন নানা কৌশলে কথা বলে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর টক টক ক'রে শব্দ হয় কোনটা থেকে, কোনটা থেকে মনে হয় যেন আলোর ঝিলিক বেরুচ্ছে। শিলা-নিবাসে ঢোকবার মুখেই একটি নারীর মর্মরমূর্তি আছে। দেখেছেন নিশ্চয়, সে যেন স্নান করতে যাবার আগে কাপড় ছাড়ছে। একদিন আমি স্বচক্ষে দেখেছি, জীবন্ত মানুষের মতো সে যেন ঘাড় ফেরাল। আমার এত ভয় হয়েছিল কি বলব! এ কথা সিন্ধুপতিকে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই বিশ্বাস করেন না, আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেন। আমার বিশ্বাস ওই মর্মরমূর্তিটার প্রাণ আছে। একবার এক মস্ত ধনী যুবক আমার কাছে এসেছিলেন। আমাকে দেখে নয়, ওই মর্মরমূর্তিটি দেখে তিনি কামোন্মত্ত হয়ে উঠলেন। সে কি কাণ্ড! ঠিকই বলেছেন আপনি, একটা অদৃশ্য যাদুলোক ঘিরে আছে আমাকে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, প্রাণহীন মূর্তিকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে কত লোক প্রাণ দিয়েছে। তবে এতগুলো দামী জিনিস একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলবেন? ওগুলো বড় বড় শিল্পীদের প্রতিভার নিদর্শন। ও রকম পরদা আর সৃষ্টি হবে না। ওগুলো যদি পুড়িয়ে দেন অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। কয়েকটা পরদায় অদ্ভুত রঙের উপর যে সূক্ষ্ম জরির কাজ আছে তা সত্যিই অতুলনীয়। যাঁরা আমাকে ওগুলো উপহার দিয়েছিলেন, অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল তাঁদের। অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এজন্য। আমার কাছে এমন সব পান-পাত্র, মূর্তি আর ছবি আছে যা দুষ্প্রাপ্য। বহু অর্থব্যয় করলেও যা আর পাওয়া যাবে না। ওগুলো এমন ভাবে নষ্ট করবার

প্রয়োজন কি? কোনও প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিলেও তো হয়। কিন্তু আপনিই ভাল জানেন—কি উচিত, কি অনুচিত। আপনি যা করতে চান তাই করুন। আমি আপত্তি করব না।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনা সাবর্ণির পিছু পিছু শিলা-নিবাসে প্রবেশ করিল।

ঘরের দেওয়ালে বহুরকম মুকুট, মাল্য এবং চিত্র বিলম্বিত ছিল। ঘরে ঢুকিয়া নিরঞ্জনা দ্বারপালকে আদেশ করিল সমস্ত ক্রীতদাসদের ডাকিয়া আনিতে। তাহারা যখন আসিতে লাগিল তখন সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন যে, নিরঞ্জনার ক্রীতদাসরাও অসাধারণ। প্রথমেই আসিল চারিজন পীতকায় চীনা সূপকার, তাহারা প্রত্যেকেই একচক্ষু। একই জাতের চারিটি একচক্ষু ক্রীতদাস সংগ্রহ করা সহজ নহে, প্রচুর অর্থসাপেক্ষও বটে। ইহাদের দেখিয়া নিরঞ্জনার অতিথিরা যথেষ্ট আমোদ পাইতেন। কি করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া চক্ষু নষ্ট হইল সে কাহিনী নিরঞ্জনার আদেশে তাহারা অতিথিদের শুনাইত। তাহাদের পরে একে একে আসিল ঘোড়ার সহিসেরা, শিকারীরা, পাল্কী-বাহকেরা, দুইজন লোমশ মালী ও ছয়জন ভীষণদর্শন কাফ্রী। তিনজন গ্রীসদেশীয় যবন ক্রীতদাস তাহার পরে আসিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল বৈয়াকরণিক, একজন কবি এবং একজন গায়ক। তাহারা প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ছুটিয়া আসিল কয়েকজন ঘূর্ণিতলোচনা, বিকটবদনা, অদ্ভুতদর্শন কাফ্রী রমণী। তাহাদের পিছু পিছু ধীর মন্থরগমনে বেশবাস সম্বরণ করিতে করিতে ছয়জন শ্বেতকায়

রূপসী ক্রীতদাসীও সর্বশেষে আসিল। সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের পায়ে পাতলা স্বর্ণ-শৃঙ্খল রহিয়াছে। প্রত্যেকের মুখভাবও অপ্রসন্ন। সকলে সমবেত হইলে নিরঞ্জনা মহর্ষি সাবর্ণিকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি যা করতে বলেন তাই কর তোমরা। ইনি সিদ্ধপুরুষ, এঁর আদেশ অমান্য করলে মৃত্যু হবে।"

তাহাদের ভয় দেখাইবার জন্যই যে নিরঞ্জনা এ কথা বলিল তাহা নয়, সে নিজেও ইহা বিশ্বাস করিত। সে শুনিয়াছিল হিমালয়বাসী শৈব সাধুরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁহারা কাহাকেও যদি দণ্ড দ্বারা আঘাত করেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া ধূম নির্গত হয় এবং আহত ব্যক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

মহর্ষি সাবর্ণি ক্রীতদাসীদের বিদায় করিয়া দিলেন। যবন ক্রীতদাস তিনটিকেও তিনি চলিয়া যাইতে বলিলেন, কারণ তাহাদের চেহারাও কমনীয়, অনেকটা নারীর মতো। অবশিষ্ট ক্রীতদাসদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "এই উঠানের মাঝখানে অনেক কাঠ এনে জমা কর। তারপর তাতে আগুন দাও। বিরাট একটা চিতার মতো প্রস্তুত কর। চিতার আগুন যখন বেশ জ্ব'লে উঠবে তখন সেই লেলিহান শিখায় এ বাড়ির সমস্ত বিলাসসামগ্রী এনে এনে ফেল। বাড়ির বাইরে চারিদিকে যা যা আছে তাও আন। সমস্ত পুড়িয়ে ফেল।"

আদেশ শুনিয়া ক্রীতদাসেরা ঘাবড়াইয়া গেল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল সকলে। আড়চোখে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে নিরঞ্জনার দিকে চাহিয়া দেখিল। নিরঞ্জনাকেও নীরব নিস্পন্দ দেখিয়া তাহারা পরস্পরের আরও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহাদের সন্দেহ হইতে লাগিল, ব্যাপারটা হয়তো রসিকতা।

"যা বললাম তা কর।"—মহর্ষি পুনরায় আদেশ দিলেন।

ক্রীতদাসরা যখন হৃদয়ঙ্গম করিল যে ব্যাপারটা রসিকতা নহে, তখন তাহারা তৎপর হইয়া উঠিল। অনেকে মনে মনে খুশীও হইল। যাহারা দরিদ্র তাহারা সাধারণত ধনীর ঐশ্বর্যকে সুচক্ষে দেখে না, সে ঐশ্বর্যকে ধ্বংস বা লুণ্ঠন করিতে পারিলে তাহারা আনন্দিত হয়। ক্রীতদাসদের মধ্যে অনেকেই সাগ্রহে এবং সানন্দে চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

মহর্ষি সাবর্ণি নিরঞ্জনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার এক-একবার মনে হচ্ছিল, তোমার এই সব মহার্ঘ বিলাস-উপকরণ, স্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তা প্রভৃতি ঐশ্বর্য কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে দান ক'রে দিই। মনে হচ্ছিল, যা একদিন ঘৃণ্যতম পাপের সহায়ক হয়েছে তা পুণ্যকর্মে উৎসর্গিত হোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, আমার এ চিন্তা নিতান্ত বৈষয়িক চিন্তা, ঈশ্বরের প্রেরণা এর উৎস নয়। তা ছাড়া কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে এসব জিনিস দান করা সে প্রতিষ্ঠানকে, সে প্রতিষ্ঠানের মহত্ত্বকে অপমান করা। তুমি যে সব জিনিস ব্যবহার করেছ, এমন কি যা তুমি স্পর্শও করেছ সে সবের একমাত্র সদ্‌গতি হচ্ছে অগ্নি। সমস্ত পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার যে সব ওড়না, যে সব শাড়ি, যে সব অলঙ্কার অসংখ্য প্রণয়ীর অসংখ্য চুম্বনে কলঙ্কিত হয়েছে, লেলিহান অগ্নিশিখার স্পর্শে তারা পবিত্র হোক। এর মধ্যে করুণাময় শঙ্করের অমোঘ বিধান যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। ক্রীতদাসরা দেরি করছে কেন? সব শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে পড়তে চাই।

তুমিও ভিতরে গিয়ে তোমার শাড়ি, ওড়না, গয়না, ফুলের মালা ছেড়ে তোমার দাসীদের মধ্যে যে সব চেয়ে গরীব তার কাছ থেকে একটা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে সেইটে পরো। কারণ যে দেবতার কৃপালাভ করবার জন্য তুমি যাচ্ছ, তিনি নিজেই ভিখারী, দিগম্বর। সমস্ত ত্যাগ ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে।"

নিরঞ্জনা আপত্তি করিল না, ভিতরে চলিয়া গেল। ক্রীতদাসগণ প্রাঙ্গণে কাষ্ঠের স্তূপ সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতেছিল; অগ্নি যেই ধরিয়া উঠিল অমনি তাহারা গৃহসজ্জার মহার্ঘ উপকরণগুলি বাহির করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হস্তীদন্তের, মেহগিনির, চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্যখচিত পেটিকাগুলির ভিতর হইতে কত যে মূল্যবান রত্নখচিত মুকুট হার কঙ্কণ অঙ্গুরীয় বাহির হইল তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সমস্তই একে একে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইল। কুণ্ডলায়িত কৃষ্ণ ধূমরাশি ধীরে ধীরে বিরাট স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়া আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল। তাহার পর ভীষণ একটা শব্দ হইল, মনে হইল একটা দানব যেন সহসা গর্জন করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই অগ্নিদেব রুদ্রমূর্তিতে প্রকটিত হইলেন, দৃশ্য এবং অদৃশ্য শিখা লকলক করিয়া উঠিল, নিরঞ্জনার অলঙ্কারগুলিকে তিনি যেন গ্রাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রীতদাসগণের উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল। তাহারা দ্বারে দ্বারে দোদুল্যমান স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত পরদাগুলিও টানিয়া টানিয়া আনিয়া আগুনের ভিতর ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। ভারী টেবিল, সোফা, বিছানা ও খাটের গুরুভারে তাহাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের উৎসাহ কমিল না।

তিনজন বলিষ্ঠ কাফ্রী বহুবর্ণবিচিত্র অপ্সরী-মূর্তিগুলি দুই হাতে জাপটাইয়া তুলিয়া আনিতেছিল, তাহার মধ্যে স্নানোদ্যতা সেই অপ্সরীটিও ছিল যাহার প্রেমে পড়িয়া একজন ধনীপুত্র পাগল হইয়া গিয়াছিল। প্রজ্বলিত অগ্নির আলোকে মনে হইতেছিল তিনটি দৈত্য বুঝি নারীহরণ করিতেছে। মর্মর মূর্তিগুলি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া যখন টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া গেল, তখন মহর্ষি সাবর্ণি যেন একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন।

ঠিক এই সময়ে নিরঞ্জনাও বাহির হইয়া আসিল। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি, তাহার নগ্নপদ, অতি সাধারণ বস্ত্রাবৃত তাহার অনুপম দেহলাবণ্য তাহাকে যেন নূতন মহিমা দান করিয়াছিল, মনে হইতেছিল, মূর্তিমতী কামনা যেন সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিয়াছে। বাগানের মালীটিও তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার শ্মশ্রুরাজির মধ্যে সে হস্তিদন্তনির্মিত কামদেবের একটি মূর্তি লুকাইয়া আনিয়াছিল। নিরঞ্জনা ইঙ্গিতে তাহাকে থামিতে বলিয়া মহর্ষি সাবর্ণির দিকে আগাইয়া গেল। ক্ষুদ্র মূর্তিটি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল, "এটিকেও কি আগুনে ফেলে দিতে বলেন? এ মূর্তিটি অতি প্রাচীন, শিল্পের অতি অদ্ভুত নিদর্শন। কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও এটিকে আর পাওয়া যাবে না। নষ্ট হয়ে গেলে চিরকালের মতো চ'লে যাবে এটি। এখন পৃথিবীতে এমন কোন শিল্পী নেই যিনি ঠিক এর মতো আর একটি কামদেব নির্মাণ করতে পারেন। আর একটি কথাও আপনাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। কামদেব প্রেমের দেবতা, তাঁকে এমন নিষ্ঠুরভাবে অপমান করা কি উচিত হবে? প্রেমই কি পৃথিবীতে

শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়? আমি জীবনে যদি কোন পাপ ক'রে থাকি তা প্রেমের পথে না গিয়েই করেছি, এঁর প্ররোচনায় নয়—এর নির্দেশ লঙ্ঘন ক'রেই করেছি। এঁর নির্দেশে যা করেছি তার জন্য আমি একটুও অনুতাপ করি না, যা করি নি তার জন্যই আমি অনুতপ্ত। ইনি প্রেমের পায়েই আত্মসমর্পণ করতে বলেন, পশুর পায়ে নয়। সর্বধর্মের ইনিই প্রধান দেবতা, তাই ইনি পূজনীয়। আপনি ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন, এই ক্ষুদ্র মূর্তিটির গঠননৈপুণ্য কি অপূর্ব! মনে হচ্ছে মালীর দাড়ির ঝোপে একটি জীবন্ত শিশু যেন লুকিয়ে আছে। সিন্ধুপতি যখন আমার প্রণয়ী ছিল তখন এটি আমাকে উপহার দিয়েছিল, বলেছিল, 'এ আমার কথা তোমাকে মনে করিয়ে দেবে।' কিন্তু কামদেব তার কথা আমাকে একদিনও মনে করিয়ে দেয় নি, দিয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থের একটি যুবকের কথা, যাকে সত্যিই আমি ভালবেসেছিলাম। সবই তো পুড়িয়ে দিলেন আপনি, এটিকে পোড়াবেন না। এটিকে বরং কোন মন্দিরে দান ক'রে দিন। যে একে দেখবে সেই মুগ্ধ হবে, তারই মন পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রেমই তো ঈশ্বর—"

মালীটি ভাবিল, কামদেব বুঝি রক্ষা পাইলেন। সে মূর্তিটিকে স্নেহভরে আদর করিতে লাগিল। সহসা সাবর্ণি তাহার হাত হইতে মূর্তিটি কাড়িয়া লইয়া সজোরে তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সিন্ধুপতি যখন ও মূর্তিকে স্পর্শ করেছে তখন ও অশুচি হয়ে গেছে। কোনও মন্দিরে স্থান পাবার যোগ্যতা ওর নেই—"

তাহার পর তিনি পাগলের মতো ওড়না, আয়না, চিরুনি

সেতার, এস্রাজ, বীণা, বাঁশী, প্রদীপ, স্বর্ণ-পাদুকা যাহা যাহা কাছে পাইলেন স্বহস্তে সব ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাবণের চিতাও বোধ হয় এমন ভাবে জ্বলে নাই। ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত হইয়া ক্রীতদাসেরা উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ধূমে, স্ফুলিঙ্গে, চীৎকারে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নিদারুণ শব্দে ঘুমন্ত প্রতিবেশীদের ক্রমশ ঘুম ভাঙিতে লাগিল। তাঁহারা বাতায়ন খুলিলেন এবং চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তাহার পর কোথায় আগুন লাগিয়াছে জানিবার জন্য হন্তদন্ত হইয়া সকলে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। অনেকে ইহা পর্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না যে, তাঁহাদের পরিচ্ছদ অসম্পূর্ণ বা বিস্রস্ত রহিয়াছে। সকলেরই মনে মুখে একই প্রশ্ন—ব্যাপারটা কি?

যাঁহারা নিরঞ্জনার বাড়ির সম্মুখে সমবেত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বণিক। নিরঞ্জনা তাঁহাদের একজন প্রধান খরিদ্দার ছিল। অলঙ্কার, আতর, রেশম প্রভৃতি দেশী বিদেশী বহু জিনিস তাঁহারা নিরঞ্জনার নিকট বিক্রয় করিতেন। ইঁহারা গলা বাড়াইয়া ঠাহর করিবার চেষ্টা করিলেন, ভিতরে এই অগ্নিকাণ্ডের অর্থ কি! যে সব অল্পবয়স্ক ছোকরা সবে উচ্ছন্ন যাইতে শিখিয়াছে, যাহারা হাতে গলায় ফুলের মালা দুলাইয়া ভোরের দিকে স্খলিতচরণে বাড়ি ফিরিতেছিল, তাহারাও দাঁড়াইয়া পড়িল এবং কোলাহল করিতে লগিল। ক্রমশ বেশ ভীড় জমিয়া গেল। ক্রমশ এ কথাও আর চাপা রহিল না যে, একজন সন্ন্যাসীর

প্ররোচনায় অভিনেত্রী নিরঞ্জনা তাহার সমস্ত ঐহিক ঐশ্বর্য অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া পরলোকের সন্ধানে যৌবনেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বণিকেরা ভাবিল, নিরঞ্জনা যখন শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন তাহার নিকট আর কিছু বিক্রয় করিবার আশা নাই। এমন একটা শাঁসালো খরিদ্দার চিরকালের মতো হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে, এই ভয়ঙ্কর চিন্তা তাহাদের বিচলিত করিয়া তুলিল। এ কথাও তাহাদের মনে হইল, ওই সন্ন্যাসী যাদুমন্ত্রপ্রভাবে নিশ্চয়ই নিরঞ্জনার বুদ্ধি-ভ্রংশ করিয়াছে, তাহা না হইলে এমন একটা অঘটন ঘটিবে কেন! সুতরাং অবিলম্বে ইহার একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন। না করিলে অনেকের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যাইবে, নিরঞ্জনাকে কেন্দ্র করিয়াই তো অনেক দোকান গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অবশেষে মনে হইল, ওই সন্ন্যাসীকে আমরা এমন অনর্থ করিতে দিব কেন? আমরা বাধা দিব। দেশে কি আইন নাই? বিচারক নাই? নিরঞ্জনা সমস্ত পাটলিপুত্রের সম্পদ, একটা সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবে, চালাকি না কি! তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে।

অল্পবয়স্ক ছোকরারা ক্ষুব্ধ হইল অন্য কারণে। তাহাদের মনে হইল, নিরঞ্জনা যদি চলিয়া যায় তাহা হইলে তো সব গেল, সমস্ত আমোদপ্রমোদ অভিনয় উৎসব নিবিয়া যাইবে। রঙ্গমঞ্চে নিরঞ্জনাই তো সম্রাজ্ঞী। নিরঞ্জনার নাগাল পাইবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, নিরঞ্জনা তাহাদেরও আনন্দের উৎস। তাহারা তাহাদের প্রণয়িনীদের মধ্যে কল্পনায় নিরঞ্জনাকেই চুম্বন করে,

আলিঙ্গন করে। সমস্ত পাটলিপুত্রই নিরঞ্জনাময়। সে আছে বলিয়াই পাটলিপুত্রের আকাশ বাতাস মদির, তাহার অস্তিত্বই সকলকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছে।....

যুবকেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িল। শ্রীতিলক নামক এক যুবকের সহিত কিছুকাল পূর্বে নিরঞ্জনার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সে তারস্বরে ভণ্ড সন্ন্যাসীদের গালাগালি দিতে লাগিল। অবশেষে সকলেই নিরঞ্জনার আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। নানাপ্রকার মন্তব্য শোনা যাইতে লাগিল।

"এভাবে চ'লে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

"চুরি ক'রে চ'লে যাওয়া ভীরুতারই নামান্তর।"

"আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। হায় হায় হায়—"

"ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের সংসার চলবে কি ক'রে! মেয়েগুলোর বিয়ে হবে না যে!"

"নিরঞ্জনাকে যে মুকুটগুলো দিয়েছিলাম তার দাম না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই ওকে যেতে দেব না।"

"আমাকে পঞ্চাশখানা শাড়ি আনতে বলেছে। তার দামও দিয়ে যেতে হবে।"

"চতুর্দিকে ওর ধার। চ'লে গেলেই হ'ল!"

"ও চ'লে গেলে দ্রৌপদী, উর্বশী, দময়ন্তী, মেনকার ভূমিকায় অমন অভিনয় আর কে করবে! রোহিণী বা রেবতীর সাধ্য নেই ওর কাছাকাছি হবার।"

"নিরঞ্জনা না থাকলে জীবনই তো অন্ধকার হয়ে গেল হে। পাটলিপুত্রের আকাশে নিরঞ্জনাই সূর্য, নিরঞ্জনাই চন্দ্র, নিরঞ্জনাই নক্ষত্র।"

নগরের সমস্ত ভিক্ষুকরাও সমবেত হইয়াছিল। অন্ধ খঞ্জ পক্ষঘাতগ্রস্ত গলিতকুষ্ঠবিক্ষত বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে আসিয়াছিল, কেহ আর বাকি ছিল না। তাহারা জনতার পিছনে দাঁড়াইয়া আর্তনাদ করিতেছিল।

"নিরঞ্জনা না থাকলে আমরা বাঁচব কি ক'রে? কে আমাদের খাওয়াবে? নিরঞ্জনার রান্নাঘর থেকে শত শত ভিক্ষুক খেতে পায় রোজ। ওর প্রণয়ীরা আমাদের মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে যায় রোজ —এখন আমাদের গতি কি হবে?"

তস্করেরাও আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহাদের অন্য মতলব ছিল। তাহারা গগনবিদারী চীৎকার করিয়া জনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছিল লুটপাট করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া।

এই কোলাহলের মধ্যে বৃদ্ধ বণিক জনকদেব কেবল শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বড় ব্যবসায়ী। গান্ধার হইতে পশমের এবং সমতট হইতে কার্পাস বস্ত্রের আমদানি করিয়া তিনি পাটলিপুত্রের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিতেন। নিরঞ্জনার নিকট তাঁহার বহু টাকা বাকি ছিল। নিরঞ্জনা যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে চলিয়া যাইতে পারে—এ সংশয় তাঁহার মনে কোনও দিন জাগে নাই। তিনি উৎকর্ণ হইয়া সম্মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের সূক্ষ্মাগ্র দাড়িতে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন। তাঁহাকে অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত মনে হইতেছিল।

কিছুক্ষণ দাড়িতে হাত বুলাইয়া অবশেষে তিনি শ্রীতিলকের সমীপবর্তী হইলেন। বলিলেন, "আপনার সঙ্গে নিরঞ্জনার তো

খুব আলাপ ছিল এককালে! চেষ্টা ক'রে দেখুন না একটু, সন্ন্যাসীটার কবল থেকে যদি ওকে ছাড়াতে পারেন!"

"সন্ন্যাসীর সাধ্য কি ওকে নিয়ে যায়! মামাবাড়ির আবদার পেয়েছে না কি! যাচ্ছি আমি নিরুর কাছে। জাঁক করছি না, তবে আমার বিশ্বাস এতদিন পরে আমাকে কাছে পেলে ওই ভুতুড়ে সন্ন্যাসী আর আমল পাবে না। কি কালো রঙ বাবা! যেন ঝুল মেখে রয়েছে। মানুষের এ রকম রঙ দেখেছেন আপনি এর আগে? একটা ভালুক যেন! ওহে, সর সর, আমাকে যেতে দাও।"

শ্রীতিলক কাহাকেও ধাক্কা দিয়া, কাহারও পা মাড়াইয়া, কাহারও পাশ কাটাইয়া অবশেষে নিরঞ্জনার কাছে গিয়া হাজির হইলেন এবং তাহাকে এক ধারে ডাকিয়া বলিলেন, "নিরু, চিনতে পারছ আমাকে? কি কাণ্ড করছ তুমি! তুমি চ'লে যাবে শুনে আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি। এখনও তোমাকে ভুলতে পারি নি নিরু, তোমাকে ভোলা যায় কি—তুমিই বল?"

শ্রীতিলক আর বেশী কিছু বলিবার অবকাশ পাইলেন না। মহর্ষি সাবর্ণি সগর্জনে অগ্রসর হইয়া নিরঞ্জনাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন।

"পাষণ্ড, মৃত্যুভয় যদি থাকে নিরঞ্জনার অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না। নিরঞ্জনা আর নটী নেই। সে এখন নিষ্পাপ, সে এখন ঈশ্বরের। স'রে যাও এখান থেকে—"

"তুই বেটা স'রে যা, কুত্তা কোথাকার!"—ক্রোধে শ্রীতিলকের মুখ হইতে অভব্য ভাষা বাহির হইয়া পড়িল—"আমি আমার পুরনো সইয়ের সঙ্গে কথা কইছি, তুই শালা ভালুক সামনে

এসে দাঁড়ালি কোন্ আক্কেলে? তোর ওই দাড়ি ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তোকেই ওই আগুনের মধ্যে ফেলে দেব জানিস? বাঁদরামি করবার জায়গা পাও নি তুমি? মেয়েমানুষকে ভোজবাজি দেখিয়ে পার করবে ভেবেছ? আমার প্রাণ থাকতে তা পারবে না।"

শ্রীতিলক নিরঞ্জনার দিকে পুনরায় হস্ত-প্রসারণ করিতেই মহর্ষি সার্বর্ণি আচমকা তাঁহাকে এমন জোরে একটা ধাক্কা দিলেন যে, তিনি মুখ থুবড়াইয়া সেই জ্বলন্ত স্তূপের নিকট পড়িয়া গেলেন। আর একটু হইলে তাঁহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া যাইত।

বৃদ্ধ জনকদেব এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এইবার সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি মহর্ষি সার্বর্ণির বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন শ্রীতিলককে সন্ন্যাসী প্রহার করিয়াছে—এই অজুহাতে ক্ষিপ্ত জনতাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিবেন। হইলও তাই। অনতিবিলম্বে একদল লোক সার্বর্ণিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্রীতিলকের কাপড়ে আগুন লাগে নাই বটে, কিন্তু মাথার চুল একটু ঝলসাইয়া গিয়াছিল। ক্রোধে এবং ধূমে তিনি প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিও জনতার সহায়তা লইয়া সন্ন্যাসীকে শাস্তি দিবেন ঠিক করিয়া উন্মত্তের মতো তাহাদের দলে যোগ দিলেন এবং গালাগালি দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার পিছু পিছু দণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে ভিখারীর দলও আসিতে লাগিল। ভিখারীদের মধ্যে যাহারা চলচ্ছক্তিরহিত তাহারাও ক্ষান্ত হইল না। হামাগুড়ি দিয়া দল বৃদ্ধি করিল। অচিরাৎ মহর্ষি সার্বর্ণি ও নিরঞ্জনাকে ঘিরিয়া যেন একটি অরণ্য গড়িয়া উঠিল—ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহু ও

দণ্ডের অরণ্য। তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। জনতা চীৎকার করিতে লাগিল।

"খুন কর সন্ন্যাসীকে—"

"আগুনে ঠেলে ফেলে দাও। জীবন্তে পোড়াও ব্যাটাকে—"

সাবর্ণি নিরঞ্জনাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগলেন, "মূঢ় পাষণ্ডের দল, তোমরা কি নিজেদের শঙ্করের চেয়েও শক্তিমান ভেবেছ? যে নারী স্বেচ্ছায় শঙ্করের চরণে আত্মসমর্পণ করেছে, তাকে তোমরা ছিনিয়ে নিতে চাও? ছিনিয়ে নিতে পারবে? এত শক্তি কি আছে তোমাদের? এ হাস্যকর ব্যাপারে না মেতে তোমরা বরং নিরঞ্জনাকেই অনুসরণ কর। যদি করতে পার তোমাদের মধ্যে যা কর্দমের মতো মলিন হয়ে আছে তা স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তখন প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে। যে মিথ্যা বন্ধন তোমাদের ক্রীতদাসের মতো পরাধীন ক'রে রেখেছে তা ছিন্ন কর, নিরঞ্জনা যেমন করছে। বিলম্ব ক'রো না, শঙ্কর তোমাদের সকলের জন্যই অপেক্ষা করছেন, আর কতকাল তিনি অপেক্ষা করবেন? কালের করাল গহ্বরে পশুর মতো বিলীন হয়ে যাওয়ার আগে তাঁর শরণ নিয়ে মনুষ্যত্ব লাভ কর। তোমাদের উদ্ধারের এখন একমাত্র উপায় অনুতাপ করা। জীবনে যে সব পাপ করেছ অকপটে তা স্বীকার কর, কাঁদ, প্রার্থনা কর, শঙ্কর তোমাদেরও চরণে স্থান দেবেন, নিরঞ্জনাকে যেমন দিয়েছেন। তোমাদের পাপও ওর চেয়ে কিছু কম নয়। এখানে তোমাদের মধ্যে একজনও কি আছে যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, গণিকার চেয়ে সে কম পাপী? তোমরা প্রত্যেকেই তো মূর্তিমান কদর্যতা। শঙ্করের

দয়াতেই কেবল তোমাদের নাক মুখ দিয়ে নর্দমার মতো ময়লা বেরোয় না—”

মহর্ষি সাবর্ণির দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার বাক্যগুলিও যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো তাঁহার মুখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। জনতা কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা কয়েক মুহূর্তের জন্যই। বণিক জনকদেব সাবর্ণির বক্তৃতায় কান দেন নাই, তিনি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছিলেন। সেগুলি তিনি ভিক্ষুকদের হাতে হাতে দিয়া ছুঁড়িতে ইঙ্গিত করিলেন। মহর্ষি সাবর্ণির কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুনিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড তাঁহার কপালে আসিয়া আঘাত করিল, ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। রক্তধারা তাঁহার গাল বাহিয়া টপ টপ করিয়া নিরঞ্জনার মাথার উপর ঝরিয়া পড়িল। মনে হইতে লাগিল, তপস্যাক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ বুঝি শোণিতে পরিণত হইয়া তাহার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। সাবর্ণি নিরঞ্জনাকে দৃঢ়রূপে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার কর্কশ বহির্বাসের ঘর্ষণে তাঁহার সুকোমল অঙ্গ পীড়িত হইতেছিল, রক্তপাত দেখিয়া তাহার অন্তর আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

এই সময় ভীড় ঠেলিয়া সিন্ধুপতি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্বর্ণচম্পকশোভিত মূল্যবান শিরস্ত্রাণটি দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। শীলভদ্রের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি বাড়ি ফিরিতেছিলেন। নিরঞ্জনার বাড়ির পাশ দিয়াই রাস্তা। হট্টগোল শুনিয়া তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাহার পর ভীড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শিলা-নিবাসের সমীপবর্তী হইলেন। নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পুনরায় দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। তিনি

যেন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইলেন। নিরঞ্জনার ছিন্ন মলিন বেশ, বিরাট অগ্নিস্তূপ এবং রক্তাক্ত সাবর্ণিকে দেখিবেন—এ প্রত্যাশা তিনি করেন নাই। কয়েক মুহূর্ত তিনি থমকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত বা বিচলিত হইলেন না, কোন কিছুতেই বেশী বিস্মিত বা বিচলিত তিনি হইতেন না। কিন্তু যখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার বাল্যবন্ধুটি ক্ষিপ্ত জনতার কবলে পড়িয়াছে তখন আর অবিচলিত দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকাটা উচিত মনে হইল না। হাত তুলিয়া তিনি সকলকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

"থাম, থাম, এ কি করছ তোমরা? এই সন্ন্যাসী আমার বাল্যবন্ধু, নিজের লোক, পাগলের মতো তোমরা করছ কি?"

সিন্ধুপতির বাক্‌চাতুর্য দার্শনিক মহলে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত, কিন্তু মূর্খ জনতাকে শান্ত করিতে পারে এমন উগ্র বাগ্মিতা তাঁহার ছিল না। কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করিল না। সাবর্ণির মাথার উপর আর এক প্রস্থ শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। সাবর্ণি সর্বাঙ্গ দিয়া নিরঞ্জনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং লোষ্ট্রের আঘাতকে শঙ্করের অনুগ্রহ ভাবিয়া তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সিন্ধুপতি উচ্চতম গ্রামে চীৎকার করিয়াও যখন উন্মত্ত জনতাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না তখন যে পরমেশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, তাঁহারই হস্তে সাবর্ণি ও নিরঞ্জনাকে সমর্পণ করিয়া তিনি রণে ভঙ্গ দিবেন কি না চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সাধারণ ইতর লোকের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কোন কালেই উচ্চ ছিল না। তাহাদের তিনি দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তু

বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মনে হইল, একটা কৌশল করিলে ইহারা হয়তো নিবৃত্ত হইবে। তিনি ধনী এবং শৌখীন লোক ছিলেন, সঙ্গে সর্বদা কিছু অর্থ থাকিত। তখন তাঁহার সঙ্গে একটি থলিতে কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছিল। তিনি থলিটি লইয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপকারীদের মধ্যে ছুটিয়া গেলেন এবং তাহাদের কানের কাছে থলিটি নাড়িতে লাগিলেন। স্বর্ণ-রৌপ্যের মধুর নিক্কণও প্রথমে তেমন কার্যকরী হইল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হইল। যে সব ভিক্ষুক উন্মত্তবৎ ঢিল ছুঁড়িতেছিল তাহারা তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। সিন্ধুপতি তখনই থলি খুলিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলি ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ফল হইল। সকলে টাকা ও মোহর কুড়াইতে লাগিল। কৌশল সফল হইয়াছে দেখিয়া সিন্ধুপতি চারিদিকে অনেক দূরে দূরে টাকা ছুঁড়িতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুক, ক্রীতদাস ও বণিকের দল মাটির উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। শ্রীতিলককে ঘিরিয়া যে সব অভিজাতবংশীয় যুবক দাঁড়াইয়া ছিল, মজা দেখিয়া তাহারা অট্টহাস্য করিতে লাগিল। শ্রীতিলকের ক্রোধ প্রশমিত হইয়াছিল। নূতন মজা দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার বন্ধুরা প্রলুব্ধ জনতাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, শেষে তাঁহারা নিজেরাও পয়সা টাকা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত প্রান্তরে আর মানুষের মাথা দেখা গেল না, চারিদিকেই কেবল ন্যুব্জপৃষ্ঠ। মনে হইতে লাগিল, যেন আকাশ হইতে স্বর্ণ-রৌপ্য বৃষ্টি হইতেছে এবং এক অদ্ভুত জন-সমুদ্রের তরঙ্গমালা আন্দোলিত হইতেছে। সাবর্ণির কথা সকলে ভুলিয়া গেল।

সিন্ধুপতি তখন তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন। নিজের

গাত্রাবাস দিয়া তাঁহাকে এবং নিরঞ্জনাকে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের পাশের একটা রাস্তায় টানিয়া লইয়া গেলেন। তাহার পর তিনজনেই কিছুক্ষণ নীরবে ছুটিতে লাগিলেন। জনতার নিকট হইতে দূরে গিয়া যখন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, জনতা আর তাঁহাদের নাগাল পাইবে না তখন তাঁহাদের গতিবেগ মন্দীভূত হইল।

সিন্ধপতি তখন নিরঞ্জনার দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "সাধুর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে তা হ'লে! রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল বটে, কিন্তু তাকে অরণ্য থেকে স্বর্ণলঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল, সাবর্ণি ঠিক উল্টোটা করলে। নগর থেকে তোমাকে অরণ্যে নিয়ে চলল।"

নিরঞ্জনা উত্তর দিল, "তার কারণ আপনাদের সঙ্গ আমার আর ভাল লাগছিল না। আপনাদের ঐশ্বর্যের নানা আড়ম্বর, আপনাদের মেকি মুখোশ আর সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। জীবনে আজ পর্যন্ত যা জেনেছি, যা ভোগ করেছি, তার সম্বন্ধে এতটুকু মোহ নেই আর। তাই অজানার সন্ধানে বেরিয়েছি। আমার এতদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু অন্তত বুঝেছি যে, যা আমরা আনন্দ ব'লে উপভোগ করি তা প্রকৃত আনন্দ নয়। মহর্ষি বলেছেন—দুঃখই প্রকৃত আনন্দের উৎস। তাঁর কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছে, কারণ সারাজীবন উনি সত্যেরই সন্ধান করেছেন।"

সিন্ধুপতি হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু পেয়েছেন একটি মাত্র সত্য। আমি সারাজীবন সন্ধান ক'রে অনেক সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সে হিসেবে আমি ওঁর চেয়ে বড় সত্যদর্শী। কিন্তু

সে জন্য আমি গর্ব অনুভব করি না, সে জন্য বেশী সুখীও হই নি।”

সার্বর্ণি তাঁহার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সিন্ধুপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি যেন মনে ক’রো না যে, আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি বা তোমার আচরণ অযৌক্তিক মনে করেছি। তোমার জীবনের সঙ্গে আমার তুলনা করলে কোন্‌টা বেশী ভাল তা নির্ণয় করতে বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। সুনন্দা আর সুছন্দা আমার স্নানের ব্যবস্থা ক’রে রেখেছে। আমি ফিরে গিয়ে এখন স্নান করব, তারপর মধ্যপ্রদেশের অরণ্য থেকে আহরিত শূল্যপক্ক একটি তিত্তির পক্ষী আহার করব। তারপর পড়ব কালিদাস বা ভবভূতি। অনেকবার পড়েছি, তবু পড়ব। তুমি তোমার পর্ণকুটিরে ফিরে গিয়ে তোমার শিবলিঙ্গের সামনে উটের মতো হাঁটু গেড়ে বসবে, তারপর যে সব প্রাণহীন মন্ত্র সহস্রবার আউড়েছ সেগুলিই বোধ হয় আবার আওড়াবে, তারপর কিছু শুষ্ক ফল-মূল খাবে যদিও আপাতদৃষ্টিতে আমাদের দুজনের জীবন দু রকম; কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে আমাদের দুজনেরই লক্ষ্য এক। সমস্ত মানবজাতিরই ওই এক লক্ষ্য—আনন্দ লাভ করা যা করা অসম্ভব, যা পাওয়া যায় না, আলেয়ের মতো যা কেবল সকলকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং তোমাকে উপহাস ক’রে খোলো করবার অধিকার আমার নেই, যদিও আমি আমার নিজের জীবনযাত্রার ধরনটাকেই বেশী পছন্দ করি। নিরঞ্জন তোমাকেও বাধা দেবার চেষ্টা আমি করব না। তুমি ওর সঙ্গেই যাও। বিলাস, ঐশ্বর্য, সঙ্গীত, অভিনয়, খ্যাতি প্রভৃতির মধ

থেকে এতদিন তুমি যা পেয়েছ, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাবার আশা যদি পেয়ে থাক, কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে এর চেয়ে বেশী সুখী হওয়া তোমার পক্ষে যদি সম্ভবপর হয়, তা হ'লে সে সুখ লাভ কর গিয়ে। সমস্ত দিক দিয়ে ভেবে দেখলে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তুমি অভাবনীয় একটা সুযোগও পেয়ে গেছ। আমাদের ওপর টেক্কা দিয়েছ। আমি এবং সাবর্ণি প্রত্যেকেই নিজের রুচি অনুসারে মাত্র একটি পথ বেছে নিয়েছি, সেই পথ অনুসরণ ক'রেই সুখের সন্ধান করছি। তুমি একটা পথের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে আর একটা পথে পা বাড়াচ্ছ। এ সুযোগ সকলের হয় না, তোমাকে আমি ঈর্ষা করি। আমি কিছুক্ষণের জন্যও সাবর্ণির মতো সন্ন্যাসী হবার সুযোগ পেলে খুশী হতাম। কিন্তু তা আমি পাব না, আমার মনের গড়ন আর বদলাবে না। সুতরাং চলি এবার। আমার বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ কর তোমরা। নিরঞ্জনা, তোমার অদৃষ্ট, তোমার প্রকৃতি, তোমার অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণা যে পথে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে সেই পথেই যাও তা হ'লে। আমার আন্তরিক শুভ কামনা রইল তোমার সঙ্গে। তোমার নূতন সন্ধান জয়যুক্ত হোক। সুখী হও, যদি পার। বুঝতে পারছি কথাগুলো খুব বাজে শোনাচ্ছে। কিন্তু কি করব বল, যাওয়ায় আগে দু-চার কথা বলতেই হবে। যে মোহিনী মায়ায় তুমি আমার জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলে, যার স্মৃতি সুখস্বপ্নের মতো এখনও আমার জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার বেদনাময় বৃহৎ ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করা এখন শোভা পায় না, তাই সে সব আর বলব না। তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী ছিলে, কিন্তু তোমাকে হয়তো আমি ভাল ক'রে

বুঝতে পারি নি। স্বতঃস্ফূর্ত মহিমান্বিতা তুমি, অদ্ভুত রহস্যে রহস্যময়ী, অপূর্ব কিরণে উজ্জ্বল করেছিলে আমার জীবনকে। এবার বিদায় নেবার সময় এসেছে, হাসিমুখে বিদায় দাও। জানি না কোন্ বিধাতা কি উদ্দেশ্যে তোমার মতো অপরূপাকে এই নির্মম পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন—"

সিন্ধুপতি যখন এই কথাগুলিকে বলিতেছিলেন, তখন মহর্ষি সাবর্ণির অন্তর ক্রোধে পুড়িয়া যাইতেছিল। সহসা তিনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দূর হয়ে যাও তুমি। তোমাকে আমি ঘৃণা করি—তুমি ঘৃণ্য নরকের কীট। দূর হয়ে যাও। যারা আমাদের এতক্ষণ গাল দিচ্ছিল, আমাদের দিকে ঢিল ছুঁড়ছিল তাদের 'চেয়ে সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর তুমি। তারা অজ্ঞ, কি করছে তারা তা জানে না। ওদের মাথায় শঙ্করের আশীর্বাদ একদিন হয়তো বর্ষিত হবে, আমি ওদের জন্যে মনে মনে প্রার্থনাও করেছি, ওদের অন্ধকার জীবন শিবের মহিমা-কিরণে একদিন আলোকিত হবে। কিন্তু তুমি, সিন্ধুপতি, তুমি মূর্তিমান গরল ছাড়া আর কিছু নও, তোমার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষ। তুমি যেখানে যাবে মৃত্যুর বীজ ছড়াতে ছড়াতে যাবে। সহস্রমুখ পিশাচের চেয়েও ভয়ঙ্কর তুমি, তোমার হাসি আরও ভয়ানক। পিশাচেরা এক শতাব্দী চেষ্টা ক'রে যে সর্বনাশ করতে পারবে না, তোমার হাসি এক নিমেষে তা পারবে। তুমি দূর হও—"

সিন্ধুপতি স্নেহভরে তাঁহার দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বেশ, চললাম তা হ'লে। তোমার ধর্মবিশ্বাস তোমাকে মাত্র দুটি জিনিস দিয়েছে দেখছি—প্রেম আর ঘৃণা। আমরণ সেই দুটিকেই আঁকড়ে থাক। নিরঞ্জনা, চলি তা

হ'লে, আর হয়তো দেখা হবে না। আমাকে ভুলতে চেষ্টা ক'রো না, পারবে না। আমিও পারব না।"

সিন্ধুপতি চলিয়া গেলেন। আঁকাবাঁকা বহু গলি পার হইয়া তিনি অবশেষে শ্মশানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি দোকানে শবদাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। স্তূপীকৃত চন্দনকাষ্ঠগুলির দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিলেন, এইগুলিই তাঁহার জীবন-পথের শেষ সঙ্গী হইবে। ইহাদের ভস্মের সহিত তাঁহার ভস্মও মিশিয়া যাইবে। সহসা তাঁহার মনে হইল, মদনও ভস্মীভূত হইয়াছিল। বুকের কাছটা কেমন যেন ব্যথা করিয়া উঠিল। সান্ত্বনা বহন করিয়া দার্শনিক চিন্তাও উদিত হইল। ভাবিলেন, সময় বা আয়ু বলিয়া কিছু আছে কি? এসব তো মনের ভ্রম মাত্র। আয়ু কিছু নাই, সুতরাং তাহা শেষ হইবে কিরূপে? চিরকাল কি বাঁচিয়া থাকিব? না। বাঁচিবার কোনও প্রশ্নই উঠে না। চিরকাল মৃত্যুর মধ্যেই ছিলাম, আছি এবং থাকিব। ইহাই সত্য। যাহা আমাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে তাহার আগমন-আশঙ্কায় নূতন করিয়া ম্রিয়মাণ হওয়া মূঢ়তারই নামান্তর। ইহা যেন পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠার মতো। পুস্তকটি পড়িতেছি কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই। পুস্তকটি মৃত্যু।—এই চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া তিনি পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়ের ভার লঘু হইল না। ভারাক্রান্ত হৃদয়েই তিনি নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছন্দা-নন্দার হাস্যকলরব তাঁহাকে অনেকটা আশ্বস্ত করিল। তাহারা ভিতরে লুকাচুরি খেলিতেছিল।

মহর্ষি সাবর্ণি নিরঞ্জনাকে লইয়া পাটলিপুত্র ত্যাগ করিলেন। গঙ্গার তীর ধরিয়াই তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। মহর্ষি সাবর্ণির ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয় নাই। তিনি নিরঞ্জনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এতকাল যে সব পাপ তুমি করেছ গঙ্গার সমস্ত জল দিয়েও তা ধুয়ে পরিষ্কার করা যাবে না। তোমার যে দেহ ভগবান নিজের মন্দিরের মতো ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন সেই দেহ তুমি শূকরীর মতো, কুক্কুরীর মতো বিক্রি করেছ ওই সব অধার্মিক লম্পটদের কাছে। তোমার পাপের সীমা নেই। দুরপনেয় পাপ দুর্গন্ধ বিষ্ঠার মতো লিপ্ত হয়ে আছে তোমার সর্বাঙ্গে।"

নিরঞ্জনা কোন উত্তর দিল না—প্রখর রৌদ্রে, কঙ্করাকীর্ণ পথে নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। অনেক দূর চলিবার পর ক্লান্তিতে তাহার দেহ অবসন্ন হইল, পা দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তৃষ্ণায় রসনা শুষ্ক হইল, কিন্তু মহর্ষি সাবর্ণি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সাধারণ মানুষের হয়তো দয়া হইত, কিন্তু তাঁহার হইল না। নিরঞ্জনার কলঙ্কিত দেহটা নির্যাতিত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে এই ভাবিয়া তিনি বরং আনন্দিতই হইলেন। এই পবিত্র ভাব তাঁহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, অতীত পাপের সাক্ষ্য বহন করিয়া যে দেহটা এখনও রূপে রসে টলমল করিতেছে, সেই দেহটাকে বেত্রাঘাত করিয়া বিক্ষত রক্তাক্ত করিয়া দিবার বাসনাও তাঁহার হইল। একটু চিন্তা করিয়া এ বাসনার সমর্থনও তিনি নিজের অন্তর হইতে পাইলেন, বিশেষ করিয়া যখন তাঁহার মনে পড়িল যে নিরঞ্জনা সিন্ধুপতির সহিত একই শয্যায় শয়ন করিয়াছে। এই পাপের বীভৎসতায়

তিনি এমন অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিশ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া গেল—মনে হইতে লাগিল এখনই বুঝি বুকটা ফাটিয়া যাইবে। যে অভিশাপ তিনি উচ্চারণ করিতে গেলেন কণ্ঠ দিয়া তাহা বাহির হইল না, দন্তে দন্তে ঘর্ষিত হইয়া একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল কেবল। সহসা এক লম্ফে তিনি নিরঞ্জনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, চোখের দৃষ্টিতে ধক ধক করিয়া আগুন জ্বলিতে-ছিল। মনে হইতেছিল স্বয়ং রুদ্রই বুঝি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তাঁহার সর্বাঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনার নিগূঢ় আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই সম্ভবত এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর সহসা তাহার মুখের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন।

নিরঞ্জনা কিছু বলিল না, তাহার গতিও শ্লথ হইল না, সে নীরবে নিষ্ঠীবন মুছিয়া ফেলিল।

ইহার পর সার্বণিই তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নিরঞ্জনা যেন মানুষ নয়, একটা অতলস্পর্শী গহ্বর। তিনি একটু ভীত হইলেন। সামান্য একটা স্ত্রীলোককে দেখিয়া ভীত হইয়াছেন বলিয়া আত্মধিক্কারেও তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর তিনি পথের ধূলার উপর রক্তবিন্দু দেখিতে পাইলেন। নিরঞ্জনার পা হইতে রক্ত পড়িতেছে। তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং মহাকালই দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাঁহার আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। এ কথা মনে হইবামাত্র এক অদ্ভুত আনন্দে তাঁহার প্রাণমন ভরিয়া গেল। পর-মুহূর্তেই চোখ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি নিরঞ্জনার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিরঞ্জনার রক্তাক্ত চরণ চুম্বন করিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "আমার ভগিনী, আমার মা, পুণ্যবতী মা—"

মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে দেবদূতগণ, তোমরা এই রক্তবিন্দুগুলি ভগবান আশুতোষের কাছে নিয়ে যাও। যিনি ব্যাধকে বরদান করেছিলেন, তিনি নিরঞ্জনাকেও ক্ষমা করবেন। তাঁর ইচ্ছা হ'লে যেখানে যেখানে রক্ত পড়েছে সেখানে সেখানে ফুল ফুটে উঠবে হয়তো। রক্তাক্ত বালুভূমি পুষ্পাকীর্ণ হয়ে ভবিষ্যতে পাপীদের হৃদয়ে সান্ত্বনা বহন ক'রে আনবে। নিরঞ্জনা পবিত্রা, পুণ্যশীলা—"

ঠিক এই সময়ে একটি বালক একটি গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহর্ষি সাবর্ণিকে দেখিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। মহর্ষি তাহাকে নামিতে বলিলেন। সে নামিতেই তিনি নিরঞ্জনাকে গর্দভটির পৃষ্ঠে বসাইয়া নিজেই তাহার লাগাম ধরিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

...সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ঘনপত্রসমন্বিত বিটপীসমাচ্ছন্ন এক স্রোতস্বিনীর তীরে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গর্দভটিকে একটি বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া সাবর্ণি একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন। সঙ্গে তিনি কিছু খাবার আনিয়াছিলেন। নিরঞ্জনার সহিত তাহা আহার করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া নদীর জল পান করিলেন তাহার পর কথাবার্তা শুরু হইল।

নিরঞ্জনা বলিল, "এমন পরিষ্কার জল আমি আর কখনও পান করি নি। এমন নির্মল বাতাসও এর আগে আমার গায়ে লেগেছে ব'লে মনে পড়ে না। মৃদু সমীরণের স্পর্শকে মনে হচ্ছে যেন ভগবানের স্পর্শ—"

সার্বর্ণি বলিলেন, "ভগ্নি, সন্ধ্যা আসন্ন। দূরের পাহাড়-গুলি রাত্রির ঘননীল ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আর একটু পরেই তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থে গিয়ে পৌঁছবে। অনন্ত প্রভাতের উষালোক কিছুক্ষণ পরে তোমার নয়নরঞ্জন করবে—"

তিনি আর বিশ্রাম করিলেন না। নিরঞ্জনাকে লইয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র গভীর নিশীথে নদীর অসংখ্য তরঙ্গশীর্ষে জ্যোৎস্না মাখাইতে লাগিল, আর সার্বর্ণি শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে নদীর তীরে তীরে চলিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইল। দেখা গেল তাঁহারা এক বিরাট রুক্ষ প্রান্তরের সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রান্তরের পরপারে কয়েকটি আকাশ-চুম্বী তালগাছ এবং কতকগুলি কুটির দেখা যাইতেছিল।

"মহর্ষি, ওই কি সেই তীর্থ যেখানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন?"

"ঠিকই ধরেছ মা, ওইখানেই তোমার আশ্রয়, নিজের হাতে ওইখানেই তোমাকে আমি সমর্পণ ক'রে যাব।"

আরও কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, কুটিরগুলির আশেপাশে অনেকগুলি নারীমূর্তি সঞ্চরণ করিয়া

বেড়াইতেছে। নিরঞ্জনার মনে হইল মধু-চক্রের পাশে যেন মৌমাছিরা উড়িতেছে।

আরও নিকটবর্তী হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সকলেই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। কেহ রুটি সেঁকিতেছেন, কেহ তরকারি কুটিতেছেন, কেহবা চরকা কাটিতেছেন। সকলেরই মুখ প্রসন্ন, যেন এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত। নিকটে একটি বিরাট বিল্ববৃক্ষ ছিল, তাহার নীচে বসিয়া কয়েকজন পূজাও করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, সকলেই যেন উমা, সকলেই যেন শিবের ধ্যানে তন্ময়, শিব-চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা কাহারও মনে ছায়াপাত করিতেছে না। বস্তুত, আশ্রমেও তাঁহারা উমা নামেই অভিহিত, তাঁহাদের আর অন্য নাম নাই। প্রত্যেকেই বল্কলবাসা কিশোরী। যাহারা যুবতী তাঁহাদের নাম পার্বতী, তাঁহারা গৃহকর্মরতা, তাঁহাদের অঙ্গে কাষায় বসন। ভৈরবী নামে অভিহিতা কয়েকজন সন্ন্যাসিনীও ছিলেন, তাঁহারা ত্রিশূলধারিণী গৈরিকবাসা। তাঁহারা কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বৃদ্ধা। একজন অতি বৃদ্ধা ভৈরবী লাঠির উপর ভর দিয়া সমস্ত তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মহর্ষি সাবর্ণি সসম্ভ্রমে তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বলিলেন, "জয় শঙ্কর! আশা করি ভগবানের কৃপা সকলেই কুশলে আছেন। আপনি যে মধুচক্রের রাণী, সেই মধুচক্রে আমি আজ একটি মধুপ এনেছি। বেচারী ঊষর পুষ্পহীন প্রান্তরে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তাকে আমি অতি সন্তর্পণে নিজের অঞ্জলির মধ্যে পুরে নিয়ে এসেছি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে তাকে আশ্রয় দিন।"

তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া নতজানু নিরঞ্জনাকে দেখাইলেন। নিরঞ্জনা ভৈরবীর পদপ্রান্তে প্রণতা হইয়াছিল।

শিবানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার নিরঞ্জনার দিকে চাহিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলেন। তাহার পর তাহার ললাট চুম্বন করত সাবর্ণির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেশ, একে উমার দলে ভর্তি ক'রে নেব ?"

সাবর্ণি তখন সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন কি ভাবে তিনি নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "এখন কিছুদিন ওকে একা একটি নির্জন ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা প্রয়োজন। নির্জনে কিছুকাল নিজেকে নিয়ে থাকলে ওর আত্মোপলব্ধি হবে। অনুতাপের আগুনে কিছুকাল পুড়ে শুদ্ধ না হ'লে ওকে আর কারও সঙ্গে মিশতে দেওয়াও নিরাপদ নয়।"

ভৈরবী ইহাতে সম্মত হইলেন। কিছুদিন পূর্বে আশ্রমের একজন সন্ন্যাসিনী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটিরটি শূন্য ছিল। নিরঞ্জনার সেই ঘরেই থাকার ব্যবস্থা হইল।

ঘরের ভিতর একটি সাধারণ শয্যা, একটি মৃন্ময় কলস এবং একটি কুশাসন ছাড়া আর কিছু ছিল না। ঘরের মধ্যে পদার্পণ করিয়া নিরঞ্জনার সমস্ত অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মহর্ষি সাবর্ণি বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, ওর ঘরটা আমি নিজে হাতে তালা বন্ধ ক'রে যাব। ও যখন সত্যিই উমা হবে, স্বয়ং উমানাথ এসে ওর ঘরের চাবি খুলে দেবেন।"

ভৈরবী ইহাতেও আপত্তি করিলেন না।

দ্বারে একটি ক্ষুদ্র ফাটল ছিল। মহর্ষি সাবর্ণি কূপের নিকট

হইতে খানিকটা কাদা লইয়া এবং কাদার ভিতর নিজের মাথার একটি চুল পুরিয়া সেটি ফাটলের উপর লাগাইয়া দিলেন।

ঘরের ছোট জানালাটির নিকট নিরঞ্জনা শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। জানালার নিকট আসিয়া মহর্ষি সাবর্ণি জানু পাতিয়া বসিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে তিনবার 'জয় শঙ্কর' উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "জীবনের সত্য পথে এসে ওকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! কি সুন্দর ওর পা দুখানি! কি অপূর্ব দ্যুতি ওর মুখে।"

তাহার পর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের ছিন্ন বেশ সম্বৃত করিয়া চলিয়া গেলেন।

অতিবৃদ্ধা ভৈরবী শিবানী তখন একজন কুমারীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "উমা, নিরঞ্জনার ঘরে রুটি, জল আর একটি ছোট বাঁশী দিয়ে এস।"

মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহার আরণ্য আশ্রমে ফিরিতেছিলেন। এবার তিনি পদব্রজে যাইতেছিলেন না, একটি বড় নৌকাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। নৌকাটি হরিদ্বার অভিমুখে মাল লইয়া যাইতেছিল। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে অবশ্য কিছুদূর হাঁটিতে হইল। আশ্রমের নিকটবর্তী হইতেই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের আগ্রহ ও আনন্দের অভিব্যক্তি নানা ভাবে প্রকট হইল। কেহ আকাশে হস্ত উত্তোলন করিয়া গদগদ হইলেন, কেহ ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, কেহ কেহ তাঁহার পাদুকা চুম্বনও

করিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে কি অসাধ্য সাধন যে করিয়া অসিয়াছেন—এ খবর তাঁহার আসিবার পূর্বেই আশ্রমে পৌছিয়া গিয়াছিল। সেকালে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সংবাদই মুখে মুখে স্থান হইতে স্থানান্তরে অতি দ্রুতবেগে নীত হইত।

মহর্ষি সাবর্ণি নিজের কুটিরে উপনীত হইবার পূর্বেই শিষ্যপরিবৃত হইয়া পড়িলেন। শিষ্যদের মধ্যে প্রবীণতম ছিলেন পণ্ডিত হরানন্দ। তিনি এত হৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, সাবর্ণিকে দেখিবামাত্র তারস্বরে একটি শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা সাবর্ণির কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন সকলে নতজানু হইয়া নতমস্তকে উপবেশন করত বলিলেন, "পিতা, আমাদের আশীর্বাদ করুন, আর অনুমতি দিন আপনার প্রত্যাগমন উপলক্ষে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করি।"

শিষ্যদের মধ্যে বালক বাঞ্ছাই কেবল নতজানু হইল না। সে সোজা দাঁড়াইয়া রহিল। সে মহর্ষি সাবর্ণিকে চিনিতেই পারিল না। প্রশ্ন করিল, "ইনি কে?" কিন্তু কেহ তাহাকে বিশেষ আমল দিল না। এই হাস্যকর উক্তিতে দুই-একজন মৃদু হাসিল মাত্র। সকলেই জানিত, বালকস্বভাব বাঞ্ছারামের অন্তঃকরণ যদিও পবিত্র, কিন্তু বুদ্ধি বড় কম।

নিজের কুটিরে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি সাবর্ণির মনে হইল—"এতদিন পরে আমার আশ্রমে, আমার সাধনার পীঠস্থানে ফিরে এলাম। কিন্তু আমার পর্ণকুটির তো আমাকে তেমন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না! কুটিরের মধ্যে জিনিসপত্র সব ঠিকই আছে। শিবলিঙ্গটি, শিবপুরাণগুলি যেখানে রেখে গিয়েছিলাম, সেইখানেই

রয়েছে। কোথাও কোনও পরিবর্তন চোখ পড়ছে না। তবু মনে হচ্ছে, কি যেন একটা নেই। আমার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটিতে যে সহজ সৌন্দর্য ছিল তা যেন অন্তর্হিত হয়েছে। মনে হচ্ছে এ সব জিনিস যেন আর কারও। বহু বৎসর আগে যে শয্যা যে আসন আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করেছি, পুরাণের যে সব ভগবৎকথা নিজের হাতে কষ্ট ক'রে টুকেছি, মনে হচ্ছে তা যেন আমার নয়, কোনও মৃত ব্যক্তির। যে সব জিনিস আমার অতি পরিচিত, একটা অপরিচয়ের আবরণ যেন তাদের ঘিরে রয়েছে। অথচ বাইরের আকারে প্রকারে এরা যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। এরা যখন বদলায় নি, তখন আমিই নিশ্চয় বদলেছি। আমি তা হ'লে অন্য লোক। যে মারা গেছে, সেও আমি ছিলাম। এই জন্মেই আমার যেন জন্মান্তর হয়েছে। হে শঙ্কর, এ কি হ'ল? যে তোমার ভক্ত ছিল, সে কিসে রূপান্তরিত হ'ল? সে এখান থেকে কি নিয়ে গেল, কি রেখে গেল? আমিই বা কে?"

যে কুটিরে এতকাল তাঁহার স্থানাভাব হয় নাই, সেই কুটিরই এখন বড় সঙ্কীর্ণ মনে হইতে লাগিল। তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে নিজেই তিনি বিস্মিতও হইলেন। যে কুটিরে বসিয়া তিনি শঙ্করের অনন্ত মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা তাঁহার চক্ষে সুবৃহৎ মনে হওয়া উচিত ছিল।

মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ তিনি প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে অশান্তি কতকটা কমিল। প্রার্থনার মধ্যেই কিন্তু নিরঞ্জনার মূর্তি তাঁহার মানসপটে বার বার ফুটিয়া উঠিতেছিল। ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি শঙ্করকে আবার মনে মনে প্রণাম করিলেন।

বলিলেন, "দেবাদিদেব, আমি জানি তুমিই নিরঞ্জনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছ। তুমি করুণাময়, তুমিই তাকে বার বার মূর্ত করেছ আমার মনে। কারণ তুমি জান, যাকে তোমার পায়ে আমি সমর্পণ ক'রে এসেছি তাকে দেখলে আমি সুখী হব, নিশ্চিন্ত হব। সেই জন্যই তুমি তার মুখখানি বার বার আমার মনে ফুটিয়ে তুলছ। যাকে আমি অতি কষ্টে কলঙ্কমুক্ত করেছি, তার সরল হাসি, সহজ শ্রী, অপূর্ব সৌন্দর্য আমাকে আনন্দ দেবার জন্যই। তাই তুমি তাকে তোমার প্রার্থনার মধ্যেও নিয়ে এসেছ। তোমাকে উপহার দেব ব'লেই নিরঞ্জনাকে আমি পাপের পঙ্ক থেকে তুলে এনে চোখের জলে বিশুদ্ধ করেছি, এতে তুমি যে প্রসন্ন হয়েছ তাও অন্তর দিয়ে আমি অনুভব করছি। উপহার পেয়ে বন্ধু যেমন বন্ধুকে স্মিতহাস্যে অভিনন্দিত করে, নিরঞ্জনাকে পেয়ে তুমিও তাই করছ। তা না হ'লে নিরঞ্জনাকে আমার চোখের সামনে বারম্বার মূর্ত করছ কেন? এর অন্য কোনও অর্থ তো আমার মাথায় আসছে না। তুমিই নিরঞ্জনাকে দেখাচ্ছ, তাই তাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে। তুমি যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ যে, আমিই ওকে তোমার চরণে সমর্পণ করেছি। ওকে তোমার পায়েই ঠাঁই দাও প্রভু. ওর রূপের অর্ঘ্য তোমার চরণেই নিঃশেষ হোক, আর কেউ যেন তা ভোগ না করে।"

সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না, সমস্ত রাত্রি নিরঞ্জনা নানারূপে তাঁহার বিনিদ্র নয়নের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শিলা-নিবাসে তাহাকে তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন, তদপেক্ষা স্পষ্টতররূপে যেন তাহাকে দেখিতে পাইলেন। আর মনে মনে ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "শঙ্করের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি যা করেছি তা তাঁর জন্যই করেছি।"

কিন্তু তবু আশ্চর্যের বিষয়, এ কথা বার বার আবৃত্তি করিয়াও তাঁহার মানসিক অশান্তি ঘুচিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে সম্বোধন করিয়া তখন তিনি বলিলেন, "কেন তুমি অশান্তি ভোগ করছ? কেন তুমি এমন বিমর্ষ—"

কিছুতেই কিন্তু মানসিক শান্তি আর ফিরিয়া আসিল না। ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্রি ঘোর অশান্তির মধ্যে কাটিল। তপস্বীর পক্ষে ইহা ভয়ঙ্কর শাস্তি। নিরঞ্জনার মূর্তি দিনে বা রাত্রে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে সরিল না। তিনি সরাইবার চেষ্টাও করিলেন না; কারণ তিনি নিজেকে বুঝাইয়াছিলেন যে, শঙ্করই তাঁহাকে এ মূর্তি দেখাইতেছেন এবং নিরঞ্জনা আর কলঙ্কিতা বারনারী নাই, সে এখন তপস্বিনী। একদিন ভোরে নিরঞ্জনা স্বপ্নে তাঁহাকে যে মূর্তিতে দেখা দিল তাহা বেশ চাঞ্চল্যজনক। তাহার কবরীতে ফুলের মালা, বাহুতে অধরে যৌবনের প্রলাপ। আতঙ্কে সাবর্ণির ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন, ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া দিয়াছে। তখনও তাঁহার চোখ হইতে ভাল করিয়া ঘুম ছাড়ে নাই, তাঁহার মনে হইল কাহার উত্তপ্ত নিশ্বাসও যেন তাঁহার মুখে লাগিতেছে। পর-মুহূর্তেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হইল। একটা শৃগাল ঘরে ঢুকিয়াছিল এবং তাঁহার মাথার শিয়রের দিকে দুইটি পা তুলিয়া দিয়া তাঁহার মুখ শুকিতেছিল। তাহার গায়ের দুর্গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ। তিনি উঠিয়া বসিতেই শৃগালটা পলায়ন করিল। মনে হইল, সে খুক খুক করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

এই ঘটনায় সাবর্ণি বড় দমিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যে উচ্চ মিনারের উপর তিনি এতকাল দাঁড়াইয়া

ছিলেন তাহা ক্রমশ যেন মাটিতে বসিয়া যাইতেছে। সত্যই, তাঁহার আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় স্তম্ভটার ভিত্তি নড়িয়া গিয়াছিল। কিছুকাল তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন, তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তিও যেন লোপ পাইল। কয়েক দিন পরে আত্মস্থ হইয়া তিনি অবশ্য চিন্তা করিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসিক অশান্তি কমিল না, বরং বাড়িল।

উপরোক্ত স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মানসপটে নিরঞ্জনার আবির্ভাবের দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রার্থনা করিবার সময় নিরঞ্জনার চেহারা যখন বার বার তাঁহার মনে জাগিতেছিল তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, শঙ্করের ইচ্ছা অনুসারেই তাহা হইতেছে। ইহা সত্য হইলে এই স্বপ্নটাও শঙ্করের সৃষ্টি। তাঁহার কলুষিত মনই পবিত্র স্বপ্নকে অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, অপরিষ্কার পাত্রে রাখিলে উৎকৃষ্ট সুরাও যেমন পচিয়া যায় তেমনি আমার দোষেই সুন্দর অসুন্দরে পরিণত হইয়াছে এবং আমার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আমার পশুপ্রকৃতিও শৃগালরূপে দেখা দিয়াছে। আর তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ এ স্বপ্নের সহিত শঙ্করের যদি কোনও সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলে ইহা দানব-চক্রান্ত, কামরূপী কোন পিশাচ তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। নিরঞ্জনার প্রথম আবির্ভাবও তাহা হইলে এই পিশাচের কীর্তি, শঙ্করের নয়। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার হিতাহিতবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, যোগীজনসুলভ বিবেকের স্বচ্ছ দৃষ্টি তিনি হারাইয়াছেন। দেবতার লীলা ও দানবের চক্রান্তের পার্থক্য তিনি ধরিতে। পারিতেছেন না

এবম্প্রকার বিশ্লেষণ করিবার পর তিনি সকাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"হে করুণাময় শম্ভো, বল, কি উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে এমন সংশয়ের মধ্যে ফেলেছ? আমার মনোলোকে নিরঞ্জনার মতো তপস্বিনীর আবির্ভাবও যদি বিপজ্জনক হয়, তা হ'লে আমার উপায় কি! কি করব আমি! কোনও একটা সঙ্কেত ক'রে তুমি আমাকে জানিয়ে দাও—এ তোমার লীলা, না, দানবের চক্রান্ত?"

শঙ্করের মহিমা দুর্বোধ্য। ভক্তের হৃদয়ে কোনরূপ আলোক-পাত করা তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। সন্দেহ-সাগরে নিমজ্জমান সাবর্ণি তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, নিরঞ্জনার চিন্তাকে আর তিনি মনে স্থান দিবেন না। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। নিরঞ্জনা নানারূপে বারম্বার তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। অধ্যয়নের সময়, ধ্যানের সময়, প্রার্থনা-কালে, চিন্তারত অবস্থায় সে আসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। মনে হইত, সে' যেন সশরীরে আসিয়াছে। আসিবার ঠিক পূর্বে সামান্য খস্‌খস্ শব্দ হইত—শাড়ি পরিয়া চলিলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা তেমনি শব্দ। তাহার আসিবার সময়ও একেবারে সুনির্দিষ্ট ছিল, একচুল এদিক ওদিক হইত না। যাহা বাস্তব তাহা স্থূল বলিয়াই তাহার প্রকাশ অসম্বদ্ধ এবং অস্থির। যাহা অবাস্তব তাহা সূক্ষ্ম বলিয়াই স্থির, অপরিবর্তনীয়।

নিরঞ্জনা নানা মূর্তিতে আসিয়া দেখা দিত। কখনও বিষণ্ণ—মাথায় রত্নখচিত মুকুট, জীমূতবাহনের বাড়িতে যে পোশাক পরিয়া গিয়াছিল অঙ্গে সেই পোশাক, ঈষৎ গোলাপী শাড়িতে উজ্জ্বল রূপার জরি; কখনও বা সে দেখা দিত কামোদ্দীপ্তা বারনারীর

বেশে—অঙ্গে বাতাসের মতো স্বচ্ছ বসন, শিলা-নিবাসের আলো-ছায়ার মায়ায় মোহিনী কুহকিনী; কখনও আবার দেখা দিত ভৈরবীর মূর্তিতে—গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনীর বেশে; কখনও ভয়াবহ করুণ মূর্তিতে—নয়নের দৃষ্টি মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন, নগ্নবক্ষ রক্তাপ্লুত, যেন তাহার ভগ্নহৃদয়ের রক্তধারা পীবর স্তনদ্বয়কে রঞ্জিত করিয়াছে। সাবর্ণি ভীত হইয়া পড়িতেন।

মহর্ষি সাবর্ণি সর্বাপেক্ষা বিপন্ন বোধ করিতেন যখন নিরঞ্জনার দগ্ধ বসনভূষণগুলি পুনরায় তাঁহার সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিত। যে সব অলঙ্কার, যে সব শাড়ি, যে সব ওড়না তিনি স্বহস্তে অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহারা যখন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে জীবন্তবৎ রূপায়িত হইত তখন তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ভাবিতেন, নির্জীব বস্তুরও কি আত্মা আছে, তাহারাও কি প্রেতরূপে দেখা দিতে পারে? মাঝে মাঝে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন—"মরে নি, মরে নি, কিছু মরে নি। নিরঞ্জনার অসংখ্য পাপের অসংখ্য নিদর্শন আবার বেঁচে উঠেছে, আমার কাছে ফিরে আসছে তারা—"

তিনি যখন ঘাড় ফিরাইতেন মনে হইত নিরঞ্জনা ঠিক তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে তিনি আরও অশান্ত হইয়া পড়িতেন। ক্রমশ তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটা আশা তাঁহার ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই সব প্রলোভন সত্ত্বেও তাঁহার দেহ এবং আত্মা অকলঙ্কিত আছে। তিনি শঙ্করকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন, "শঙ্কর, তোমার জন্যই আমি এত কষ্ট ক'রে নিরঞ্জনাকে খুঁজে আনবার জন্য পাপ পাটলিপুত্র নগরে গিয়েছিলাম। তোমার জন্যই—

নিজের জন্য নয়। তোমার জন্য এত করলাম, তবু আমাকে কষ্ট দিচ্ছ তুমি? এটা কি ন্যায় বিচার হচ্ছে? যা করেছি তোমার জন্যই করেছি। এজন্য আমাকে বিপন্ন ক'রো না করুণাময়, রক্ষা কর। সশরীরী নিরঞ্জনা যা পারে নি, অশরীরী নিরঞ্জনাকে দিয়ে তা করিও না। নিরঞ্জনার দৈহিক ঘনিষ্ঠতা আমাকে বিচলিত করতে পারে নি, তার কাছে আমি পরাভূত হই নি। তার ছায়া যেন আমাকে অভিভূত না করে, দেখো। একটা ঘোর বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে তা আমি বুঝতে পারছি। বাস্তবের চেয়ে স্বপ্ন যে বেশী শক্তিশালী তা আমি জানি। স্বপ্ন তো বাস্তবেরই সূক্ষ্ম রূপ, আত্মার স্বরূপও আমরা স্বপ্নের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ করি। বড় বড় ঋষিরাও স্বপ্নের শক্তির কথা স্বীকার করেছেন। পাটলিপুত্রে যে ধনীর পাষণ্ডদের ভোজন-উৎসবে তুমি আমার সঙ্গে গিয়েছিলে, সেখানে যারা তর্ক করেছিল তারা দুশ্চরিত্র হ'লেও মূর্খ নয়। তারা বলছিল—যা আমরা ধ্যানে নির্জনে চিন্তায় বা সমাধিতে প্রত্যক্ষ করি তা অলীক নয়, তা সত্য। শাস্ত্রেও স্বপ্নের মহিমা বহু স্থানে কীর্তিত হয়েছে। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে যে সব আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি তা বাস্তবেরই মতো সত্য, তা তোমারই লীলা। অবশ্য দানবের ষড়যন্ত্রও হতে পারে, কারণ দানবরাও শক্তিশালী, দানবরাও মায়াবী—"

মহর্ষি সাবর্ণির মধ্যে একটি নূতন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে তিনি শঙ্করের সহিত এ প্রকার ঘরোয়া আলোচনা করিতে পারিতেন না। আলোচনা সত্ত্বেও শঙ্কর কিন্তু তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন না। তাঁহার রাত্রিগুলি ক্রমশ স্বপ্নময় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং আরও কিছুদিন পরে

দিবারাত্রির প্রভেদও আর রহিল না। একদিন অতি প্রত্যূষে আতঙ্কিত হইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। মনে হইল, বুকের ভিতরটা কে যেন মুচড়াইয়া দিতেছে।....রাত্রে নিরঞ্জনা রক্তাক্তচরণে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াছিল। তাহার রক্তাক্তচরণ দেখিয়া তিনি যখন অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন, তখন প্রথমে সে তাঁহার শয্যার উপর বসিল, তাহার পর তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিল। শয়ন করিল! তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না যে, নিরঞ্জনার এই স্বপ্ন-অভিসার তাঁহার কলুষিত আত্মারই বিকার মাত্র। তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন যে, অপবিত্রতায় তাঁহার দেহ মন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শয্যাও আর পবিত্র নাই।

সঙ্কোভে সেই অপবিত্র শয্যা হইতে উঠিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তিনি মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টি হইতে দিবালোক অবলুপ্ত হইল। বহুক্ষণ তিনি মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার লজ্জার উপশম হইল না। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। সেই নিঃশব্দ কুটিরে বসিয়া সাবর্ণি অনুভব করিলেন, তিনি এখন সম্পূর্ণ একাকী, সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। নিবঞ্জনার ছায়ামূর্তিও কাছে নাই। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন, স্বপ্নের স্মৃতিটাকে ভুলাইয়া দিবার জন্য কিছু একটা কাছে থাকা দরকার। নিরঞ্জনার ছায়া-মূর্তিও হয়তো তাহা পারিবে। কিন্তু হায়, হায়, কেহ নাই। তিনি একান্তই একা।

নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কেন আমি তাকে ঠেলে ফেলে দিলাম না? কেন

তার হিমশীতল বাহু আর উত্তপ্ত জানু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম না ?…”

ওই অপবিত্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শঙ্করের নাম উচ্চারণ করিবার সাহস তাঁহার আর হইল না। মনে হইল, সমস্ত কুটিরটাই অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। এ কুটিরে শঙ্করের কৃপার আশা আর নাই, ইহা এইবার দানব আর পিশাচদের লীলাভূমি হইয়া উঠিবে। তাহারা এইবার যখন খুশী যতবার খুশী আসিবে, তাহাদের আর রোধ করা যাইবে না। তাঁহার আশঙ্কাই যেন মূর্ত হইয়া উঠিল যখন তিনি দেখিলেন যে, সাতটি ক্ষুদ্র শৃগাল একে একে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার বিছানার নীচে ঢুকিয়া গেল।…সন্ধ্যার সময় আর একটি আসিল। এটির গায়ের গন্ধ বিকট। পরদিন নবম শৃগাল দেখা দিল। তাহার পর আর একটি। সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।…ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট… আশীটি শৃগাল আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা সংখ্যায় যেমন বাড়িতে লাগিল, আকারে তেমনি ছোট হইতে লাগিল। অবশেষে সাবর্ণির মনে হইল, ওগুলি শৃগাল নয়, ইঁদুর। অসংখ্য ইঁদুর তাঁহার কুটিরের মেঝেতে, শয্যার নীচে, শয্যার উপরে চতুর্দিকে কিলবিল করিতেছে। একটি ইঁদুর তাঁহার শিবলিঙ্গের মাথার উপরও আরোহণ করিল, আরোহণ করিয়া স্পর্ধাভরে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। সে দৃষ্টি, যেন অগ্নিদৃষ্টি। মহর্ষি সাবর্ণি অস্থির হইয়া পড়িলেন।

তিনি অবশেষে স্থির করিলেন, এ-স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এই অপবিত্র কুটির ত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আর উপায় নাই। আত্মনির্যাতন ও প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এ

পাপের প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। স্থির করিলেন, দুরূহ তপস্যায় পুনরায় নিজেকে নিযুক্ত করিবেন। আত্মনির্যাতনের বিস্ময়কর শক্তির উপর তাঁহার আস্থা ছিল। তাঁহার আশা হইল, পাপের আশ্রয়ভূমি দেহটাকে বিধ্বস্ত করিলেই তিনি পাপমুক্ত হইবেন। এই কল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে তিনি প্রবীণ মহর্ষি শুভঙ্করের সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিলেন।

মহর্ষি তাঁহার শাকক্ষেতে জলসেচন করিতেছিলেন। সূর্য অস্ত গিয়াছিল। আকাশের ঘননীলে অস্তমান সূর্যের বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া যে অপরূপ পটভূমিকা সৃজন করিয়াছিল তাহা পবিত্রচেতা মহর্ষি শুভঙ্করের সঞ্চরমাণ চিত্রেরই যোগ্য। মহর্ষি শুভঙ্কর অতি সন্তর্পণে চলাফেরা করিতেছিলেন, কারণ তাঁহার কাঁধের উপর একটি বন্যকপোত বসিয়া ছিল। সাবর্ণিকে দেখিতে পাইয়া তিনি সহাস্যে সম্বর্ধনা করিলেন—

"আরে, সাবর্ণি নাকি! এস, এস। শঙ্করের কৃপায় আশা করি কুশলে আছ। পশুপতির কাণ্ড দেখ, আমার কাছে তিনি পশুপাখীর রূপ ধ'রেই আসেন বোধ হয়। আমার কাঁধের উপর দেখতে পাচ্ছ তো, আর কেউ নয়, স্বয়ং তিনিই। আমার তো অন্তত তাই মনে হয়। তা না হ'লে বনের পশু আকাশের পাখী আমার কাছে আসবে কেন? এই পাখীটিকে দেখ ভাল ক'রে, ওর ঘাড়ের কাছের পালকগুলির রঙ দেখেছ, ঠিক যেন সন্ধ্যার আকাশ। সামান্য একটা পাখীর পালকে কি মেঘের বিচিত্রবর্ণ দেখা যায়? ভাল ক'রে ভেব দেখ ব্যাপারটা। অদ্ভুত, নয়? প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টিতে তিনিই আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাই সব সুন্দর, সবই অদ্ভুত।

গাছের পাতা ফুল ফল পশু পক্ষী তুচ্ছ করবার কোন্‌টা বল ? সবই চমৎকার ! তিনি নিজেই সব। কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি কোন সদালাপ করবে ব'লে এসেছ। আমার আবোল-তাবোল শুনে হয়তো ঘাবড়ে যাচ্ছ। কিছু বলবে না কি ? ও, থাম তা হ'লে, কলসীটা রেখে আসি—"

মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহার পাটলিপুত্র গমন, পাটলিপুত্র হইতে প্রত্যাবর্তন, নিরঞ্জনা-উদ্ধার, তাহার পর দিবারাত্রি স্বপ্নে জাগরণে নিরঞ্জনার নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাব, এমন কি জঘন্য কাম-ক্লিন্ন স্বপ্নটির কথাও অকপটে শুভঙ্করের নিকট বর্ণনা করিয়া অসংখ্য শৃগালের আক্রমণের কথাও তাঁহাকে বলিলেন। কিছুই গোপন করিলেন না।

"মহর্ষি, এখন কি করি বলুন তো ? কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করাই কি এর একমাত্র প্রতিষেধক নয় ? তাই আমি স্থির করেছি গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ ক'রে অশেষ কৃচ্ছ্র সাধনা করব। তা হ'লে হয়তো দানবদের মায়াজাল ছিন্ন করতে পারব। আমার মাথায় তো আর কিছু আসছে না—"

মহর্ষি শুভঙ্কর উত্তর দিলেন—"দেখ ভাই, আমিও স্বল্পবুদ্ধি লোক। সারাজীবন বনে বনেই কাটিয়েছি। বনের পশুপাখীদের আমি চিনি, খরগোশ হরিণ ঘুঘু হরিয়াল এরা আমার পরিচিত। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কম। তবু আমার মনে হচ্ছে, দ্রুত স্থান পরিবর্তনের জন্যই তোমার চিত্ত বোধ হয় আন্দোলিত হয়েছে, আর সেই জন্যই ওই সব দেখছ। নগরের কোলাহল থেকে চট ক'রে অরণ্যের নীরবতায় ফিরে এসেছ ব'লেই সম্ভবত এখানে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পাচ্ছ না। তোমার আত্মা সেই

জন্ম ক্লিষ্ট হয়েছেন। হঠাৎ গরম থেকে ঠাণ্ডায় এসে শরীর খারাপ হয়ে যেমন সর্দি-কাশি হয়ে যায়, তোমার মনেরও তাই হয়েছে। তাই আমার মতে গভীরতর জঙ্গলে না ঢুকে তুমি বরং লোকালয়ে যাও, অবশ্য ভদ্র লোকালয়ে, তোমার মতো সাধুসন্ত যেখানে আছেন। কাছেপিঠে তো অনেক আশ্রম আছে শুনি। যা শুনি তাতে দু-একটি তো খুব ভাল ব'লেই মনে হয়। নাম-শ্লোকপন্থী ধূর্জটি-আশ্রমে শুনেছি প্রায় দেড় হাজার সাধু থাকেন। সাধকশ্রেষ্ঠ উপল-চরিত সেখানকার আশ্রমপতি। সেখানে সাধুরা প্রত্যেকে শিব বিষয়ক এক-একটি শ্লোককে অবলম্বন ক'রে থাকেন শুনেছি। কেউ কেউ আবার শিবের একটি নামকেই সম্বল ক'রে নিজের সাধনাকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নানা ধরনের সন্ন্যাসী আছেন সেখানে। এই আশ্রমটি তুমি দেখে এস একবার। একটু অন্য-মনস্কও হবে, শেখবার জিনিসও অনেক কিছু পাবে। গঙ্গার ধার দিয়ে যদি যাও অনেক মঠ, অনেক আশ্রম, অনেক তপোবন চোখে পড়বে। বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখে এস না সব। তোমার মতো বিদ্বান লোকের পক্ষে এ সব করা কর্তব্যও বটে। মহাতান্ত্রিক মহর্ষি বনস্পতি শৈব সাধুদের কর্তব্য বিষয়ে বিরাট একখানা বই লিখেছেন শুনেছি। তুমি তো লিখতে জান, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে বইখানা নকল ক'রে ফেল। মস্ত কাজ হবে একটা। আমি লিখতে জানলে নিশ্চয় এটা ক'রে ফেলতাম, কিন্তু আমি কোদাল ধরতে পারি, কলম ধরতে পারি না। তুমি লেখা-পড়া-জানা বিদ্বান লোক, তোমার কাজের অভাব কি! লেখাপড়ায় মন দিলে কি কোনও মন্দ চিন্তা ঘেঁষতে পারে? এই আশ্রমে মহর্ষি কারগুব ছিলেন, তিনি তো এখন শৈব জগতের সম্রাট, কৈলাসে

চ'লে যাবার আগে তিনিও বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন একটা—কারগুব-সংহিতা। সেইটেই টুকে ফেল না তুমি। তুমি কলম ধরতে পার, তোমার ভাবনা কি! ঘুরে বেড়াও, লেখাপড়ায় মন দাও, তা হ'লেই তোমার মনের শান্তি আবার ফিরে আসবে। তখন বনের নির্জনতাই আবার ভাল লাগবে। তখন তপস্যা ক'রো। শহরে গিয়েই তোমার মনটা চঞ্চল হয়েছে। মহর্ষি কারগুব বলতেন শুনেছি—বেশী উপবাস করা ভাল নয়। বেশী উপবাস মানুষকে দুর্বল করে, বেশী দুর্বলতা মানুষকে অকর্মণ্য ক'রে ফেলে। অনেকে লম্বা লম্বা উপবাস ক'রে অনর্থক নিজেদের দেহটাকে ক্ষীণ ক'রে ফেলে। এ তো নিজের বুকে ছোরা মেরে দানবদের হাতে আত্মসমর্পণ করা! মহর্ষি কারগুব এই সব কথা বলতেন। আমি মূর্খ মানুষ, আমি আর তোমাকে কি বলতে পারি! মহর্ষি কারগুব এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি আমাদের পিতার মতো। তাঁর কথাগুলো মনে ছিল, তাই তোমাকে বললাম—"

সাবর্ণি মহর্ষি শুভঙ্করকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার উপদেশগুলি তিনি প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। মহর্ষি শুভঙ্করের নল-খাগড়া-বিনির্মিত বাগানের বেড়া পার হইয়া তিনি পিছু ফিরিয়া দেখিলেন, শুভঙ্কর শান্তভাবে পুনরায় শাকের ক্ষেতে জল সেচন করিতেছেন। বন্যকপোতটি তাঁহার কাঁধের উপর ঠিক বসিয়া আছে। সাবর্ণির চোখে জল আসিয়া পড়িল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, কাঁদিয়া হৃদয়ভার লঘু করেন।

নিজের কুটিরে ফিরিয়া তিনি হতভম্ব হইয়া গেলেন। আপাত-দৃষ্টিতে যদিও মনে হইল অসংখ্য বালুকণায় তাঁহার কুটিরের অভ্যন্তর ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি বুঝিলেন,

এ সব বালুকণা নয়, অসংখ্য কীটাকৃতি শৃগাল, দানবদের অনুচর। সেই রাত্রে তিনি একটি অদ্ভুত স্বপ্নও দেখিলেন। দেখিলেন, যেন একটি সু-উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের উপর একটি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। যেন বলিতেছে—তুমিও এই স্তম্ভের উপর আরোহণ কর।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি নিজেকে বুঝাইলেন, এ স্বপ্ন ঈশ্বর-প্রেরিত। নিজের শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া তিনি তখন বলিলেন, "প্রিয় বৎসগণ, শঙ্করের আদেশে তোমাদের ছেড়ে আবার আমাকে বাইরে বেরুতে হচ্ছে। আমার অবর্তমানে পণ্ডিত হরানন্দকেই তোমরা গুরু ব'লে মান্য ক'রো। সরলমতি বালক বাঙ্কার প্রতিও একটু দৃষ্টি রেখো। তোমাদের আমি আশীর্বাদ করছি। সাবধানে থেকো। চললাম আমি—"

তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণত ছিল, যখন উঠিল দেখিতে পাইল মহর্ষি সাবর্ণি দূর দিগন্তে কৃষ্ণমূর্তিবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন।

মহর্ষি সাবর্ণি দিবারাত্রি হাঁটিতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে তিনি সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পাটলিপুত্রের পথে যাইতে যাইতে যেখানে তিনি রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। মন্দিরগাত্রে বহুবিধ চিত্র উৎকীর্ণ ছিল। ত্রিশটি বিরাট বিরাট স্তম্ভ তখনও মন্দিরটিকে বহন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মন্দিরের শেষে ছিল কেবল একটি একক স্তম্ভ। মন্দিরের সহিত তাহার কোন সংস্রব ছিল না। সুদূর অতীতে মন্দিরের সহিত কোনও কারণে তাহার যোগ ছিন্ন হইয়াছিল। স্তম্ভটির শীর্ষদেশে ছিল একটি রমণীর স্মিতানন। তাহার ললাটে

শশিকলা, গণ্ড দুইটি পুষ্ট, নয়নযুগল আয়ত। মনে হইতেছিল, দৃষ্টি হইতে একটা চাপা হাসি যেন উপচাইয়া পড়িতেছে।

স্তম্ভটি দেখিয়া সাবর্ণির মনে পড়িল, এই স্তম্ভটিই শঙ্কর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন। স্তম্ভটি প্রদক্ষিণ করিয়া আন্দাজ করিলেন, স্তম্ভটি উচ্চতায় প্রায় বত্রিশ হাত হইবে। মই না পাইলে উপরে উঠা যাইবে না। নিকটবর্তী এক গ্রামে গিয়া তিনি বড় একটি মই প্রস্তুত করাইলেন এবং মইয়ের সাহায্যে স্তম্ভশীর্ষে অবশেষে আরোহণ করিলেন। তাহার পর জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে শঙ্কর, তোমারই নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। তোমার কৃপা লাভ করবার জন্য যে কোন কৃচ্ছ্রসাধন করিতে আমি প্রস্তুত। আমাকে কৃপা কর প্রভু—"

তাঁহার সঙ্গে কোনও খাবার ছিল না। বিশ্বাস ছিল, শঙ্করই তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামবাসীদের ভক্তির উপরও তাঁহার আস্থা ছিল। দেখা গেল, তাঁহার আস্থা ভিত্তিহীন নহে। প্রভাতে প্রার্থনার পর গ্রামের নারীরা ও শিশুরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহার জন্য কিছু ফলমূল ও জল আনিয়াছিল। একটি বালক মইয়ের উপর চড়িয়া সে সব তাঁহাকে দিয়া আসিল।

এই ভাবে কয়েকদিন কাটিল। আহার জুটিতে লাগিল, কিন্তু স্তম্ভের উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইবার মতো স্থান ছিল না। মহর্ষি সাবর্ণি পা মুড়িয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এরূপ শ্রমসাধ্য নিদ্রায় শ্রান্তি তো দূর হয়ই না, বরং আরও বাড়িয়া যায়। প্রত্যূষে পাখীদের ডানার ঝাপটে তিনি সভয়ে চমকাইয়া জাগিয়া উঠিতেন।

যে ছুতার মিস্ত্রি তাঁহাকে মইটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, সে ধর্মভীরু লোক।

সাধু-সন্ন্যাসীদের সে চিরকাল খাতির-যত্ন করিয়া আসিয়াছে। মহর্ষি সাবর্ণির অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এই সাধু রৌদ্রে বৃষ্টিতে তো কষ্ট পাইবেনই, ঘুমের ঘোরে পড়িয়াও যাইতে পারেন। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্তম্ভের উপর কাঠের ছাতা এবং কাঠের বেড়া প্রস্তুত করিয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এরূপ অদ্ভুত সাধুর অপূর্ব কৃচ্ছ্র সাধনের কথা বেশীদিন চাপা রহিল না। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাহা ছড়াইয়া পড়িল, দলে ,দলে আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। স্তম্ভের পাদদেশে তাহারা সবিস্ময়ে উন্মুখ হইয়া সাবর্ণির দিকে চাহিয়া থাকিত।

ক্রমশ এ খবর সাবর্ণির শিষ্যগণেরও কর্ণগোচর হইল। তাহারা শুনিল, তাহাদের গুরুদেব এক অসাধারণ সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারাও সমবেতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ওই স্তম্ভের পাদদেশে কুটির নির্মাণ করিয়া থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। সাবর্ণি অনুমতি দিলেন। প্রত্যহ প্রভাতে বৃত্তাকারে স্তম্ভের চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া শিষ্যগণ গুরুর উপদেশ শুনিতে লাগিল।

মহর্ষি সাবর্ণি প্রায়ই তাঁহাদের বলিতেন—"তোমরা শিশুর মতো হবার চেষ্টা কর। স্বয়ং ভোলানাথ শিশুপ্রকৃতির। তোমরাও যদি শিশুর মতো হতে পার, ভোলানাথ প্রসন্ন হবেন, তোমাদের মুক্তির পথ সরল হবে। দেহজ পাপই সকল পাপের মূল। পিতা যেমন সন্তানের জন্মদাতা, দেহজ পাপ তেমনি সর্বপ্রকার পাপের

জন্মদাতা। অহঙ্কার, লোভ, আলস্য, ক্রোধ, ঈর্ষা—এ সবই ওই দেহজ পাপের প্রিয় সন্তান। পাটলিপুত্রে দেখে এলাম, ধনীরা বিলাসের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, সে স্রোত কর্দমাক্ত নদীর স্রোতের মতো। অনন্ত পঙ্কসমুদ্রের দিকে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—"

মহর্ষি সাবর্ণির কথা ক্রমশ আরও দূরে প্রচারিত হইল। সাধকশ্রেষ্ঠ উপলচরিত এবং মহর্ষি বনস্পতির কানেও কথাটা গেল। তাঁহারা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু প্রবল জনশ্রুতিকে শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিবেন স্থির করিলেন। মহর্ষি সাবর্ণি স্তম্ভশীর্ষ হইতে গঙ্গাবক্ষে তাঁহাদের নৌকার পাল দেখিয়া ভাবিলেন, শঙ্কর বোধ হয় অন্য তপস্বীগণের নিকট তাঁহাকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাই এই বৃদ্ধ তপস্বী যুগলকেও তাঁহার নিকট পাঠাইতেছেন। তপস্বী যুগল কিন্তু সাবর্ণির কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। দুইজনেই কিছুক্ষণ পরামর্শ করিলেন, তাহার পরে দুইজনেই এরূপ উদ্ভট কৃচ্ছ্রসাধনের নিন্দা করিয়া সাবর্ণিকে স্তম্ভের উপর হইতে নামিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"এভাবে তপস্যা করবার বিধি কোনও শাস্ত্রে নেই, সাধারণ বুদ্ধিও এর অনুমোদন করে না। অদ্ভুত কাণ্ড করেছ তুমি। নেমে পড়—"

মহর্ষি সাবর্ণি কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

উত্তরে কেবল বলিলেন—"সন্ন্যাসীর জীবনই তো অদ্ভুত জীবন। তার আবার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম আছে না কি? সন্ন্যাসীর আচরণ অসাধারণ হবেই। শঙ্করের ইঙ্গিতেই এই স্তম্ভে আরোহণ

করেছি। তিনি যতক্ষণ না নামবার ইঙ্গিত করছেন, ততক্ষণ নামব না।”

সাধকশ্রেষ্ঠ উপলচরিত এবং মহর্ষি বনস্পতি মৃদু হাস্য করিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। সাবর্ণির জনপ্রিয়তা কিন্তু বাড়িতে লাগিল। প্রতিদিন দলে দলে নূতন সন্ন্যাসীরা আসিয়া সাবর্ণির শিষ্যবর্গের সহিত যোগদান করিলেন। স্তম্ভের নিকট আরও অনেক কুটির নির্মিত হইল, অনেকে শূন্যেও কুটির নির্মাণ করাইলেন। সাবর্ণির অনুকরণে কোন কোন সাধু মন্দিরের অন্যান্য উচ্চ স্তম্ভগুলির উপরও বসবাস আরম্ভ করিতে উদ্যত হইলে বাকী সাধুরা তাহাদের ভৎ‍র্সনা করিতে লাগিলেন। সে জন্যও বটে এবং স্তম্ভের উপর বাস করা ক্লেশকর বলিয়াও অবশেষে তাঁহারা সে মতলব ত্যাগ করিলেন।

মহর্ষি সাবর্ণির খ্যাতি কিন্তু ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছিল। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রচুর তীর্থযাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল। বহু যাত্রী বহু দূর হইতে পদব্রজে আসিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িতেন। জনৈকা বুদ্ধিমতী বিধবা রমণী ইহার সুযোগ লইল। সে ছোটখাটো একটি ফলের দোকান আরম্ভ করিয়া দিল। জলও রাখিত। স্তম্ভের কাছে একটি রঙীন চাঁদোয়া খাটাইয়া, ফলের ঝুড়ি, জলের কলসী এবং মাটির গেলাস খুরি প্রভৃতি সাজাইয়া স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া সে যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিত—“টাটকা ফল, টাটকা ঠাণ্ডা জল—।” দোকান বেশ চলিতে লাগিল। তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একজন ব্রাহ্মণ ভাত রুটি তরকারি প্রস্তুত করিবার আয়োজনও করিয়া ফেলিল। স্তম্ভের নিকটে দেখিতে দেখিতে একটি পাকশালা ও

ভোজনশালা প্রস্তুত হইয়া গেল। জনসমাগমের বিরাম ছিল না, সুতরাং খরিদ্দারের অভাব হইল না। ইহার পর বড় বড় শহর হইতে ধনীরাও আসিতে আরম্ভ করিলেন। ধনীদের জন্য মহার্ঘতর ব্যবস্থাও হইতে লাগিল। শহর হইতে বড় বড় ব্যবসায়ীরা আসিয়া বড় বড় পান্থশালা নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতির জন্যও মন্দুরা প্রভৃতি নির্মিত হইল। স্তম্ভটিকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশ বেশ বড় একটি বাজার গড়িয়া উঠিল, মাছ-মাংস-তরকারি-বিক্রেতারা আসিয়া জুটিলেন এবং দোকান খুলিয়া খরিদ্দারদের ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। একটি চটুল-ভাষী ক্ষৌরকারও আসিয়া নিজের ব্যবসা ফাঁদিয়া ফেলিল। সে মাঠে বসিয়াই সকলের দাড়ি ছাঁটিত, চুল-নখ কাটিত এবং রসালাপ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিত। যে ভগ্নমন্দির এতকাল নীরব নিস্তব্ধ শান্তিপূর্ণ ছিল, হাস্যে কলরবে তর্কে গুজবে তাহা মুখরিত হইয়া উঠিল। মন্দিরের নিম্নভাগে যে অন্ধকার কক্ষগুলি ছিল ব্যবসায়ীরা সেগুলি অধিকার করিয়া বিপণিতে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল। বিপণির উপর বিপণির বিশেষত্বও বিজ্ঞাপিত হইল। অধিকাংশ বিপণি-শীর্ষে এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখা যাইতে লাগিল: উপরে মহর্ষি সাবাণর একটি ধ্যানমগ্ন চিত্র, আর তাহার নীচে লেখা রহিয়াছে, 'এখানে ভাল দ্রাক্ষাসব পাওয়া যায়—উৎকৃষ্ট মাধ্বী, গৌড়ী এবং পৈঠী সুরাও মিলিবে।' স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ মনোহারিণী তরুণীগুলির উপর পেঁয়াজ, রসুন, শুঁটকি মাছ এবং পাঁঠার রাং ঝুলিতে লাগিল। মন্দিরের পুরাতন বাসিন্দা ইন্দুরেরা দলবদ্ধ হইয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। মুণ্ডক, বক, কপোত, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি যে সব পক্ষী মাঝে মাঝে আসিয়া মন্দিরে বসিত অথবা

নীড় নির্মাণ করিত তাহারাও রান্নাঘরের ধূমে, মাতালদের চীৎকারে এবং ভৃত্যদের কলরবে ভীত হইয়া মন্দিরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উড়িয়া গেল। বন্য নির্জনতা আর রহিল না।

জনসমাগম ক্রমশ এত অধিক হইতে লাগিল যে, সকলে নাগরিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। স্থপতিবিদ্‌গণকে আহ্বান করা হইল। তাঁহারা স্তম্ভের চতুর্দিকে পাকা রাস্তা নির্মাণ করিতে লাগিলেন। পাকা বাড়ি এবং পাকা মন্দির প্রস্তুত করিবার জন্য রাজমিস্ত্রিরাও নিযুক্ত হইল। ছয় মাসের মধ্যে রীতিমত একটা শহর গড়িয়া উঠিল, শহরের সমস্ত সাজসজ্জা উপকরণ উপচার সংগৃহীত হইল। সৈন্যসামন্ত, বিচারালয়, কারাগার, চিকিৎসালয়, পাঠশালা কিছুই আর বাকি রহিল না।

অসংখ্য তীর্থযাত্রী আসিতে লাগিল। ধর্মজগতেই একটা সাড়া পড়িয়া গেল যেন। কেবল তীর্থযাত্রী নয়, বড় বড় শৈব পুরোহিত ও পণ্ডিতেরাও ভক্তিতে গদগদ হইয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। উত্তর প্রদেশের একজন প্রতাপশালী নৃপতি তাঁহার ধর্মযাজকদের লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহর্ষি সাবর্ণির দুরূহ তপশ্চর্যায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার অনুচরবর্গকেও মুগ্ধ হইতে হইল। সাধক-শ্রেষ্ঠ উপলচরিত এবং মহর্ষি বনস্পতি উক্ত নৃপতির শাসনাধীনে বাস করিতেন। নৃপতি মুগ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদের একটু অস্বস্তি হইল, অবশেষে তাঁহারা পুনরায় আসিয়া তাঁহাদের পূর্বোক্ত আচরণ ও উক্তির জন্য সাবর্ণির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহাদের বলিলেন—"ভাই, তোমরা বিশ্বাস কর, যে প্রচণ্ড প্রলোভন আমাকে সর্বদা আক্রমণ করছে তার তুলনায় আমার এ প্রায়শ্চিত্ত কিছু নয়। মানুষকে বাইরে থেকে বা দূর

থেকে দেখলে খুব ছোট দেখায়। শঙ্কর আমাকে যে স্তম্ভের উপর স্থাপন করেছেন সেখান থেকে মানুষদের ইঁদুরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই তো তারা ইঁদুর নয়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে বিচার করতে হয়, তখন বোঝা যায় মানুষ কত বড়, কত বড় তার সমস্যা। মানুষ পৃথিবীর মতোই বড়, কারণ সেই তো তার চেতনা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে ধ'রে রেখেছে। এখান থেকে আমি কত কি দেখতে পাচ্ছি! কত নূতন মানুষ, নূতন মন্দির, নূতন গৃহ, পান্থশালা, নদী, নৌকা, বিরাট সৈকত, পর্বত, শস্যক্ষেত্র, দূরের গ্রামগুলি। কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে যা আছে তার তুলনায় এ সমস্তই তুচ্ছ। আমার মধ্যে অসংখ্য নগরও আছে, অনন্ত মরুভূমিও আছে। আর তাদের আবৃত ক'রে রেখেছে পাপ আর মৃত্যু, রাত্রি যেমন পৃথিবীকে আবৃত করে, ঠিক তেমনি ভাবে। আমি শুধু জগৎ নই, কলুষিত জগৎ। তাই প্রায়শ্চিত্ত করছি—"

তিনি এ কথা বলিলেন, কারণ রিরংসা তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতেছিল।

এইভাবে ছয় মাস কাটিল। সপ্তম মাসে পাটলিপুত্র হইতে সুমতি এবং শারিকা নাম্নী দুইটি বন্ধ্যা প্রৌঢ়া রমণী সন্তানলাভের আশায় সার্বাণির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। জনশ্রুতি শুনিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, উক্ত স্তম্ভের স্পর্শ বিশেষ গুণ-সম্পন্ন, স্তম্ভের গুণে এবং মহর্ষি সার্বণির কৃপায় তাহারা নিশ্চয়ই জননীত্ব লাভ করিবে। তাহারা প্রায় উলঙ্গ হইয়া স্তম্ভের পাষাণে সর্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। ইহার পর হইতে ভীড় আরও বাড়িয়া গেল। নানা উদ্দেশ্য লইয়া নানা রকম নরনারী ক্রমশ জুটিতে

লাগিলেন। সাবর্ণি দেখিলেন, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর কেবল মানুষ আর মানুষ। অবিচ্ছিন্ন জনস্রোত। কেহ রথে, কেহ শিবিকায়, কেহ অশ্বে, কেহ বা পদব্রজে স্তম্ভ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। আর তাহাদের ভিতর রহিয়াছে ভয়াবহ কুৎসিত-দর্শন রোগীর দল। জননীরা অসুস্থ শিশুদের লইয়া আসিল—কাহারও হাত-পা বাঁকা, চক্ষু অন্ধ, মুখে সফেন লালা, কণ্ঠের স্বর কর্কশ। সাবর্ণি তাহাদের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া অন্ধের দল আসিল, মুখ উঁচু করিয়া সাবর্ণিকে তাহাদের রক্তাক্ত অক্ষিগহ্বর দেখাইল। অনড় অসাড় পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরা আসিল, সাবর্ণি তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিলেন। খঞ্জেরা তাহাদের ওই বিকৃত পদ তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কর্কটরোগাক্রান্ত নারীরা তাহাদের ক্ষতবিধ্বস্ত স্তন উন্মুক্ত করিয়া দেখাইল এবং আর্তস্বরে নিবেদন করিল, রোগ-শকুনি কি ভাবে জীবন্ত অবস্থায় তাহাদের ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাই-তেছে। শোথরোগাকান্ত স্ফীতকায় রোগীরাও স্তম্ভের পাদদেশে আসিয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল। যাহারা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, ভাল করিয়া চলিতে পারে না, তাহারাও লাঠির উপর ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্তম্ভের সমীপবর্তী হইল এবং তাহাদের সিংহবৎ মুখ তুলিয়া সাশ্রুনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। সাবর্ণি সব দেখিলেন, সব শুনিলেন এবং সকলের মঙ্গলের জন্য শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অনেকে আরোগ্য লাভ করিল। উজ্জয়িনী হইতে একটি তরুণীকে তাহার আত্মীয়স্বজনেরা শিবিকায় বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। তরুণীটি ক্রমাগত রক্তবমন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তাহার দেহ রক্তহীন, মুখ বিবর্ণ,

চক্ষু মুদিত ; আত্মীয়স্বজনেরা ভাবিয়াছিলেন, সে বোধ হয় মারাই গিয়াছে। সাবর্ণি তাহার জন্য প্রার্থনা করিতেই সে মাথা তুলিল, চক্ষু খুলিল।

এই ধরনের আশ্চর্যজনক সংবাদ দ্রুতবেগে দূরদূরান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ফলে, রোগীর ভীড় আরও বাড়িতে লাগিল। মৃগীরোগগ্রস্ত লোকেরা, এমন কি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকেরাও— চিকিৎসকেরা যাহাদের বহু পূর্বেই জবাব দিয়াছেন—তাহারাও আসিয়া হাজির হইল। সাবর্ণি স্তম্ভশীর্ষে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, স্তম্ভটি দেখিবামাত্র কোন কোন মৃগীরোগীর সমস্ত দেহ আক্ষিপ্ত হইতেছে, কেহ কেহ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, কাহারও বা ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ নানাভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত হইতেছে। মৃগী-রোগীদের দেখিয়া সাবর্ণির শিষ্যগণও বিচলিত হইলেন, অনেকে এত বিচলিত হইলেন যে মৃগীরোগীদের দেখিয়া তাঁহাদের দেহেও আক্ষেপ জাগিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যে তাঁহারাও উন্মত্তবৎ ওই সব রোগীদের নকল করিতেছেন। ক্রমে মৃগী-রোগীদের নকল করাটাই যেন মহর্ষি সাবর্ণির আশীর্বাদ আকর্ষণের উপায় হইয়া দাঁড়াইল। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই সাধু তীর্থযাত্রী, রোগী নিরোগ, স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিজেদের দেহকে নানাভাবে বাঁকাইয়া, ধূলায় লুটাইয়া, এমন কি মুঠা মুঠা ধূলা ভক্ষণ করিয়া স্তম্ভের চতুর্দিকে চীৎকার করিয়া সাবর্ণির করুণাকণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত পরিবেশটাই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মহর্ষি সাবর্ণি স্তম্ভের শীর্ষদেশ হইতে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। তিনি আকুলচিত্তে শঙ্করকে স্মরণ করিয়া বলিলেন—"প্রভু, ওরা

নিজেদের পাপের জন্য আমাকে দায়ী করছে। পাপমোচন করতে করতে আমি নিজে যে পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম! আমাকে রক্ষা কর—"

কোনও রোগী রোগমুক্তি হইলেই চতুর্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। তাঁহার শিষ্যগণ চীৎকার করিয়া লম্ফঝম্ফ করিতেন আর বলিতেন—"স্বয়ং বিশ্বেশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন এখানে। এ স্তম্ভ সাধারণ স্তম্ভ নয়, এ শিবলিঙ্গ—"

স্তম্ভগাত্রেও নানাবিধ বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ ঘটিল। খঞ্জেরা যে যষ্টি বগলে লাগাইয়া চলাফেরা করে সেরূপ বহু যষ্টি স্তম্ভগাত্রে ঝুলিতে লাগিল, নারীরা নিজেদের অলঙ্কার এবং মালা তাহাতে টাঙাইয়া দিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ শিববিষয়ক বহু শ্লোক স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করিলেন, বহু ব্যক্তি নিজেদের নামও খোদিত করাইলেন। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই স্তম্ভটি সংস্কৃত, ব্রাহ্মী, শৌরসেনী, পালি, প্রাকৃত, মাগধী, মৈথিলী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা ও বর্ণমালার সঙ্গমস্থল হইয়া উঠিল।

শিবরাত্রির সময় সেই অত্যাশ্চর্য স্তম্ভকে ঘিরিয়া এত ভীড় হইল যে, প্রাচীন বৃদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন—সত্যযুগ ফিরিয়া আসিয়াছে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র, সমতটবাসী জনতার সহিত কোশল, পাঞ্চাল, গান্ধার, উজ্জয়িনী, এমন কি চোল প্রদেশবাসী জনতার মিলন ঘটিল। তাহাদের প্রত্যেকের ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং পোশাকের বৈশিষ্ট্য সেই বিরাট সম্মিলনকে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিল। অবগুণ্ঠিতা ও অনবগুণ্ঠিতা, সুশ্রী ও কুশ্রী, যুবতী ও বৃদ্ধারা বিবিধ বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইয়া কেহ পদব্রজে, কেহ শিবিকারোহণে, কেহ বা গর্দভের পৃষ্ঠে চড়িয়া স্তম্ভটিকে পরিক্রমণ

করিতে লাগিলেন। জনতার চিত্তবিনোদন করিবার জন্য নর্তক-নর্তকীরা আসিল, বহু পালোয়ানও ভূমিতে বড় বড় কার্পেট পাতিয়া তাহার উপর কুস্তি শুরু করিয়া দিল, জনতা বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল। কোথাও সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জনের প্রয়াস পাইল। বিরাট জনতা বিরাটরূপে মূর্ত হইল। অর্থ এবং শস্ত্রের ঝনৎকার, বিবিধ ভাষার কলহ, বিবিধ প্রকার বেশের বৈচিত্র্য, ধূলি ধূম সঙ্গীত ও চীৎকারের সংমিশ্রণ যে অপূর্বতার সৃষ্টি করিল তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। শব্দরূপী ব্রহ্ম সেখানে যেন বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। উষ্ট্র এবং অশ্ব-পরিচালকদের গালাগালি, দোকান-দারদের বাঙ্ময় বিজ্ঞাপন, দৈব ঔষধ ও মাদুলী-বিক্রেতার উচ্চ কণ্ঠস্বর, সন্ন্যাসীদের উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ, বিফলমনোরথ নারীদের করুণ আর্তনাদ, ভিক্ষুকদের কলরব, ছাগল-ভেড়া-গাধাদের কর্কশ চীৎকার মিলিয়া এমন এক বিপুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল যে মদ্রদেশবাসী তক্রবিক্রেতাদের তীক্ষ্ণকণ্ঠও মাঝে মাঝে তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

এই বিপুল জনতার মাথার উপর ছিল নির্মেঘ রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ, আর সে আকাশে ভাসিতেছিল বহু প্রকার গন্ধ। নারীদের প্রসাধনজনিত গন্ধ, অসুস্থ ও অসভ্যদের গায়ের দুর্গন্ধ, পাকশালার গন্ধ, ধূপধুনার গন্ধ। সাবর্ণির জন্য বহু স্থান হইতে বহু লোক বহু প্রকার ধূপ ধুনা চন্দন ও গুগ্গুল আনিয়াছিলেন এবং অহোরাত্র সেগুলি পোড়াইতেছিলেন।

রাত্রির দৃশ্য আরও অদ্ভুত। মশাল ও নানারূপ দীপালোকে সমস্ত স্থানটা রক্তাভ হইয়া উঠিত। জনতার লোকগুলিকে মনে

হইত কৃষ্ণকায় ছায়ামূর্তি। সেই রক্তাভ অন্ধকারে কোথাও বা দেখা যাইত একদল লোক গুঁড়ি মারিয়া নিবিষ্টচিত্তে গল্প শুনিতেছে। তাহাদের সম্মুখে এক ঋজুদেহ বৃদ্ধ বসিয়া অঙ্গভঙ্গী-সহকারে এক উদ্ভট গল্প ফাঁদিয়াছেন—কি করিয়া এক ডাইনী একবার তাঁহার হৃদয় চুরি করিয়া আমগাছের ভিতর পুরিয়া দিয়া অবশেষে তাঁহাকে এক হৃদয়হীন বাবলাগাছে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার অঙ্গভঙ্গীর দীর্ঘ ছায়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিস্মিত ও আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিল। কোথাও মাতালেরা কোলাহল করিতেছিল, কোথাও নর্তকীরা রঙ মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া লম্পটদের লইয়া নাচগানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক যুবক পাশাখেলায় মাতিয়াছিল। অনেক বৃদ্ধ রূপজীবাদের পিছু পিছু ঘুরিতেছিল। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছায়ালোকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ছিল সেই বিরাট স্তম্ভ। স্তম্ভশীর্ষে উৎকীর্ণা স্মিতাননা সেই নারীটি যেন হাসিমুখেই সব দেখিতেছিল। আর স্তম্ভের উপরিভাগে বসিয়া ছিলেন মহর্ষি সাবর্ণি, স্বর্গমর্ত্যের সন্ধিস্থলে।

অনেক রাত্রে সহসা আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া চন্দ্রোদয় হইল। দিগন্তনিবদ্ধ ঈষৎ বক্র জাহ্নবীধারাকে রূপসী রমণীর বাহুর মতো দেখাইতে লাগিল। তীরবর্তী নীল পর্বতমালাকে জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ মনে হইতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন মখমলের কোমলতা ও নীলার দ্যুতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। সাবর্ণি জাহ্নবীধারার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার মনে হইল, নিরঞ্জনার লীলায়িত বাহুটিই যেন রাত্রির নীলাঞ্চলের আড়ালে দেখা যাইতেছে।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। সাবর্ণি স্তম্ভের উপরই বসিয়া রহিলেন। বর্ষাকাল আসিল। সামান্য দারুনির্মিত আবরণ বর্ষার মুষলধারা রোধ করিতে পারিল না, তাঁহার সর্বাঙ্গ প্লাবিত হইতে লাগিল। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে তাঁহার চর্ম ইতিপূর্বেই শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া গিয়াছিল, বর্ষার জল পড়িয়া সেগুলি বড় বড় ক্ষতে পরিণত হইল। শীতে এবং ঠাণ্ডাতেও তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিলেন, তাঁহার হস্তপদ অসাড় অবশ হইয়া আসিল। কিন্তু নিরঞ্জনাকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারিলেন না। কামনাকীট তাঁহার হৃদয় কুরিয়া কুরিয়া খাইতে লাগিল।

তিনি কাতরহৃদয়ে কেবল প্রার্থনা করিতেন—"হে শঙ্কর, এখনও কি আমার যথেষ্ট শাস্তি হয় নি? আর কত প্রলোভন, কত কুৎসিত চিন্তা, কত ভীষণ কামনা আমার মনে জাগাবে প্রভু? শাস্তি যদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে তা হ'লে ঘৃণ্যতম কামনার কর্দমে আমার মনকে আরও ডুবিয়ে দাও, আমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হোক। অনেকে বলেন, কামুক ছাগ কামনার মূর্ত প্রতীক ব'লেই বলির পশুরূপে নির্বাচিত হয়। আবার অনেকে বলেন, সে সকলের কামনার বোঝা বহন ক'রে যূপকাষ্ঠে আত্ম-বলিদান দেয়। সে ঘৃণ্য পশু নয়, নমস্য। আগে এ সব কথা আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন মনে হয়, কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। নিজের অন্তরেই এর সত্যতা অনুভব করছি। বিরাট গহ্বরে নিক্ষিপ্ত আবর্জনার মতো ইতর সাধারণের অসংখ্য পাপ সন্ন্যাসীদের অন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়ে তার আত্মাকে কলুষিত ক'রে তোলে। এত লোকের পাপ, এত কামনা, এত রিরংসা তাদের অন্তরে এসে পুঞ্জীভূত হয় যে, তাদের মাথার ঠিক থাকে না। আমার তাই

হয়েছে। প্রভু, তোমার বিধানেই যদি আমার এমন হয়ে থাকে, তবে তাই হোক, আমাকে নরককুণ্ডে পরিণত কর—"

জনতার মধ্যে হঠাৎ এক গুজব উঠিল, পাটলিপুত্রের রণতরী-অধ্যক্ষ জীমূতবাহন সাবর্ণি-সন্দর্শনে আসিতেছেন। এ কথা সাবর্ণির কর্ণগোচর হইল। ইহাও শোনা গেল যে, তিনি বেশীদূরে নাই, তাঁহার ময়ূরপঙ্খীর পাল গঙ্গাবক্ষে দেখা যাইতেছে।

সংবাদটি মিথ্যা নয়। বৃদ্ধ জীমূতবাহন রাজকীয় কর্তব্যের অনুরোধে গঙ্গানদী ও গঙ্গানদীর খালসমূহ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন সাবর্ণির অলৌকিক কাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কথাটা প্রথমে তিনি বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। তাহার পর আর এক স্থানে গিয়া কথাটা আবার শুনিলেন। এবার শুনিলেন, স্তম্ভকে ঘিরিয়া সাবর্ণিপুর নামে একটা নগরই নাকি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। তিনি স্থির করিলেন, সাবর্ণিকে ঘিরিয়া যে নগর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া আসিবেন। নৌবহর সজ্জিত হইল, একদা প্রভাতে তিনি সাবর্ণিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গার তীর হইতে সাবর্ণিপুর একটু দূরে অবস্থিত। তরণী হইতে অবতরণ করিয়া তিনি তাঁহার সহকারী লেখক শিখরনাথ এবং চিকিৎসক সুরসেনকে সঙ্গে লইয়া সাবর্ণি-সন্দর্শনে চলিলেন। তাঁহার পিছনে তাঁহার দেহরক্ষীগণ সারিবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের পোশাকের ও অস্ত্রশস্ত্রের আড়ম্বরে সকলে চমকিত হইয়া গেল।

স্তম্ভের নিকটে আসিয়া জীমূতবাহন ঊর্ধ্বমুখে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্যাপারটা তাঁহার নিকট বড়ই অদ্ভুত

ঠেকিল। জীমূতবাহন কেবলমাত্র যোদ্ধাই ছিলেন না, গ্রন্থকারও ছিলেন। জলযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও আরও নানা রকম গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক রকম অভিজ্ঞতাও ছিল। জীবনে কত প্রকার অদ্ভুত জিনিস দেখিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া একটি গ্রন্থ রচনা করিবার বাসনা তাঁহার অনেক দিন হইতেই ছিল। সাবর্ণিকে দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল।

মাথার ঘাম মুছিয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, এই সেই। কি আশ্চর্য! ভদ্রলোক আমারই বাড়িতে একদিন রাত্রে এসে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন প্রায় এক বছর আগে। তার পরদিন শোনা গেল, একজন নামজাদা অভিনেত্রীকে নিয়ে স'রে পড়েছেন পাটলিপুত্র থেকে—"

লেখক শিখরনাথের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "ওহে, এ কথাটা লিখে নাও তুমি। আর এই থামটার মাপজোকও সব টুকে নাও। থামের মাথায় যে হাস্যবদনা নারীমূর্তিটি আছে সেটির কথাও লিখতে ভুলো না। কি আশ্চর্য!"

পুনরায় কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, "সবাই বলছে ভদ্রলোক এক বৎসর ধ'রে এই থামের উপর চ'ড়ে ব'সে আছেন। একবারও নামেন নি। সুরসেন, এ কথা বিশ্বাস কর তুমি? এ কি সম্ভব?"

সুরসেন বলিলেন, "নির্বোধ অথবা অসুস্থ লোকের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু দেহ মন যার সুস্থ সে এ ভাবে ব'সে থাকতে পারবে না। এ ধরনের অসুস্থ লোকেরা, মানে পাগলেরা, এক রকম অসাধারণ শক্তিরও অধিকার হয়। সাধারণ সুস্থ মানুষদের সে রকম শক্তি থাকে না। তবে কি জানেন, কে সুস্থ কে অসুস্থ তা ঠিক করাও

শক্ত। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম। প্রত্যেকের মনের গঠন, দেহের গঠন আলাদা আলাদা। চিকিৎসাশাস্ত্র প'ড়ে আর বহুরকম লোক দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে, প্রতিটি লোক স্বতন্ত্র একটা জগৎ যেন। এমন কতকগুলো রোগও আছে যে মনে হয়, ভাল কবিতার মতো তারাও ছন্দের নিয়ম মেনে চলে। সবিরাম জ্বরের কথাই ধরুন না, ঠিক সময়ে ছেড়ে যায়। আবার কোন কোন রোগ মানুষের চরিত্রই বদলে দেয়। কারও চিত্তবৃত্তি তীক্ষ্ণতর হয়, কারও বা ভোঁতা হয়ে যায়। কাঞ্চনকে চেনেন তো? বাল্যকালে অত্যন্ত বোকা ছিল সে। একদিন সিঁড়ি থেকে প'ড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগল, আর অমনি তার বুদ্ধিও খুলে গেল, চরিত্রও বদলে গেল। সে এখন বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী একজন। এই সন্ন্যাসীরও তেমন কিছু হয়েছে বোধ হয়। ভদ্রলোক কোথাও কোন চোট খেয়েছেন—হয় শরীর, না হয় মনে। তা ছাড়া ওই থামের উপর ব'সে থাকাটা আপনি অসম্ভবই বা মনে করেছেন কেন? অনেক সন্ন্যাসীই তো স্থাণু হয়ে থাকতে পারেন। বাল্মীকির গল্পটা মনে করুন না।"

জীমূতবাহন বলিলেন, "কিন্তু এ যে বিদঘুটে কাণ্ড হে! থামের উপর চ'ড়ে ব'সে আছে! কি আশ্চর্য! নিষ্কর্মা হয়ে ব'সে থাকাটাই তো আমি অস্বাভাবিক মনে করি। সুস্থ মানুষ খাটবে-খুটবে, দৌড়ঝাঁপ করবে, হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাকবে কেন? এতে নিজের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি। ধর্মবিশ্বাসের ফলে এ রকম হয়েছে বলছ? ওই স্তম্ভটা কি শিবলিঙ্গের প্রতীক? তা-ই যদি হয়, এ রকম কাণ্ড আর কোন শৈবকে তো করতে দেখি না। শিবমন্দিরে ধ্যানস্থ হয়ে অনেককে ব'সে থাকতে দেখেছি,

শিবের সঙ্গে অনেকে কথা বলেন এও শুনেছি। কিন্তু ঠিক এ রকমটা কখনও দেখিও নি, শুনিও নি। আশ্চর্য ব্যাপার! রাজপুরুষ হিসাবে কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, প্রত্যেকে যাতে নির্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্ম পালন করতে পারে, তাই বরং আমাদের দেখা কর্তব্য। ধর্ম কি, তা নিয়ে মাথা ঘামাবারও দরকার নেই আমাদের। লোকে যেটাকে ধর্ম ব'লে মেনে নিয়েছে, তা ভাল মন্দ যাই হোক, সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে জনসাধারণকে তুষ্ট রাখাই উচিত। জনসাধারণকে চটিয়েও লাভ নেই, ঘাঁটিয়েও লাভ নেই। ওদের কুসংস্কারগুলোকে এড়াবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে ওদের না ঘাঁটানো। এ ক্ষেত্রেও তাই করা যাক। উনি থামের উপর ব'সে স্বর্গের স্বপ্ন দেখুন আর কাক বক শালিক তাড়াতে থাকুন, ও নিয়ে আমরা মাথাই ঘামাব না। এ সম্বন্ধে যেটুকু খবর জানা গেছে, সেইটুকু লিখে রাখব কেবল।"

একবার কাশিয়া এবং আর একবার কপালের ঘাম মুছিয়া তিনি শিখরনাথকে বলিলেন, "লেখ, কোন কোন শৈব সাধু অভিনেত্রীকে নিয়ে স'রে পড়াটাকে সাধনার অঙ্গ ব'লে গণ্য করেন। সম্ভবত অভিনেত্রীরা উত্তরসাধিকারূপে ব্যবহৃত হন। কিন্তু ব্যাপারটা ওঁকে জিজ্ঞাসা করাই তো ভাল—"

তিনি মুখ উঁচু করিয়া সাবর্ণির দিকে চাহিলেন এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সূর্যের তীব্র কিরণ হইতে নিজের চক্ষু আড়াল করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "মহর্ষি সাবর্ণি, আপনি একদিন আমার আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন—এ ঘটনা যদি আপনার স্মরণ থাকে তা হ'লে দয়া ক'রে আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি এখানে কি করছেন? থামের উপর চড়লেন কেন, কেনই বা ওখানে

ব'সে আছেন? শিবলিঙ্গের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কি?"

সাবর্ণি জানিতেন, জীমূতবাহন বৌদ্ধ। তাই তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রধান শিষ্য পণ্ডিত হরানন্দ অগ্রসর হইয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আমি যতটুকু জানি তা বলবার যদি অনুমতি দেন—"

"আপনি কে?"

"আমি ওঁর শিষ্য একজন।"

"বেশ, কি জানেন বলুন?"

"আমাদের গুরুদেব পৃথিবীর দুঃখের ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়ে তাকে ব্যাধিমুক্ত করছেন। ওঁর কৃপায় বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সেরেছে। অনেক পাগল, অনেক মৃগীরোগী ওঁর দর্শন-মাত্রেই সুস্থ হয়েছে—"

জীমূতবাহন চিকিৎসক সুরসেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শুনছ সুরসেন, উনি সাধারণ সাধু নন। চিকিৎসাও করেন তোমার মতো। এ রকম উচ্চপ্রতিষ্ঠিত সহকর্মীর সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?"

সুরসেন মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কোনও কোনও রোগ উনি সারিয়ে থাকতে পারেন—এ আর বিচিত্র কি! যেমন মৃগী বা অপস্মার ব্যাধি, যাকে লোকে দৈব ব্যাধি বলে, তা উনি সারিয়েছেন হয়তো। সব ব্যাধিই অবশ্য দৈব, কারণ দেবতারাই ব্যাধির সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এই বিশেষ ব্যাধিটির উদ্ভব মানুষের মনোলোকে। এই সন্ন্যাসী নারী-মুণ্ডশোভিত স্তম্ভশীর্ষে ব'সে অপস্মার-রোগীর মনকে যতটা

প্রভাবিত করতে পারবেন, আমি তা পারব না। আমার বিদ্যা খল আর নোড়ায় নিবদ্ধ। যুক্তি আর বিজ্ঞানের চেয়েও প্রবলতর শক্তি পৃথিবীতে আছে—"

"আছে না কি! সে শক্তির নাম?"

"অযুক্তি এবং অজ্ঞান।"

জীমূতবাহন হাসিয়া উঠিলেন।

"সে যাই হোক, এর চেয়ে আশ্চর্য জিনিস আমি খুব কমই দেখেছি। আশা করি, কোন কবি এ নিয়ে কাব্য লিখবেন বা কোন ঐতিহাসিক সাবর্ণিপুর প্রতিষ্ঠার সত্য ইতিহাস রচনা করবেন। আমার কিন্তু সময় নেই, নানা কাজ বাকি এখনও, এ নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করতে পারি না। এখন আমাকে গঙ্গানদীর খালগুলি পরিদর্শন করতে হবে। যত অদ্ভুতই হোক না কেন, এখানে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। চল, ফেরা যাক এবার। মহর্ষি সাবর্ণি, নমস্কার, চললাম আমি। আপনি যদি কোনদিন থামের উপর থেকে নামেন আর পাটলিপুত্রে যান, তা হ'লে আমার বাড়িতে নিশ্চয় যাবেন, নিমন্ত্রণ ক'রে গেলাম—"

সাবর্ণির শিষ্যগণ উপরোক্ত কথাগুলি শুনিলেন এবং বিশ্বাসী ভক্তদের মুখে মুখে সেগুলি চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন। সাবর্ণির মহিমা ইহাতে আরও যেন বাড়িয়া গেল। জীমূতবাহনের কথাগুলি এমন অতিরঞ্জিত হইয়া, এমন রূপকে অলঙ্কৃত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল যে, দেশে তিনি অবতাররূপে কীর্তিত হইতে লাগিলেন। জীমূতবাহন সাবর্ণিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—এই সাধারণ ব্যাপারটি ভক্তদের মুখে ব্যাখ্যাত হইয়া অসাধারণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিলেন, রাজসিকতা আধ্যাত্মিকতার দিকে যে

অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করে ইহা তাহারই নিদর্শন। রাজসিকতার শিখরে আরোহণ করিয়া বৃদ্ধ জীমূতবাহন তাই মহর্ষি সাবর্ণির সান্নিধ্য কামনা করিতেছেন। সত্য ঘটনার উপর নানারকম রঙও চড়িল। যাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্ক রঙ চড়াইলেন, তাঁহারা নিজেরাই তাহা আবার বিশ্বাসও করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ এ কথাও বলিলেন যে, জীমূতবাহন যখন ঘর্মাক্ত কলেবরে উর্ধ্বমুখ হইয়া সাবর্ণির কৃপাপ্রার্থনা করিতেছিলেন তখন স্বর্গ হইতে একটি অপ্সরী নামিয়া আসিয়া নাকি তাঁহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেছিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহার সহকারী লেখক শিখরনাথ এবং চিকিৎসক সুরসেনও নাকি সাবর্ণির নিকট দীক্ষা লইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন। দুই-একজন শিবপুরাণকার ঘটনাটিকে সত্য মনে করিয়া নিজেদের পুথিতে টুকিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে সমস্ত ভারতবর্ষে মহর্ষি সাবর্ণির নাম তো ছড়াইয়া পড়িলই, এশিয়ার অন্যান্য অংশ এবং ইয়োরোপের লোকেরাও শুনিল যে ভারতবর্ষে গঙ্গাতীরবর্তী এক স্তম্ভের উপর ভগবানের নূতন অবতার অবির্ভূত হইয়াছেন। তাহারা সবিস্ময়ে কথাটা বিশ্বাস করিল। পৃথিবীর ধর্মজগতে একটা আলোড়ন পড়িয়া গেল। বিভিন্ন দেশের ধর্মযাজকেরা, এমন কি রাজদূতেরাও, মহাসমারোহে সাবর্ণিপুর সমাগত হইলেন এবং মহর্ষি সাবর্ণিকে বিভিন্ন রাজাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া গেলেন।

একদিন রাত্রে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। স্তম্ভের চতুর্দিকে মুক্ত আকাশতলে সমস্ত নগরী যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন সাবর্ণির কানে কানে কে যেন বলিল—"সাবর্ণি, তুমি তো এখন জগদ্বিখ্যাত বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ হয়েছ। শঙ্কর নিজের মহিমা প্রচার করবার

জন্যে তোমাকে অসাধারণ শক্তি দান করেছেন। তুমি এখন অসাধ্য সাধন করছ। ইচ্ছে করলে তুমি আরও অনেক কিছু করতে পার। আরও অনেক দুরারোগ্য রোগী সারাতে পার, নাস্তিককে আস্তিক করতে পার, বড় বড় পণ্ডিতদের পরাস্ত করতে পার, ইচ্ছে করলে সমস্ত পৃথিবীকেই শৈবধর্মে দীক্ষিত করতে পার। তোমার ক্ষমতা অসীম।"

"শঙ্কর আমাকে যা করাচ্ছেন তাই করছি। যা করাবেন তাই করব।"

উত্তরে শুনিলেন, "তুমি ওঠ। পাটলিপুত্রের প্রাসাদে গিয়ে রাজাকে বল, হিন্দু সন্তান হয়ে তুমি বৌদ্ধধর্ম আঁকড়ে আছ কেন? দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা না ক'রে সাধারণ-মানুষ বুদ্ধের পূজা করছ কোন্ বুদ্ধিতে? তুমি যাও। তুমি গেলেই রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার আপনি খুলে যাবে, তোমার খড়মের শব্দে রাজার স্বর্ণসদন কম্পিত হয়ে উঠবে, রাজা নতমস্তকে তোমার কাছে এসে দীক্ষা গ্রহণ করবেন। তুমিই তখন প্রকৃতপক্ষে মগধের রাজা হবে। তারপর ক্রমশ কোশল, ইন্দ্রপ্রস্থ, কাঞ্চী, মধ্যপ্রদেশ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, গান্ধার, চোল, চেদি সকলেই একে একে তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। সমস্ত ভারতেরই একচ্ছত্র সম্রাট হবে তুমি তখন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজারা তোমারই অধীন হয়ে থাকবেন। তুমি তখন ভারতের সকল ক্ষুধিতকে অন্ন দেবে, সকল অসুস্থকে সুস্থ করবে। ওই জীমূতবাহন তখন তোমার পদপ্রক্ষালন করতে পেলে নিজেকে সম্মানিত মনে করবেন। তোমার মৃত্যুর পর তোমার বসন পাদুকা ভস্ম অস্থি প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে বড় বড় মন্দির নির্মিত হবে। বড় বড় পুরোহিত, বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড়

তপস্বীরা তোমার প্রদর্শিত পথে চ'লে ক্রমশ তোমার মহিমাকে যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত ক'রে দেবেন। তুমি ওঠ, যাও—"

সার্বর্ণি উত্তর দিলেন, "শঙ্কর আমাকে যা করাবেন তাই করব।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নামিবার চেষ্টা করিলেন।

সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বর বলিয়া উঠিল, "সামান্য লোকের মতো তুমি মই বেয়ে নামবার চেষ্টা করছ কেন? তুমি তো অসামান্য শক্তিধর। দেবদূতের মতো তুমি শূন্য দিয়ে উড়ে যাও। তুমি উড়ে যেতে পারবে। লাফিয়ে পড়। শঙ্কর আছেন তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন, তিনি এই চান—"

সার্বর্ণি উত্তর দিলেন, "শঙ্করের যদি তাই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তাই হোক।"

সার্বর্ণি তাঁহার শীর্ণ হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া দিলেন। মনে হইতে লাগিল এক বিরাটকায় শীর্ণ পক্ষী যেন ডানা মেলিয়াছে। তিনি লাফাইতে যাইবেন এমন সময় একটা চাপা খিলখিল হাসি শুনিতে পাইলেন।

"ও রকম হাসছে কে?"

"আমি"—সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ ধ্বনিত হইল, "তোমার সঙ্গ এখনও ছাড়ি নি বন্ধু। আশা ক'রে আছি আরও ঘনিষ্ঠতা হবে আমাদের। আমিই তো তোমাকে চালাচ্ছি—আমিই তোমাকে থামের উপর চড়িয়েছি, আমার নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রে আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছ তুমি। সত্যি, সার্বর্ণি, খুব খুশী করেছ আমাকে।"

সার্বর্ণি এবার বুঝিতে পারিলেন।

সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দূর হও—দূর হও। তোমাকে চিনেছি আমি। তুমি মার, তুমি মায়া, তুমি শয়তান। শিবের তপোভঙ্গ করবার জন্য তুমিই মদনকে প্ররোচিত করেছিলে।"

সাবাণ হতাশ-হৃদয়ে পাষাণময় স্তম্ভশীর্ষে পুনরায় বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমি একে আগে চিনতে পারি নি কেন! যে সব অন্ধ বধির পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক আমার কৃপার আশায় এসে এখানে রোজ ভীড় করে, তাদেরই মতো আমি অন্ধ বধির পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি না কি! দেখছি আমার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়েছে, সূক্ষ্মভাব আর আমি ধরতে পারছি না, দেবতা-দানবের পার্থক্য বোঝবার শক্তিও আমার লোপ পেয়েছে। পাগলেরও অধম হয়ে গেছি আমি। নরকের কোলাহল আর স্বর্গের সঙ্গীত আমার কানে একই রকম শোনাচ্ছে। সদ্যোজাত শিশুকে মাতৃস্তন থেকে সরিয়ে নিলে কেঁদে ওঠে, সামান্য কুকুরও সহজবুদ্ধিবলে তার প্রভুকে অনুসরণ করে, ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদও সহজাত প্রেরণায় আলোর দিকে শাখা বাড়ায়। আমি তাও পারছি না, আমার সহজবুদ্ধিও ভ্রংশ হয়েছে। আমি এখন পাপের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। পাপের প্ররোচনাতেই এই থামের উপর উঠেছিলাম, আর আমার সঙ্গে বিলাস এবং অহমিকাও উঠে এসে আমার দু পাশে ব'সে ছিল প্রলোভনকে আমার ভয় নেই, ইতিপূর্বে অনেক তপস্বী এর চেয়ে বেশী প্রলোভনের কবলে পড়েছেন। আমি বরং কামনা করি শঙ্করের সামনে প্রলোভনের খড়্গ আমাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলুক। কৃচ্ছ্রসাধন করতে করতে আমার মৃত্যু হোক আপত্তি নেই, ওতে আমি আনন্দ পাব। কিন্তু শঙ্কর কই? তাঁর যে

কোনও সাড়া পাচ্ছি না, কোনও চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না! তিনি কি তা হ'লে আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন? তিনিই যে আমার একমাত্র ভরসা, একমাত্র গতি। কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনি আমার কাছে নেই। ভয়ঙ্কর প্রলোভনের মধ্যে আমাকে নিক্ষেপ ক'রে তিনি দূরে চ'লে গেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে ছেড়ে তো থাকতে পারব না। আমি তাঁর পিছু পিছু ছুটব। এই স্তম্ভের উপর ব'সে থাকা চলবে না। অসহ্য মনে হচ্ছে। এর স্পর্শে আমার অঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে। আর এখানে থাকব না, শঙ্করের কাছে যাব, তাঁকে আবার ধরব—"

তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মই দিয়া নামিতে শুরু করিলেন। এক ধাপ নামিয়াই তাঁহাকে পাষাণে খোদিত সেই স্মিতাননা নারীমুণ্ডটির সহিত মুখামুখি হইতে হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সে যেন আর একটু হাসিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, তিনি এতদিন তপস্যার ছলে কামনার আসনে বসিয়া নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কীর্তির মধ্যে কিছুমাত্র মহত্ত্ব নাই, তাহা কীর্তি নয়—কলঙ্ক, তাহা দানবীয় ষড়যন্ত্র মাত্র। তিনি তাড়াতাড়ি নামিতে লাগিলেন। মাটির উপর নামিয়া তাঁহার পা দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বহুকাল তাহারা মৃত্তিকার স্পর্শ পায় নাই। কিন্তু যেই তিনি লক্ষ্য করিলেন যে অভিশপ্ত স্তম্ভটির ছায়া তাঁহার উপর পড়িয়াছে, তখন তিনি জোর করিয়া ছুটিতে লাগিলেন। সাবর্ণিপুরের অধিবাসীরা তখন সকলেই নিদ্রামগ্ন, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি পান্থশালা, পশুশালা, বিপণিমালা পরিবেষ্টিত বিরাট চতুষ্কোণ সাবর্ণিপুর অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরবর্তী

পর্বতশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। কেবল একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যখন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সেও নিরস্ত হইল। শ্বাপদসরীসৃপপূর্ণ দস্যুতস্কর-অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্য দিয়া তিনি পর্বতমালা লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। ক্রমাগত চলিতেই লাগিলেন। পরদিন এবং তাহারও পরদিন থামিলেন না।

ক্ষুৎপিপাসায় ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া তিনি অবশেষে এক অদ্ভুত নগরীতে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কোথাও কোনও জনমানব নাই। তাঁহার মনে হইল, এইবার কি আমি শঙ্করের কাছাকাছি আসিলাম? কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নগরটি সত্যই অদ্ভুত। একেবারে নীরব; অথচ নিতান্ত ছোটও নয়, বামে দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, কিন্তু সবগুলিই ধ্বংসোন্মুখ, একটি বাড়িরও তোরণ নাই। মনে হইল, তিনি হয়তো শঙ্করের অনুচর প্রেতদের পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। সহসা দেখিতে পাইলেন, কোন কোন বাড়ির মধ্যে বন্য পশুও রহিয়াছে। তরক্ষু হায়েনা প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুরা শাবকদের স্তন্যপান করাইতেছে। কোথাও বা শবদেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া আছে। সাবর্ণি হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে একটি ভগ্নগৃহের সম্মুখে আসিয়া বড়ই অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। সেখানে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিলেন, এই বাড়িটি অন্য বাড়িগুলি হইতে একটু স্বতন্ত্র। প্রথমত শহরের বাহিরে, দ্বিতীয়ত যদিও ধ্বংসোন্মুখ তবু দেখিয়া মনে হয় এককালে ইহা কোনও ধনীর আবাস ছিল, বিধ্বস্ত প্রাকারগুলিতেও অতীত ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য

রহিয়াছে, তৃতীয়ত কাছেই একটি ঝরনা এবং কয়েকটি খেজুরগাছ আছে। বাহির হইতে একটি ঘরের অভ্যন্তরভাগ দেখা যাইতেছিল। দেখিয়া সার্বাণ শিহরিয়া উঠিলেন। ঘরের ভিতর অনেক সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাঁহার মনে হইল, তাড়া দিলেই সাপ পলায়ন করিবে। তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি করিবেন, কোথায় থাকিবেন!

তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "ওই আমার স্থান। ওই ঘরে ব'সেই আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

তিনি হামাগুড়ি দিয়া ঘরটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদশব্দ পাইয়াই সাপগুলি বাহির হইয়া গেল। তখন ঘরের মেঝের উপর তিনি লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং বহুক্ষণ একভাবেই শুইয়া রহিলেন। চতুর্দিকের শান্ত নিঃশব্দ পরিবেশ তাঁহার ক্লান্তি অপনোদন করিল। প্রায় চার-পাঁচ প্রহর অতীত হইবার পর তিনি উঠিয়া ঝরনার কাছে গেলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন। ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল। দেখিলেন, খেজুর ছাড়া আর কোনরূপ খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি খেজুরের সাহায্যেই তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিলেন। ঠিক ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না, কিন্তু তিনি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন না। ভাবিলেন, তাঁহার পক্ষে এখন কৃচ্ছ্রসাধনাই প্রশস্ত।

তিনি সমস্ত দিন ঘরের মেঝেতে মাথা ঠেকাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত একবারও মাথা তুলিতেন না।

একদিন যখন এইভাবে শুইয়া আছেন তখন কে যেন বলিল,

"মাথা তোল, দেওয়ালের উপর কি আঁকা আছে দেখ। অনেক কিছু শিখতে পারবে।"

সাবর্ণি মাথা তুলিয়া দেখিলেন, দেওয়াল জুড়িয়া সত্যই নানারকম ছবি আঁকা আছে। চিত্রের বিষয়বস্তুতে কোনও অসাধারণত্ব নাই, কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায় চিত্রগুলি প্রাচীন এবং সুনিপুণ শিল্পীর সৃষ্টি। অধিকাংশই গৃহস্থালীর চিত্র। কোন চিত্রে কেহ বা গাল ফুলাইয়া উনানে ফুঁ দিতেছে, কেহ হাঁস ছাড়াইতেছে, কোথাও বা রান্না হইতেছে। কিছুদূরে একটি চিত্রে এক শিকারী স্কন্ধে তীরবিদ্ধ একটি মৃগ লইয়া চলিয়াছে। কোন চিত্রে কৃষকেরা জমিতে লাঙল দিতেছে, কোথাও বা বীজ বুনিতেছে। অন্যত্র আবার একদল নৃত্যপরা যুবতী বিবিধ নৃত্যভঙ্গিমায় যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাদকেরাও আছে। কেহ বাঁশী, কেহ বেহালা, কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইতেছে।

একটু তফাতে একটি মোহিনী যুবতীর ছবি রহিয়াছে, তাহার হাতে বীণা, শ্লথ কবরীতে পদ্মকলি। অপরূপ ছবি! স্বচ্ছ বসনের ভিতর দিয়া তাহার প্রস্ফুটিত যৌবনের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার ফুল্ল অধর, পীবর স্তন যেন কুসুমের মহিমায় মহিমান্বিত। বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গীসহকারে সে যেন সাবর্ণির দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। সাবর্ণি চক্ষু নত করিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "কে আপনি, এ সব ছবি দেখতে আমাকে কেনই বা আদেশ করলেন? অসাধারণ কিছুই তো দেখলাম না। সবই তো নশ্বর জীবনের লীলাখেলা। যে ভোগী পুরুষের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য এ সব আঁকা হয়েছিল, তার দেহ নিশ্চয় শ্মশানভস্মে পরিণত হয়েছে। ছবিগুলি সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু

এগুলি দেখে সেই মৃত মানুষটির কথাই আমার মনে হচ্ছে। এ সবই তার ক্ষণস্থায়ী অহঙ্কারের চিহ্নমাত্র। সে কোথা ?"

উত্তর হইল—"সে মারা গেছে। কিন্তু সে যে একদিন মহা-সমারোহে সগৌরবে বেঁচে ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। তুমিই কি চিরকাল বেঁচে থাকবে ? তুমিও একদিন মরবে। কিন্তু ভেবে দেখ, ওর মতো সগৌরবে তুমি বাঁচতে পেরেছ কি ? সারাজীবন কি করলে ?"

সেই দিন হইতে সাবর্ণি আর এক মুহূর্ত সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। সেই অজানা কণ্ঠস্বর ক্রমাগত তাঁহার কানে মন্ত্রণা দিতে লাগিল। চিত্রার্পিতা বীণাবাদিনীও ঢলঢল নয়ন মেলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমশ তাহার মুখে ভাষাও ফুটিল।

"দেখ, আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ। আমি সামান্য রমণী নই। আমি রহস্যময়ী, আমি সুন্দরী। আমাকে উপেক্ষা ক'রো না, ভালবাস। যে কামনার তাড়নায় তুমি ছটফট করছ, আমার বাহুপাশে ধরা দিয়ে তা নিঃশেষ ক'রে দাও। কিসের ভয় তোমার ? আমি কি ভয়ঙ্করী ? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ। আমাকে এড়িয়েও কি তুমি যেতে পারবে ? পারবে না। আমি চিরন্তনী নারীর প্রতীক, আমি সৌন্দর্যলক্ষ্মী। আমাকে ফেলে কোথায় পালাচ্ছ তুমি পাগলের মতো ? পালানো যে সম্ভব নয়। কুসুমের বিকাশে, বনানীর চিরতারুণ্যে, বিহঙ্গীর গতিতে, হরিণীর চাঞ্চল্যে, তরঙ্গিণীর ধারায়, জ্যোৎস্নার আবেশে, রৌদ্রের ঔজ্জ্বল্যে সর্বত্রই যে আমি নানা ভঙ্গীতে ওতপ্রোত হয়ে আছি। আমিই প্রকৃতি। যদি চোখ বুজেও থাক, তা হ'লেও আমাকে নিজের বুকের মধ্যে দেখতে পাবে। যার দেহ শ্মশানভস্মে পরিণত হয়েছে ব'লে তুমি তোমার আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করছিলে,

তার কথা শোন। সহস্র বৎসর পূর্বে সে রাজার মতো বেঁচে ছিল। আমি ছিলাম তার চক্ষের আলো, বক্ষের মণি। সহস্র বৎসর পূর্বে আমার অধর থেকেই সে তার শেষ চুম্বন নিয়ে গেছে, সে চুম্বনের সুরভিতে এখনও তার শ্মশানভস্ম আমোদিত। সাবর্ণি, তুমি তো আমাকে ভাল ক'রেই জান। চিনতে পার নি এখনও? নিরঞ্জনা যে অসংখ্য রূপে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তারই একটা রূপ। তুমি শিক্ষিত সন্ন্যাসী, তোমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বড়। তুমি অনেক ভ্রমণ করেছ, ভ্রমণ করলে জ্ঞান আরও বাড়ে। ঘরে ব'সে দশ বছরেও যা পাওয়া যায় না, ভ্রমণ করতে করতে তা একদিনেই পাওয়া যায় অনেক সময়। বই প'ড়ে দেশভ্রমণ ক'রে অনেক জ্ঞান তুমি লাভ করেছ। তোমার অন্তত জানা উচিত যে, সমুদ্রমন্থনের সময় অকূল পাথার থেকে নিরঞ্জনাই উঠেছিল রম্ভার রূপ ধ'রে। সবাইকে মুগ্ধ করেছিল সে। ঋষি বিশ্বামিত্রকেও, রাক্ষস রাবণকেও। কালিদাসেও বিক্রমোর্বশী নাটকে নিরঞ্জনারই প্রেম-কাহিনী কীর্তিত হয়েছে। পুরূরবা বিক্রমই চিরন্তন পুরুষ আর উর্বশী চিরন্তনী নারী। এ সব তুমি কি পড় নি? সহস্র বৎসর পূর্বে যখন আমি বেঁচে ছিলাম তখন অনেককে ভুলিয়েছি। এখন যদিও আমি ছায়ামাত্র, কিন্তু এখনও আমি তোমাকে ভোলাতে পারি, তোমার কামনাসঙ্গিনীও হতে পারি। তোমাকে আমি ভালবেসেছি সন্ন্যাসী। বিস্মিত হচ্ছ? এটা কিন্তু নিঃসন্দেহে জেনো, যেখানেই তুমি যাও, নিরঞ্জনা তোমার সঙ্গে থাকবে—"

এ কথা শুনিয়া সাবর্ণি পাথরে মাথা ঠুকিতেন আর আর্তনাদ

করিতেন। প্রতিরাত্রে বীণাবাদিনী দেওয়াল হইতে নামিয়া আসিয়া স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিত। তাহার হিমশীতল নিশ্বাসও যেন তাঁহার গায়ে লাগিত। সাবাণর কঠোর সংযমে সে বিচলিত হইত না, বরং বলিত—"অমন করছ কেন, বন্ধু, এস, আলিঙ্গন কর আমাকে। যতক্ষণ ধরা না দেবে ততক্ষণ ছাড়ব না তোমাকে আমি। প্রেতিনীর অধ্যবসায় কত দৃঢ়, তা বোধ হয় জান না তুমি। আমি কেবল প্রেতিনী নই, আমি যাত্নকরীও। আমি তোমার দেহ থেকে তোমার প্রাণ বার ক'রে নিয়ে আর একটা প্রাণ পুরে দিতে পারি তার ভিতর। তোমার সেই নবসঞ্জীবিত দেহ তখন আমাকে আলিঙ্গন করতে আপত্তি করবে না। তখন কি অবস্থা হবে ভেবে দেখ একবার। তোমার মুক্ত প্রাণ, আত্মাও বলতে পার, স্বর্গেও যদি যায় সেখান থেকে দেখতে পাবে যে, তোমার দেহটা আমার সঙ্গে সানন্দে পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। তোমার ভগবানও এতে বিপন্ন বোধ করবেন। যাত্নকরীর মোহে যার দেহ লালসার পঙ্কে লুটোপুটি খাচ্ছে তাকে তিনি স্বর্গে স্থান দেবেন কি ক'রে? এ সম্ভাবনার কথা তুমি বোধ হয় চিন্তা কর নি। তোমার শঙ্করও করেন নি বোধ হয়। গোপনে তোমাকে একটা কথা বলছি শোন, তোমার শঙ্করের তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি নেই। সামান্ত যাত্নকরীও তাঁকে ঠকিয়ে দিতে পারে। যুগে যুগে ঠকিয়েওছে। ওঁর তৃতীয় নয়নের রোষবহ্নি আর নন্দীভৃঙ্গীরা যদি না থাকত, তা হ'লে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ওঁর জটা আর দাড়ি ধ'রে টানাটানি করিত। ওঁর চেয়ে ওঁর শত্রুপক্ষের লোকেরা, যাদের তোমরা দানব পিশাচ প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছ, ঢের বেশী বুদ্ধিমান। তারা শিল্পীও অদ্ভুত। আমার এই যে রূপ, এই যে ছলা-কলা,

এ তো তাদেরই সৃষ্টি। তাদেরই প্রেরণায় আমি এমন ক'রে বেণী দোলাতে শিখেছি, সাজাতে শিখেছি নিজেকে নানাভাবে। তুমি কিন্তু ওদের কখনও আমল দাও নি, কখনও শ্রদ্ধা কর নি, ওদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে কখনও ইতস্তত কর নি। এই ঘরে যখন তুমি ঢুকলে তখন সাপগুলোকে তাড়িয়ে দিলে, তাদের ডিমগুলোকে ভেঙে চুরমার ক'রে ফেললে, একটুও দয়া হ'ল না তোমার। একবারও মনে হ'ল না যে, ওরা দানবদের আত্মীয়। অপমানিত দানবরা তোমাকে ছাড়বে কেন? আমার মনে হয়, তোমার সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। গুণীদের অপমান ক'রে কেউ কখনও নিস্তার পায় না। তুমি কি জান না, ওঁরা কত বড় রসিক, কত বড় প্রেমিক? তুমি চিরকাল ওঁদের ঘৃণা করেছ। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোহর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছ তুমি। তাঁরা তোমায় সাহায্য করবেন কেন? তাঁদের যিনি রাজা, যাঁর সামান্য ভ্রূভঙ্গীতে ত্রিভুবন কেঁপে উঠতে পারে, বিদেশীরা যাঁকে শয়তান উপাধি দিয়েছে, তিনি আমার প্রণয়ী। জান, সাবর্ণি, তিনি আমাকে চুম্বন করেন—"

যাদুবিদ্যার ক্ষমতা কত তাহা সাবর্ণির অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ভীত হইলেন। ভাবিলেন, যাদুবিদ্যা-প্রভাবে হয়তো এখনই কোন দানবরাজ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখেই ওই বীণাবাদিনীকে আলিঙ্গন করিবে। মাঝে মাঝে চুম্বনের মৃদু শব্দও যেন তিনি শুনিতে পাইলেন।

এইরূপ জটিল পরিস্থিতিতে পড়িয়া তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন, শঙ্কর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। চক্ষু খুলিতে, এমন কি চিন্তা করিতেও, তাঁহার ভয় করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যায় তাঁহার অভ্যাসমতো তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ভঙ্গীতে শুইয়া ছিলেন। এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"পৃথিবীতে কত প্রকার জীব আছে জান? জান না। আমি যা দেখেছি তা যদি তোমাকে বলি, তা হ'লে হয়তো ভয়ে তুমি মূর্ছা যাবে। একচক্ষু মানুষ আছে, তার চক্ষুটি কপালের ঠিক মাঝখানে থাকে। একপা-ওলা মানুষ আছে, তারা হেঁটে চলে না, লাফিয়ে চলে। এমন লোক আছে যারা ইচ্ছামতো নিজেদের স্ত্রী বা পুরুষে রূপান্তরিত করতে পারে। বৃক্ষরূপী মানুষও আছে, জমির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত শিকড় চালিয়ে তারা ব'সে থাকে। মুণ্ডহীন মানুষও দেখেছি, তাদের চোখ নাক মুখ দাঁত সব বুকের উপরে, কবন্ধের মতো চেহারা। তোমার শঙ্কর কি এদের সবাইকে ত্রাণ করবেন? তোমার কি বিশ্বাস?"

আর একদিন এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। একটি বিস্তৃত মাঠ, নদী এবং বাগান দেখা যাইতেছে। মাঠে চারুদত্ত ও শুভদত্ত অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া চলিয়াছেন, গতিবেগের উন্মাদনা তাঁহাদের চোখে মুখে পরিস্ফুট। একটি তোরণের নীচে দাঁড়াইয়া কবি চিন্ময় কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন, পরিতৃপ্ত অহঙ্কার তাঁহার কণ্ঠস্বরে ঝঙ্কৃত হইতেছে, নয়নের দৃষ্টি আবেশময়। বাগানের ভিতর নভোনীল এবং মহাস্থবিরকেও দেখা যাইতেছে। নভোনীল সোনার আপেল তুলিতেছেন, এবং আদর করিতেছেন একটি বহুবর্ণবিচিত্র সর্পিণীকে। তাহারও চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন। পীতবসনাবৃত হর্ষগম্ভীর একটি আম্র-

বৃক্ষের দিকে চাহিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। আম্রবৃক্ষের শাখায় ফল ঝুলিতেছে না, ঝুলিতেছে নানা-জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের মুণ্ড—মানুষের, দেবদেবীর, অবতারদের, পশুপক্ষীরও। কোন কোন শাখায় চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রও ঝুলিতেছে। কিছু দূরে সিন্ধুপতিকেও দেখা যাইতেছে। তিনি একটি ফোয়ারার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি গোলক হাতে লইয়া তাহাতে জ্যোতিষ্ক-দের ভ্রমণপথ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন।

একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী তাহার পর সাবর্ণির নিকট আগাইয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে সপুষ্প একটি অশোক-পল্লব। তিনি সাবর্ণিকে বলিলেন, "দেখ, অনেকে অনন্ত সৌন্দর্যের সন্ধানে তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিধিতেই অনন্তকে টেনে আনে। অনেকে আবার ওসব কথা ভাবেই না। তারা তাদের স্বভাবের নির্দেশ মেনে চলে, আর তাতেই সুখী হয়, তার মধ্যেই সৌন্দর্যের সন্ধান পায়। শুধু তাই নয় সহজ জীবন যাপন ক'রে তারা সেরা-শিল্পী ভগবানের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীতে। মানুষই তো ভগবানের সেরা কাব্য, সে কাব্যের মহত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠে তাদের সহজ স্বাভাবিক জীবনে। তারা সুখের জাতিবিচার করে না, তারা সুখ মাত্রকেই নির্মল মনে করে, জীবনকে ভোগ ক'রেই তাদের আনন্দ। তাদের আচরণ কি নিন্দনীয়! যদি তা না হয়, তা হ'লে ভেবে দেখুন, মহর্ষি, আপনি সারাজীবন কি করলেন—"

দৃশ্য মিলাইয়া গেল।

মহর্ষি সাবর্ণি অহোরাত্র প্রলুব্ধ হইতে লাগিলেন। শয়তান দেহে বা মনে তাঁহাকে এক মুহূর্তও স্বস্তিতে থাকিতে দিল না।

ক্রমশ ওই নির্জন কক্ষটি রাজধানীর চৌমাথা অপেক্ষাও বেশী জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দানবদের অট্টহাস্য শুনিতে লাগিলেন। অসংখ্য জীব-জন্তু-কীট-পতঙ্গের জৈব-লীলা তাঁহার চোখের সম্মুখেই ঘটিতে লাগিল। যখন ঝরনায় তিনি জলপান করিতে যাইতেন তখন অপ্সরীরা সেখানে আসিয়া ভীড় করিত, গান গাহিত, নাচিত এবং তাঁহাকেও দলে টানিবার চেষ্টা করিত। সাবর্ণি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। তাহাদের অশ্লীল ইঙ্গিত, অকথ্য ভাষণ, অভব্য ব্যঙ্গ ও নৃত্য তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে তাহারা তাঁহার অঙ্গস্পর্শও করিতে লাগিল। একদিন এক ক্ষুদ্রকায় কিন্নর একটু বাড়াবাড়ি করিয়া বসিল। যে দড়ি দিয়া তাঁহার কৌপীনটি কোমরে বাঁধা ছিল সেই দড়িটি সে কাড়িয়া লইয়া গেল।

সাবর্ণি শিহরিয়া মনে মনে বলিলেন, "চিন্তা, আমাকে কোথায় তুমি নিয়ে এসেছ!"

চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তিনি স্থির করলেন, হাতের কাজ করিবেন। ঝরনার নিকটে অনেক কলাগাছও ছিল। তিনি কিছু কলাপাতা সংগ্রহ করিলেন, এবং পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া ডাঁটাগুলি পাথর দিয়া ছেঁচিয়া দড়ির আকারে পাকাইতে লাগিলেন। মনস্থ করিলেন কৌপীনের দড়িটা সর্বাগ্রে পাকাইয়া ফেলা দরকার। ইহাতে মায়াবী দানবেরা একটু যেন জব্দ হইল। আর তাহারা শব্দ করিত না। বীণাবাদিনী কুহকিনীও পুনরায় চিত্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রাচীর আশ্রয় করিল, যাদুকরীর বেশে আর সহসা তাঁহাকে বিচলিত করিবার প্রয়াস পাইল না। কলার ডাঁটা ছেঁচিতে ছেঁচিতে তাঁহার সাহস এবং

আত্মপ্রত্যয় ক্রমশ যেন ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তিনি আশা করিতে লাগিলেন, শঙ্কর যদি দয়া করেন তাহা হইলে কামকে তিনি পরাস্ত করিতে পারিবেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার আত্মপ্রত্যয় এখনও নষ্ট হয় নি। মায়াবী দানবেরা বা ওই বীণাবাদিনী যাদুকরী আমাকে নাস্তিক ক'রে তুলতে পারবে না। তারা যদি আসে তাদের বলব—প্রথমে শব্দ ছাড়া আর কিছু ছিল না, শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই শঙ্কর। ওরা যদি এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চায়, যদি বলে—এ আমার আজগুবি কল্পনা, তবু আমি বলব—ওই আজগুবি কল্পনাই আমি বিশ্বাস করি। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি মানেই তো তাই। সাধারণ বুদ্ধিতে যা অসম্ভব, একমাত্র বিশ্বাসের জোরেই তা সম্ভব হয় ভক্তের মনে। সাধারণ সম্ভবপর ব্যাপার তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জ্ঞানের সীমার পরেই। শঙ্কর যদি সাধারণ মানুষ হতেন তাঁকে জানতাম, বিশ্বাসের প্রয়োজনই হ'ত না তা হ'লে। কিন্তু মোক্ষের পথে জ্ঞান আমাদের কতদূর নিয়ে যেতে পারে! সে পথে বিশ্বাসই এক মাত্র সম্বল।..."

তিনি প্রতিদিন কলার সুতাগুলি রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিয়া সযত্নে সেগুলিকে আবার ঘরের ভিতরে লইয়া আসিতেন। নির্মল আনন্দে ক্রমশ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কৌপীন-রজ্জুটি প্রস্তুত করিবার পর তিনি ঘাস উপড়াইয়া মাদুর ও ঝুড়ি নির্মাণে মন দিলেন। ক্রমশ ঘরটা যেন ঝুড়ি ও মাদুরের কারখানা হইয়া উঠিল। কাজ করিতে করিতে তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু, হায়, শঙ্কর তাঁহাকে কৃপা করিলেন না। আবার একদিন রাত্রে কাহার অপরিচিত কণ্ঠে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন।

কে একজন চুপি চুপি মৃদু কণ্ঠে কাহাকে ডাকিতেছিল, "অঞ্জনা, অঞ্জনা, চল, আমরা স্নান ক'রে আসি। শিগগির এসো, দেরি ক'রো না—"

ইহার উত্তরে যে নারীটি কথা কহিল, সাবর্ণি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, তাহার মুখটা তাঁহার শিয়রের দিকে রহিয়াছে।

সে উত্তর দিল, "আমি যাই কি ক'রে! একজন লোক যে আমার উপর শুয়ে আছে!"

সহসা সাবর্ণির সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, একটি যুবতীর স্তনের উপর তিনি গাল রাখিয়া শুইয়া আছেন। বীণাবাদিনীকে তিনি মুহূর্তের মধ্যে চিনিতে পারিলেন। সে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহাতে তাহার স্তনদ্বয় আরও জীবন্ত আরও পীবর হইয়া উঠিল। সাবর্ণি আর নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিলেন না, সেই কলঙ্কিতা মাংসপিণ্ডকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যেয়ো না, চ'লে যেয়ো না, তুমিই স্বর্গ—"

সে কিন্তু রহিল না, উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। হাসি নয়, যেন জ্যোৎস্নার ঝলক। হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "আমার থাকবার দরকার নেই তো! তোমার মতো কল্পনাকুশল প্রণয়ী তো ছায়ার ছায়াতেই সন্তুষ্ট। তা ছাড়া যা করবার তা তো তুমি করেইছ, আর কি চাও?"

হাসিতে হাসিতে অন্তর্ধান করিল।

মহর্ষি সাবর্ণি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ক্রন্দন করিলেন। যখন উষা-লোক দেখা গেল, তখন তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"শঙ্কর, শঙ্কর, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করছ? কি দোষ করেছি আমি? আমাকে এমন ক'রে ছেড়ে

যেয়ো না। তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই, তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, নির্গুণ পরমব্রহ্মের ধারণা আমার নেই, তুমিই আমার একমাত্র সম্বল। মানুষের রূপেই তোমাকে আমি পূজো করেছি—মানুষের যত ক্ষমতা, যত ঐশ্বর্য, যত রূপ, যত বিভূতি কল্পনা করা সম্ভব, তা আমি তোমার মধ্যেই কল্পনা করেছি —তোমার মধ্যেই আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছি। তুমি আমার পরমাত্মীয়, একমাত্র আত্মীয়, আমার পূজা কোন অলৌকিক মহিমার উদ্দেশে নয়, নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশেও নয়, তোমার উদ্দেশে—যাকে আমি মানুষরূপে কল্পনা করেছি। যে মদন একদিন তোমার তপোভঙ্গ করেছিল, সেই মদন আমাকেও বিব্রত করেছে। তুমি তাকে ভস্ম ক'রে ফেলেছিলে, কিন্তু আমার সে শক্তি কই? আমার বিপদ কি বুঝতে পারছ না? দুর্বল ব'লেই আমাকে ত্যাগ করবে? মানুষ যে কত অসহায় তা তো তোমার অবিদিত নেই প্রভু, নিজেই কতবার তুমি নরদেহ ধারণ করেছ, দেহের ক্ষুধা যে কি ভীষণ তা কি তুমি জান না? সেই ক্ষুধার তাড়নাতে কাতর হয়েছি ব'লে তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে যাবে?…"

সার্বর্ণি যখন স্তম্ভের উপরে ছিলেন তখন তিনি যে দানবের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন, তাহাই আবার শুনিতে পাইলেন।

"তোমার শঙ্করকে শেষকালে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনলে! বৌদ্ধদের মতো এবার সহজিয়া পন্থা ধরবে না কি! হা হা হা হা—"

অট্টহাস্যে সমস্ত ঘর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সার্বর্ণির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া গৈরিকবসনপরিহিত বহু সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ তাঁহার মাথায় জল ঢালিতেছেন, কেহ বা হাওয়া করিতেছেন।

একজন সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, হঠাৎ এই ঘরের মধ্যে দারুণ চীৎকার শুনলাম, এসে দেখি আপনি মৃতবৎ প'ড়ে আছেন। মনে হ'ল, সম্ভবত আপনি কোনও দানবের কবলে প'ড়ে ছিলেন, আমাদের দেখে দানবটা স'রে পড়ছে—"

সার্বর্ণি মাথা তুলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "ভাই, তোমরা কে? এত লোক কেন? তোমরা কি আমার শব দাহ করতে এসেছ?"

তাহারা বলিল, "আপনি তো বেঁচে আছেন। আপনার বেশ দেখে মনে হয় আপনি সন্ন্যাসী। আপনি কি শোনেন নি যে, মহাবৃদ্ধ পরমশৈব মহর্ষি কারগুব একশ পাঁচ বৎসর বয়সে হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন সবাইকে আশীর্বাদ করতে? তাঁর কাছেই যাচ্ছি আমরা—এতবড় সংবাদটা আপনি শোনেন নি? এখানে কি একজন লোকও নেই—"

সর্বর্ণি উত্তর দিলেন, "এ সংবাদ শোনবার যোগ্যতাই আমার নেই বোধ হয়। এ নগর শয়তান আর দানবদের লীলাভূমি, কোনও মানুষ এখানে আসে না। আপনারা আমার জন্যে প্রার্থনা করুন। আমি সার্বর্ণি, হিমালয়ের অরণ্যে বহুকাল শঙ্করের ধ্যানে কাটিয়েছি, কিন্তু হায়, তবু শঙ্করের কৃপা আজও পাই নি। তাঁর অযোগ্যতম সেবক আমি। বড় কষ্ট পাচ্ছি—"

সার্বর্ণির নাম শুনিবামাত্র সকলে করজোড়ে প্রণত হইলেন। যিনি কথা বলিতেছিলেন তিনি বলিলেন, "আপনিই কি সেই

বিখ্যাত মহর্ষি সাবর্ণি, যাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, যাঁর অসাধারণ তপস্যা বিদগ্ধ সমাজে প্রবাদবাক্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেকে মনে করেন মহর্ষি কারগুব ছাড়া যাঁর সমতুল্য তপস্বী আর নেই—আপনিই কি তিনি? আমাদের কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম! আপনার কথা কে না জানে? আপনার সব কথা শুনেছি। পাটলিপুত্রের নটী নিরঞ্জনাকে আপনিই তো ধর্মপথে ফিরিয়ে এনেছেন, স্তম্ভশীর্ষে আরোহণ ক'রে কঠোর তপস্যাপ্রভাবে আপনি শত শত রোগীকে আরোগ্য করেছেন, সেই স্তম্ভকে কেন্দ্র ক'রে বহু দেশের তীর্থিকদের নিয়ে বিরাট সাবর্ণিপুর নগর 'গ'ড়ে উঠেছে, এ কথা সবাই জানে। স্তম্ভশীর্ষ থেকে আপনার বিস্ময়কর অন্তর্ধান—শুধু বিস্ময়কর নহে, মহিমময় বললেও অত্যুক্তি হবে না—এত অলৌকিক যে, স্বল্পবুদ্ধি লোকেরা তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে নি। যারা স্তম্ভের পাদমূলে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল তাঁদের কাছে শুনেছি, স্বর্গের দেবদূতেরা এসে আপনাকে শুভ্রমেঘে আবৃত ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, কেবল দেখা যাচ্ছিল আপনার প্রসারিত দক্ষিণ হস্তটি, আপনি যেন সকলের শিরে আশীর্বাদ বর্ষণ করতে করতে আকাশ-পথে বিলীন হয়ে গেছেন। পরদিন সকালে আপনাকে স্তম্ভশীর্ষে দেখতে না পেয়ে সাবর্ণিপুর হাহাকারে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আপনার শিষ্য পণ্ডিত হরানন্দ আপনার অন্তর্ধানের বিস্ময়কর হেতু জনসমাজে যখন প্রচার করলেন, তখন সকলে একটু শান্ত হ'ল। তিনিই এখন আপনার শিষ্যসম্প্রদায়ের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছেন। আপনার রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ এখন আর নেই। অবশ্য একটি লোক ছাড়া—সেও আপনার

শিষ্য, তার নাম বালক বাঙ্গা, সে বোধ হয় একটু পাগল-গোছের। তার ধারণা, আপনাকে দেবদূতেরা নিয়ে যায় নি, দানবেরা নিয়ে গেছে। তার এ কথায় ঘোর আলোড়ন হয়েছিল, জনতা হয়তো ঢিল ছুঁড়ে তাকে মেরেই ফেলত। অনেক কষ্টে রক্ষা পেয়েছে সে। আমার নাম মনভ্রমর—যারা আপনাকে প্রণাম করছে, তারা সবাই আমারই শিষ্য। আমিও আপনার কাছে নতজানু হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। দেবদূতেরা আপনাকে স্তম্ভশীর্ষ থেকে নিয়ে গিয়েছিল, শঙ্করের আশ্চর্য মহিমা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, শঙ্করেরই নিগূঢ় অভিপ্রায়ে হয়তো আপনি আবার এখানে অবতীর্ণ হয়েছে। আপনি আগে আমাদের আশীর্বাদ করুন, তারপর সব বলুন, আমরা শুনে ধন্য হই—"

সাবর্ণি উত্তর দিলেন, "হায় হায়, তোমরা যা মনে করছ তার কিছুই হয় নি। শঙ্করের একবিন্দু কৃপাও আমি পাই নি। তিনি কেবল ভয়ঙ্কর প্রলোভনের মধ্যে আমাকে ফেলেছেন। কোনও দেবদূত আমাকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে যায় নি। বিরাট এক ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ ক'রে আমি এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছি। বাস করেছি মিথ্যা স্বপ্নলোকে। শঙ্কর ছাড়া সবই মিথ্যা, তাঁকে আমি পাই নি। যখন আমি পাটলিপুত্রে যাচ্ছিলাম, তখন পথে নানা লোকের মুখে নানা রকম কথা শুনেছি। তারা সকলেই আমাকে ভুল পথে চালাবার চেষ্টা করেছিল, আমার মনে হয়েছিল, মোহ নানারূপে এসে আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মোহ এখনও আমাকে ছাড়ে নি, এখনও আমাকে অনুসরণ করছে, এখনও আমি অভিভূত, মনে হচ্ছে অহোরাত্র যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ব'সে আছি—"

মনভ্রমর উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমরা শুনেছি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের জীবনে বহু প্রলোভন আসে। আপনি বলছেন—কোনও দেবদূত এসে আপনাকে নিয়ে যায় নি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা যখন দেখেছে তখন মনে হয় শঙ্কর আপনার প্রতিমূর্তি বা প্রতিচ্ছবিকেই বোধ হয় সে সম্মান দান করেছেন। কারণ পণ্ডিত হরানন্দ এবং আরও অনেক সন্ন্যাসী স্বচক্ষে দেখেছেন যে, আপনি বা আপনার মতো কেউ যেন দেবদূতবাহিত হয়ে আকাশপথে বিলীন হয়ে গেলেন।"

মহর্ষি সাবর্ণি কোনও উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, তিনিও ইহাদের সহিত গিয়া মহর্ষি কারণ্ডবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

"ভাই মনভ্রমর, আমাকেও তোমাদের একটা ত্রিশূল দাও। তোমাদের সঙ্গে, চল, আমিও গিয়ে মহর্ষি কারণ্ডবের পদপ্রান্তে প্রণত হই। তোমাদের অসুবিধা হবে না তো?"

"কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না। এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের আবার সুবিধা-অসুবিধা কি, আমরা তো সৈনিক। জীবন-যুদ্ধে সন্ন্যাসীদের চেয়ে বড় সৈনিক আর কে আছে বলুন? আপনি আর আমি ত্রিশূল নিয়ে আগে আগে যাব। আর বাকি সকলে স্তোত্রগান করতে করতে আমাদের পিছু পিছু আসুক। সেনাবাহিনীর মতো আমরা অগ্রসর হই, চলুন।"

তাঁহাদের যাত্রা শুরু হইল।

মনভ্রমর সাবর্ণিকে বলিলেন, "মহর্ষি ভগবানের বিষয় আমাদের কিছু শোনান।"

সাবর্ণি বলিতে লাগিলেন, "সর্বসত্যের সমন্বয়ই ভগবান, কারণ

তিনি সত্য ছাড়া আর কিছু নন ; আর সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। পৃথিবীর যে বৈচিত্র্য আমরা দেখি তা মায়াময়, মনে ভ্রান্তির সঞ্চার করে কেবল। তাই প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশ, আপাত-দৃষ্টিতে যতই মনোহর হোক না কেন, সত্যলাভের পথে তা অন্তরায়। ওর থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে। প্রকৃতি মনোহারিণী, তাই সে ভয়ঙ্করী। তাই যখনই দেখি কোনও গাছ মুঞ্জরিত হয়েছে, কোন লতা কোনও গাছকে বেষ্টন করেছে, আমার প্রাণ আতঙ্কে কেঁপে ওঠে, আমি চোখ ফিরিয়ে নিই, বিষন্ন বোধ করি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু আমরা অনুভব করি তা সবই ভয়ঙ্কর জানবে। তুচ্ছ একটা বালুকণাও বিপদ ডেকে আনতে পারে। প্রকৃতির প্রতিটি জিনিস আমাদের লোভ দেখায়। নারী তো মূর্তিমতী প্রলোভন। জলে স্থলে আকাশে যত রকম প্রলোভন আছে সমস্ত পুঞ্জীভূত হয়েছে নারীর দেহে। যার ইন্দ্রিয়ের দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ সেই যোগী, সেই সুখী। যে মূক বধির অন্ধ হতে জানে, প্রকৃতির মায়া যাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারে—"

মনভ্রমর কথাগুলি প্রণিধান করিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "প্রভু, আপনি যখন আমার কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করলেন, তখন আমিও করি। আমার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্তও অকপটে আপনাকে বলি। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এ রীতিটা বহুকাল থেকে প্রচলিত, সুতরাং এটা কর্তব্যও বটে। আমার কথা শুনুন। সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্বে আমি অতি জঘন্য জীবন যাপন করেছিলাম। মাদুরা নামক শহরে উৎসবে গিয়েছিলাম আমি। স্নানে, মেয়েদের নিয়ে মেতেছিলাম। সে যে কত রঙের, কত

ঢঙের মেয়ে তা বর্ণনা করব না। মানে সবাই বারাঙ্গনা। একদল মেয়ে নিয়ে সারাদিন নাচ-গান আর হুল্লোড় করতাম, তার মধ্যে যেটাকে পছন্দ হ'ত সেইটেকে নিয়ে রাত কাটাতাম। আপনার মতো জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত, কি জঘন্য জীবন যাপন করেছিলাম আমি তখন! কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, গৃহস্থ, দেবদাসী কাউকে বাদ দিই নি। অন্ধকারের মধ্যেও একটু আলো ছিল, ভগবানে বিশ্বাস হারাই নি। এসব ব্যাপারে যা হয় তাই হ'ল শেষে। টাকাপয়সা যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর আর একটি ঘটনা ঘটল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে যে লোকটা ছিল সব চেয়ে বলিষ্ঠ, এক ভীষণ ব্যাধির কবলে প'ড়ে গেল সে। দেখতে দেখতে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। শেষকালে এমন হ'ল যে, দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না, পা থরথর ক'রে কাঁপে ; কিছু ধরতে পারে না, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে এল, গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ ছাড়া আর কোনও কথা বেরোয় না। তার মনটা আরও অপটু হয়ে পড়ল, সর্বদাই কেমন যেন অসাড় আচ্ছন্ন ভাব। যে পশুর জীবন যাপন করেছিল, ভগবান তাকে পশুই ক'রে দিলেন শেষে। টাকাকড়ি নিঃশেষ হওয়াতে আমি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এর অবস্থা দেখে আমার চৈতন্য হ'ল। আমি আর কালবিলম্ব না ক'রে অরণ্যবাসী হলাম। তারপর থেকে কুড়ি বছর আমি পরম শান্তিতে কাটিয়েছি। আমি আর আমার শিষ্যেরা দৈহিক পরিশ্রম ক'রে জীবন যাপন করি। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁতি, কেউ ঘরামি, কেউ চাষী, কেউ কেউ আবার লেখকও। আমি লেখার চেয়ে হাতের কাজই বেশী পছন্দ করি। এখন আমার সমস্ত দিন আনন্দে কাটে, রাত্রে গভীর নিদ্রা হয়। মনে হয় শঙ্কর

আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন, কারণ ভয়ঙ্কর পাপেও যখন আমি লিপ্ত ছিলাম তখনও আমি বিশ্বাস হারাই নি, আশা ছাড়ি নি—"

এ কথা শুনিয়া সাবর্ণি আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া মনে মনে বলিলেন, "যে লোক এত পাপ করেছে তাকে তুমি দয়া করেছ। কিন্তু আমি সারাজীবন তোমার নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রেও তোমার কৃপাকণা পর্যন্ত পেলাম না! তোমার লীলা বোঝা শক্ত—"

মনভ্রমর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু, দেখুন দেখুন। চক্রবালরেখার দিকে চেয়ে দেখুন। মনে হচ্ছে না পঙ্গপাল আসছে? কিন্তু পঙ্গপাল নয়, সন্ন্যাসীর দল। মহর্ষি কারগুবের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।"

যে প্রান্তরে মহর্ষি কারগুবের আসিবার কথা সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা এক বিরাট জনতা দেখিতে পাইলেন। সকলেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা অর্ধবৃত্তাকারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন অতি প্রাচীন পর্বতবাসী সন্ন্যাসীগণ। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই শ্মশ্রু আজানুলম্বিত, জটা ভূমিস্পর্শী, হস্তে বিল্বশাখা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন মহর্ষি বনস্পতি এবং তাঁহাদের দলভুক্ত শিষ্যগণ। মহর্ষি সাবর্ণির শিষ্যেরা এবং পরিচিত সন্ন্যাসীরাও এই শ্রেণীতে ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন নানা দেশের নানা বর্ণের সন্ন্যাসীবৃন্দ। অধিকাংশই কৃষ্ণকায় এবং শীর্ণকান্তি। কাহারও অঙ্গে ছিন্নকন্থা, কেহ বা বল্কলধারী, কেহ কেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ। যাহারা উলঙ্গ, মেষের মতো

লোমশ করিয়া ভগবান তাহাদের আবরণের অভাব মোচন করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই হস্তে প্রচুর বিল্বপত্র—টাটকা সবুজ বিল্বপত্র। মনে হইতেছিল, সেই বিরাট প্রান্তরে একটি সবুজ ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে।

শ্রেণী তিনটি সুবিন্যস্ত ছিল বলিয়া সাবর্ণি অনায়াসেই তাঁহার শিষ্যগণকে দেখিতে পাইলেন। তিনিও তাহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু পাছে তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারে এজন্য চাদরে মুখ ঢাকিয়া লইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, তাঁহাকে চিনিতে পারিলে হয়তো শান্তিভঙ্গ হইবে। অনেকের মানসিক সাম্যভাবও হয়তো বিচলিত হইবে।

সহসা তুমুল জয়ধ্বনি হইল।

"মহর্ষি কারণ্ডব আসছেন। জয় শঙ্কর, জয় মহাদেব, জয় কৈলাসপতি। ওই আসছেন উমানাথের প্রিয়তম শিষ্য, মৃত্যু পর্যন্ত যাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি—আসছেন, আসছেন, ওই আসছেন—"

ইহার পর চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল, সকলে ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন।

বিরাট প্রান্তরের উত্তর দিকে যে নাতিবৃহৎ পর্বতটি ছিল তাহার উপর হইতেই মহর্ষি কারণ্ডব অবতরণ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয় হংসপক্ষ এবং কঙ্কধীমান তাঁহার দুই পার্শ্বে তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, পাছে তিনি পড়িয়া যান। তিনি খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নামিতেছিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, এত বয়সেও তিনি ন্যুব্জ হইয়া পড়েন নাই, বেশ সোজা হইয়াই হাঁটিতেছেন,

দেহসৌষ্ঠবে নির্মল স্বাস্থ্যের দীপ্তি। শুভ্র শ্মশ্রুতে তাঁহার বিশাল বক্ষ আবৃত, কেশহীন মসৃণ মস্তক হইতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে মনে হইতেছে তাঁহারই তপস্যার দ্যুতি বুঝি বিচ্ছুরিত হইতেছে। অদ্ভুত তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি—তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল এবং মর্মভেদী। অধরে শিশুসুলভ সরল হাসি। শতাধিক বৎসর বয়স তাঁহার, কিন্তু জরার অবসন্নতা নাই। বলিষ্ঠ দুই হস্ত তুলিয়া তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিলেন এবং স্নেহভরে বলিলেন, "কি চমৎকার! ভগবান, তোমার সৃষ্টি কি সুন্দর!"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশাল জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয়, জয় ভক্তের জয়—"

বজ্রগর্জনবৎ সেই গম্ভীর নিনাদ দিগ্‌দিগন্তকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি কঙ্কধীমান ও হংসপক্ষের সহিত সন্ন্যাসীশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি কারণ্ডব অসাধারণ তপস্বী ছিলেন। লোকে বলিত, তিনি স্বর্গ নরক দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধর্মবিশ্বাসের জন্য অনেক বৌদ্ধ শাসনকর্তার হস্তে তিনি নির্যাতিত হইয়াছেন; কিন্তু ধর্মবিশ্বাস হইতে বিচলিত হন নাই। বহু জিজ্ঞাসু নাস্তিক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়াছেন। বস্তুত সর্বপ্রকার সম্প্রদায়ই তাঁহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার তপস্যা, চরিত্র এবং ভাগবতী শক্তির কাহিনী ধার্মিক-সমাজে প্রবাদের মতো প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। হিমালয়শীর্ষে অবস্থানকরত প্রকৃতপক্ষে ইনি একাই সমগ্র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য করিতেন।

....মহর্ষি কারণ্ডব সকলের সহিত সস্নেহে সুমিষ্ট আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সকলের নিকটই বিদায় প্রার্থনা

করিলেন। বলিলেন, এইবার তাঁহাকে দেহরক্ষা করিতে হইবে, শঙ্কর তাঁহাকে চরণে স্থান দিয়াছেন।

মহর্ষি উপলচরিত এবং বনস্পতিকে দেখিয়া তিনি প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমাদের দুজনেরই বহু শিষ্য। কৌশলী যোদ্ধার মতো তোমরা দুজনে ধর্মের বিজয়পতাকাকে আকাশে সমুড্ডীন ক'রে রেখেছ। স্বর্গেও আশা করি দেবসেনাপতি কার্তিকেয় তোমাদের স্বর্ণবর্মে ভূষিত ক'রে দৈত্যদলনে সেনানায়ক ক'রে পাঠাবেন। তোমরা প্রকৃতই বীর।"

মহর্ষি শুভঙ্করকে দেখিতে পাইয়া তিনি সাগ্রহে আগাইয়া গেলেন এবং তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমার এই শিষ্যটি সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে সহজ। গাছ-পালা নিয়েই ওর সারাজীবন কেটেছে, তাই গাছপালার মতোই সবুজ ওর মন। শুধু বিশুদ্ধ নয়—সুন্দর, সুরভিত।"

মনভ্রমরকে দেখিয়া তিনি হাসিলেন।

বলিলেন, "তুমি আশাবাদী লোক। নানা বিপদে প'ড়েও হাল ছাড় নি, তাই তোমার মনে শান্তি আছে। দুষ্কৃতির আবর্জনার সারে তুমি সুকৃতির ফুল ফুটিয়েছ। তোমার বাহাদুরি আছে—"

যে যেমন তাহার সহিত তিনি তেমনি ভাবেই আলাপ করিলেন এবং যাহা বলিলেন তাহা মধুর অর্থপূর্ণ।

বৃদ্ধদের বলিলেন, "ঈশ্বরের সিংহাসনকে ঘিরে বৃদ্ধেরাই ব'সে আছেন।"

যুবকদের বলিলেন, "তোমরা আনন্দ কর। যারা সংসারে আছে, দুঃখটা তাদের। তোমাদের খালি আনন্দ।"

সন্ন্যাসীদের মধ্যে চলিতে চলিতে এই ভাবে তিনি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। সার্বাণর কাছে আসিতেই সাবর্ণি আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিহ্বল চিত্তে নতজানু হইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "পিতা, পিতা, আমি মরছি, আমাকে বাঁচান, আমাকে সাহায্য করুন। নিরঞ্জনাকে আমি শঙ্করের চরণে সমর্পণ করেছি, এক স্তম্ভশীর্ষে ব'সে বহুকাল কৃচ্ছ্র সাধন করেছি, তারপর এক প্রেতপুরীতে গিয়ে এতদিন ধ'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছি। দেখুন প্রভু, মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে আমার কপাল বলদের কাঁধের মতো হয়েছে, কিন্তু তবু শঙ্কর আমাকে ত্যাগ ক'রে গেছেন। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন পিতা, আপনার আশীর্বাদ পেলে আমি বেঁচে যাব, আমার সব পাপ ধুয়ে যাবে। আমাকে আশীর্বাদ করুন—"

মহর্ষি কারণ্ডব কোনও উত্তর না দিয়া সার্বাণর দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। তাহার পর তিনি বালক বাঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে কাছে ডাকিলেন। স্বল্পবুদ্ধি বাঙ্গাকে নিকটে ডাকিতে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। এই পাগলটা যে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ইহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

মহর্ষি কারণ্ডব বলিলেন, "শঙ্কর আমাকে যা দেন নি তা একে দিয়েছেন। এর দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি। এ অনেক দূরের জিনিস দেখতে পায়। বাঙ্গা, আকাশের দিকে চেয়ে দেখ তো, কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?"

বাঙ্গা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বলিল, "হ্যাঁ, পাচ্ছি। আকাশে আমি একটা চমৎকার পালঙ্ক দেখতে পাচ্ছি। পালঙ্কের চারিদিকে সোনার ঝালর আর ফুলের মালা দুলছে—অনেক ফুল। পালঙ্কের তিন দিকে তিনজন দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে পাহারা দিচ্ছেন, যার জন্য ওই শয্যা প্রস্তুত হয়েছে সে ছাড়া আর যেন কেউ কাছে আসতে না পারে—"

মহর্ষি সাবর্ণির মনে হইল, তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনার সিদ্ধি বুঝি আসন্ন। এই পালঙ্ক বুঝি তাঁহারই জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তিন শঙ্করকে ধন্যবাদ দিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মহর্ষি কারগুব ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া বালক বাঞ্ছা যাহা বলিতেছে তাহাই শুনিতে বলিলেন।

বালক বাঞ্ছা ভাব-সম্মোহিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। সে বলিতে লাগিল, "দেবী তিনজন আমার সঙ্গে কথা বলছেন: বলছেন যে, অচিরে একজন দেবী মর্ত্য থেকে স্বর্গে আসবেন। পাটলিপুত্রের নটী নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন, সে আর নটী নেই, সে এখন দেবী। তার জন্যেই আমরা এই দিব্য শয্যা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। আমরা তার ধর্মসহচরী। আমাদের বিশ্বাস, ভয় আর ভালবাসা—"

মহর্ষি কারগুব প্রশ্ন করিলেন, "আর কিছু দেখছ কি? চারিদিকে চেয়ে দেখ।"

বালক বাঞ্ছা পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে ঊর্ধ্বে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার পর সহসা সাবর্ণিকে দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষুর দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল।

"পাচ্ছি পাচ্ছি। তিনটে ভয়ঙ্কর রাক্ষস এই লোকটাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে আসছে। একজনের চেহারা থামের মতো, দ্বিতীয়টি নারীমূর্তি, তৃতীয়টি যাদুকর। ওদের নামও দাগা রয়েছে ওদের গায়ে। প্রথমটির কপালে, দ্বিতীয়টির পেটে, তৃতীয়টির বুকে। প্রথমটির নাম অহঙ্কার, দ্বিতীয়টি বাসনা, তৃতীয়টি সন্দেহ। আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

বালক বাঞ্ছার সম্মোহিত ভাব কাটিয়ে গিয়া স্বাভাবিক সরল মুখভাব ফিরিয়া আসিল। সাবর্ণি কাতরভাবে কারণ্ডবের দিকে চহিলেন।

কারণ্ডব বলিলেন, "শঙ্করের অমোঘ বিধান আমরা শুনলাম। এ বিধান নতশিরে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।"

তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে আগাইয়া গেলেন। সূর্য অস্ত যাইতেছিল। অস্তমান সূর্যের রক্তিম স্বর্ণাভায় পশ্চিম দিগন্ত মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষি কারণ্ডব পশ্চিম মুখে চলিয়াছিলেন। পিছনে তাঁহার দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইতেছিল— মনে হইতেছিল একটি কোমল কালো মখমল যেন তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে, সুধীসমাজের হৃদয়ে যে প্রগাঢ় সম্ভ্রম তিনি সুদীর্ঘকাল সঞ্জীবিত রাখিবেন ওই সুদীর্ঘ ছায়া যেন তাহারই প্রতীক।

সাবর্ণি বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি আর কিছু দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না। একটি বাক্যই কেবল তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল—"নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন।" এ কথা তো তিনি কোনদিন ভাবেন নাই! মৃত্যুর স্বরূপ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। বহুদিন পূর্বে নরকপাল লইয়া তিনি সাধনাও

করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যু নিরঞ্জনার নয়নের দীপ্তিও নিবাইতে দিবে—এ কথা তিনি ভাবেন নাই। রূঢ় সত্যটা তাঁহাকে নিদারুণ আঘাত করিল। তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

"নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন? কি ভয়ানক কথা! নিরঞ্জনা বাঁচবে না? সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা ফুল ফল নদী নির্ঝরিণী—এসব তো অর্থহীন।"

কে যেন চাবুক মারিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া দিল

"দেখা কর, দেখা কর, অবিলম্বে দেখা কর তার সঙ্গে—"

তিনি ছুটিতে লাগিলেন। পথ জানা ছিল না, ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে তিনি গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। ঘাটে অনেক নৌকা ছিল, একটি নৌকা পাল তুলিয়া পূর্বমুখে পাড়ি জমাইবার উপক্রম করিতেছিল। সাবর্ণির চীৎকারে মাঝি তীরে নৌকা ভিড়াইল, সবর্ণি লাফাইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন। সেকালে সন্ন্যাসীদের বিরাগভাজন হইবার সাহস খুব কম লোকেরই ছিল। মাঝিরা কিছু বলিল না। সাবর্ণি নৌকার গলুয়ের উপর বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। নৌকা ভাসিয়া চলিল।

সাবর্ণি স্তব্ধ হইয়া দূর দিগন্তে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার অন্তর কিন্তু স্তব্ধ ছিল না। তিনি মনে মনে আক্ষেপ করিতেছিলেন—

"মূর্খ, মূর্খ, মূর্খ! যখন সময় ছিল, সুযোগ ছিল তখন কিছু করি নি, হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে নিরঞ্জনাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন বুঝি নি যে নিরঞ্জনাই সব, নিরঞ্জনা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই, নিরঞ্জনাহীন পৃথিবী মরুভূমি। **শঙ্কর শঙ্কর** ক'রে পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি কেবল, পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্যে

শুচিবায়ুগ্রস্তের মতো সারাটা জীবন কাটিয়েছি। কিন্তু নিরঞ্জনাকে দেখবার পর ওসবের কিছুমাত্র কি প্রয়োজন ছিল? কেন আমি বুঝলাম না যে, নিরঞ্জনার একটি মাত্র চুম্বনই অনন্ত সুখের আকর, নিরঞ্জনাই আনন্দ, নিরঞ্জনাহীন জীবন অর্থহীন। আমি মূর্খ, তাই নিরঞ্জনাকে দেখবার পরও আর একটা স্বর্গের কল্পনা করেছিলাম, শঙ্কর শঙ্কর ক'রে মিথ্যা আলেয়ার পিছনে ছুটেছিলাম। নিরঞ্জনা যা তোকে দিতে পারত, শঙ্কর কি তার শতাংশের একাংশও দিয়েছে তোকে! স্বর্গ! কোথায় আছে শঙ্করের স্বর্গ! নিরঞ্জনার অধরেই তো স্বর্গসুখ ছিল, কত লোক সে সুখ ভোগও করেছে। তুই কি করছিলি মূর্খ! কে তোর বুদ্ধিভ্রংশ করেছিল, কে তোকে অন্ধ করেছিল যে, এত বড় সত্যটা তুই দেখতে পেলি না! কলঙ্ক? নরক? ওরে মূর্খ, তার ক্ষণিকের সঙ্গলাভের জন্য যদি অনন্তকাল নরকে বাস করতে হ'ত তাও যে শ্রেয় ছিল—এ কথা তোর মাথায় ঢোকে নি কেন! সে দু হাত বাড়িয়ে তোকে আহ্বানও করেছিল, তুই তার আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে মরলি না কেন? সংযম! সংযম! যে তোকে সংযম করতে শিখিয়েছিল সে তোকে ঠকিয়েছে, প্রতারণা করেছে। ভুল পথ ধ'রে সারাজীবন কোথায় চলেছি আমি! হায় হায়! কি করেছি! নিরঞ্জনাকে পেয়েও পেলাম না, সে দু হাত বাড়িয়ে ডাকল তবু গেলাম না, ওই পরম মুহূর্তটির স্মৃতি যে অক্ষয় হয়ে থাকত আমার জীবনে, নরকে গিয়েও বিধাতাকে আমি বলতে পারতাম—আমাকে পোড়াও, আমার অস্থি চূর্ণ কর, আমাকে নিয়ে যা খুশী কর, কিন্তু যে স্মৃতি আমি বহন ক'রে এনেছি তা আমার সমস্ত সত্তাকে অনন্তকাল আনন্দিত ক'রে রাখবে, অনন্তকাল উদ্বুদ্ধ করবে। নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন?

শঙ্কর, তুমি শঙ্কর, না সং! আমাকে নরকের ভয় দেখাচ্ছ? নরকের ভয় আমার নেই। আমার ভয়, নিরঞ্জনাকে আর দেখতে পাব না। নিরঞ্জনা মারা যাচ্ছে, আর সে থাকবে না, আর কখনও তাকে দেখতে পাব না—ওহো-হো-হো—”

তিনি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং চুপি চুপি একই কথা বলিতে লাগিলেন—“কখনও না, কখনও না, কখনও না।”

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, নিরঞ্জনাকে তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু অনেকে করিয়াছে। তাহার প্রেমধারায় অবগাহন করিয়া বহু লোক তৃপ্ত হইয়াছে, বঞ্চিত হইয়াছেন কেবল তিনি। কথাটা মনে হইবামাত্র তিনি উত্তেজনা ভরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ক্ষিপ্ত পশুর মতো গর্জন করিতে করিতে নখর দিয়া বক্ষস্থল আঁচড়াইয়া হাত কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন। মাঝিরা অবাক এবং ভীত হইল। সাবর্ণি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—“যারা ওকে ভোগ করেছে তাদের সবাইকে যদি খুন করতে পারতাম!”

হত্যার কথা মনে হওয়াতে তাঁহার একটা অদ্ভুত উন্মাদনা হইল। পাশবিক উন্মাদনা। তিনি কল্পনা করিতে লাগিলেন, তিনি যেন সিন্ধুপতিকে ধীরে ধীরে চর্বণ করিতেছেন। চর্বণ করিতে করিতে একদৃষ্টে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া আছেন।

এ উন্মাদনা কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্বল হইয়া গেলেন, তাহার পর চুপ করিলেন। অস্থির চিত্ত যেন শান্ত হইল। ক্রমশ একটা অপূর্ব স্নেহরসে তাঁহার মন কোমল হইয়া আসিতে লাগিল। ইচ্ছা

করিতে লাগিল, বাল্যবন্ধু সিন্ধুপতির গলা জড়াইয়া বলেন—'ভাই সিন্ধু, তুমি নিরঞ্জনাকে ভালবেসেছিলে, আমিও তাই তোমাকে ভালবাসতে এসেছি। তার কথা বল আমাকে। তোমাকে সে যা যা বলত, তা আমাকে সব বল—'

কিন্তু এ চিন্তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছিল না। যখনই মনে পড়িতেছিল নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন, একটা তপ্ত লৌহশলাকা যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতেছিল।

তিনি আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"দিবসের আলো, রাত্রির জ্যোৎস্না, বনের জীবজন্তুরা যে যেখানে আছ, তোমরা কি বুঝতে পারছ নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন? নিরঞ্জনা যদি না থাকে তোমাদের থাকবার কি প্রয়োজন? তোমরাও লুপ্ত হয়ে যাও। নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন, তার মানে পৃথিবীর মৃত্যু আসন্ন, নিরঞ্জনাই তো পৃথিবীর আলো, প্রাণ, রূপ। তার কাছে যে গেছে সেই এ কথা অনুভব ক'রে ধন্য হয়েছে। সেদিন রাত্রে জীমূতবাহনের বাড়িতে নিরঞ্জনার কাছে কত জ্ঞানী, কত গুণী এসে বসেছিল। তাদের মুখে হাসি ফুটেছিল, আলাপে সুর লেগেছিল, চিন্তা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, কারণ নিরঞ্জনা কাছে ছিল যে। তার স্পর্শে সবই মধুময় হয়ে উঠেছিল সেদিন। লালসা-কামনার মধ্যেও সত্য শিব সুন্দর মূর্ত হয়েছিলেন। এখন সবই স্বপ্ন। নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন! আহা, আমারও যদি এখন মৃত্যু হ'ত! কিন্তু ওরে নপুংসক, জীবনকে তুই কি ভোগ করেছিস যে, মৃত্যুর স্বাদ পাবি! শঙ্কর, তুমি কি আছ? যদি থাক, আমার কথা শোন। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তোমার মুখের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করছি আমি, আমাকে অভিশাপ দাও, আমাকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ

কর। যে নিষ্ফল আক্রোশে আমার সারা বুক জ্ব'লে যাচ্ছে, অনন্ত নরকে ব'সে অনন্তকাল সেই আগুনে পুড়তে চাই আমি—"

অত প্রত্যূষে শিবানী-আশ্রমে ভৈরবী শুভ্রধারা মহর্ষি সাবর্ণিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আসুন মহর্ষি, আমাদের আশ্রম আপনার পাদস্পর্শে পূত হোক। যে সাধ্বীকে আপনি আমাদের হাতে সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন, মনে হচ্ছে তাকে আশীর্বাদ করতেই আপনি এসেছেন। ঠিক সময়েই এসেছেন, কারণ তার আর সময় নেই, করুণাময় ভগবানের ডাক এসেছে।' যে সংবাদ দেবদূতেরা দেশ-দেশান্তরে অরণ্যে পর্বতে ঘোষণা করেছে, সে সংবাদ আপনিও যে শুনেছেন তাতে আর আশ্চর্য কি! নিরঞ্জনার মুক্তির আর বিলম্ব নেই। তার তপস্যা শেষ হয়েছে। এখানে সে কি ভাবে ছিল তার বিবরণ আপনাকে সংক্ষেপে বলছি, শুনুন। আপনি যখন তাকে ঘরে তালাবদ্ধ ক'রে রেখে গেলেন, তখন আমি ওর ঘরে রুটি জল আর একটি বাঁশীও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। নটীরা সাধারণত যে ধরনের বাঁশী বাজায় তেমনি বাঁশী একটি। বাঁশী দিয়েছিলাম যাতে ও বিমর্ষ হয়ে না পড়ে। মানব-সমাজে একদিন ওর প্রকাশ সুন্দর ছিল, শঙ্করের কাছেও ওর প্রকাশ সুন্দর হোক—এই ভেবেই দিয়েছিলাম। দিয়ে খারাপ করি নি। ওই ছোট বাঁশীতে কি সুন্দর সুরই যে সে বাজাত, মনে হ'ত সুরের ভিতর দিয়েই ও শঙ্করকে ডাকছে। শঙ্কর সে ডাকে সাড়াও দিলেন। পুরো ছ মাস যখন কেটে গেল, তখন একদিন আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, যে তালা আপনি স্বহস্তে বন্ধ ক'রে চাবি নিয়ে চ'লে গিয়েছিলেন,

সে তালা আপনি খুলে গেছে। আমরা কেউ সে তালা স্পর্শও করি নি। আপনি তাকে ব'লে গিয়েছিলেন—শঙ্কর যেদিন তোমাকে ক্ষমা করবেন সেদিন তিনি নিজে এসে তোমার ঘরের তালা খুলে দেবেন। তালা খোলা দেখে আমাদের বিশ্বাস হ'ল, শঙ্কর ওকে ক্ষমা করেছেন, ওর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওকে তখন বাইরে নিয়ে এলাম। অন্য আশ্রম-বাসিনীদের সঙ্গে ও কাজ করত, প্রার্থনা করত, পূজো করত, ওর মধুর নম্র কথাবার্তায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ওকে দেখে মনে হ'ত, যেন ও লজ্জা আর সঙ্কোচের প্রতিমূর্তি। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে থাকত। ওর পূর্বজীবনের স্মৃতিই বোধ হয় এর কারণ। ক্রমশ আমি বুঝতে পারলাম—ওর বিশ্বাস, আশা আর ভালবাসার জোরে ও ভগবানকে নিজের কাছে টেনে এনেছে। ওর বিপথে যাবার আশঙ্কা আর নেই। তখন আমি নির্ভয়ে অনবদ্য রূপকে, ওর অভিনব প্রতিভাকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করলাম। সীতা, সাবিত্রী, উমা প্রভৃতির ভূমিকায় কি সুন্দর অভিনয় যে ও করত তা ব'লে বোঝাতে পারব না, সত্যিই তা অবর্ণনীয়। মনে হ'ত—অভিনয় নয়, যেন সত্যি সীতা সাবিত্রী উমা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। মহর্ষি, আমি বুঝতে পারছি, অভিনয়ের কথা শুনে আপনি ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু ওর অভিনয় আপনি যদি স্বচক্ষে দেখতেন তা হ'লে আপনার হৃদয় গ'লে যেত, চোখে জল আসত। অভিনয় করতে করতে ওর চোখ দিয়েও জল পড়ত। নানা বয়সের নানা রকমের মেয়ে আমার আশ্রয়ে থাকে। আমি কখনও কারও স্বাভাবিক প্রতিভার প্রতিকূলতা করি নি। সব বীজ থেকে এক রকম গাছ হয় না, সব গাছ এক রকম ফুল বা ফল

দেয় না। সকলের মুক্তিও তেমনি এক পথে হয় না। নিরঞ্জনার রূপ যৌবন অম্লান ছিল, তবু সে সব ত্যাগ ক'রে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করেছিল। এ রকম বড় একটা দেখা যায় না। তিন মাস অহরহ জ্বরভোগ ক'রেও ওর সৌন্দর্য এখনও অম্লান আছে। এই জ্বরই ওর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। অসুখের সময় ও কেবল আকাশ দেখতে চাইত, তাই আমরা রোজ সকালে ওকে আমাদের উঠনে আমগাছের ছায়ায় নিয়ে আসি। ওই আমগাছতলাতেই আমাদের উপাসনাও হয়। ও এখন সেখানেই আছে। আপনি সেখানেই চলুন। বেশী বিলম্ব করবেন না, তার সময় হয়ে এসেছে, শঙ্কর তাকে ডাকছেন। তার যে রূপ একদিন সকলকে মাতিয়ে-ছিল, সে রূপ এখন দেবতার পূজায় উৎসর্গীকৃত হয়েছে, সে রূপ এইবার তার দেহকে ছেড়ে যাচ্ছে। চলুন—"

প্রভাতের আলোকে চতুর্দিক হাসিতেছিল। মহর্ষি সাবর্ণি শুভ্রধারার পিছু পিছু আসিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। শিব-মন্দিরশীর্ষে একদল বন্য কপোত বসিয়া ছিল, মনে হইতেছিল মন্দিরের গাত্রে কে যেন রত্নের মালা বিলম্বিত করিয়া দিয়াছে। গাছের ছায়ায় একটি শুভ্র শয্যার উপর নিরঞ্জনা চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। তাহার পাণ্ডুর মুখ রক্তলেশহীন। আশ্রমের সেবিকারা তাহাকে ঘিরিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। নিরঞ্জনার মনের কথা যেন তাহাদের প্রার্থনায় ভাষা পাইতেছিল।

"শঙ্কর, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার করুণা দিয়ে আমার পাপ মোচন কর।"

মহর্ষি সাবর্ণি ডাকিলেন, "নিরঞ্জনা—"

নিরঞ্জনা চোখ খুলিয়া চাহিল এবং ধীরে ধীরে—অতি ধীরে

ধীরে সাবর্ণির দিকে চোখের দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা করিল। শুভ্র-ধারা ইঙ্গিতে সেবিকাদের দূরে সরিয়া যাইতে বলিলেন।

"নিরঞ্জনা—"

উপাধান হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া নিরঞ্জনা অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, আপনি? পথে আসতে আসতে আমরা সেই যে ছোট্ট নদীটির জল খেয়েছিলাম আপনার মনে আছে কি? সেই দিনই আমার নবজন্ম হয়েছিল—"

আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না, তাহার মাথা উপাধানের উপর লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যুর ছায়া তাহার মুখের উপর নামিতে লাগিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা একটা বন্য কপোতের করুণ কূজন ভাসিয়া আসিল।

মহর্ষি সাবর্ণি কাঁদিতে লাগিলেন।

সেবিকাদের অন্তিম প্রার্থনা-স্তোত্র আবার প্রতিধ্বনিত হইল—"শঙ্কর, তোমার করুণাধারায় আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে দাও, সমস্ত তাপ মোচন কর। আমার পাপের কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না—"

সহসা নিরঞ্জনা বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার নীল নয়ন বিস্ফারিত হইয়া গেল, দূর আকাশের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওই যে! অনন্ত প্রভাতের উষালোক আমি দেখতে পাচ্ছি।"

তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল, মুখ উদ্ভাসিত। মনে হইল, মানবী নয়, সত্যই দেবী। মহর্ষি সাবর্ণি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া নিরঞ্জনাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"নিরঞ্জনা, তুমি যেয়ো না, তুমি থাক, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি থাক, তুমি থাক। নিরঞ্জনা, শোন, শোন, শুনে যাও— আমি তোমাকে ঠেকিয়েছি, আমি মূর্খ, ভণ্ড, তাই তোমাকে ভুল পথে নিয়ে এসেছি। শঙ্কর, স্বর্গ—সব ভুল, সব ভুল, সব মিথ্যে। জীবনের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই, মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, মানুষের ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা। আমি তোমাকে ভালবাসি নিরঞ্জনা, আমাকে ফেলে তুমি চ'লে যেয়ো না। তুমি ম'রে যাচ্ছ—এ কথা আমি ভাবতেও পারছি না। তুমি মরবে কেন? চল তুমি আমার সঙ্গে, তোমাকে বুকে ক'রে নিয়ে আমি কোনও দূর দেশে পালিয়ে যাই। এসো, পরস্পরকে ভালবেসে নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করি আমরা। নিরঞ্জনা, নিরঞ্জনা, শোন আমার কথার উত্তর দাও, বল—আমি বাঁচব, বাঁচতে চাই। নিরঞ্জনা, ওঠ, ওঠ—"

নিরঞ্জনা তাঁহার কথা শুনিতে পাইল না। তাহার দৃষ্টি অনন্তের সন্ধান করিতেছিল।

অস্ফুট কণ্ঠে সে বলিতেছিল—"স্বর্গের দ্বার খুলে যাচ্ছে। দেব-দেবীদের দেখতে পাচ্ছি আমি। ওই যে কিঙ্করও দাঁড়িয়ে আছে, কিঙ্করের হাতে ফুল, কিঙ্কর হাসছে, আমাকে ডাকছে। দুটি দেবদূত যেন এগিয়ে আসছে। কি সুন্দর ওদের চেহারা! ও কে—ও যে শঙ্কর—শঙ্কর—"

নিরঞ্জনার মুখে আনন্দ ঝলমল করিতে লাগিল। পর-মুহূর্তেই সে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। তাহার মৃত্যু হইল।

মহর্ষি সাবর্ণি পাগলের মতো আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু শুভ্রধারা বাধা দিলেন।

"যান, যান, স'রে যান আপনি। এ সব কি করছেন? আশ্চর্য!"

সাবর্ণি সভয়ে সরিয়া গেলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বুঝি অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে, পৃথিবী দ্বিধা হইয়া এখনই বুঝি তাঁহাকে গ্রাস করিবে।

সেবিকারা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "জয় জয় শঙ্কর—জয় নীলকণ্ঠ—"

সহসা তাহাদের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। সাবর্ণিকে দেখিয়া তাহারা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল—"নররাক্ষস, নররাক্ষস!"

সত্যই তাঁহার মুখমণ্ডল রাক্ষসের মতো বীভৎস হইয়া গিয়াছিল। মুখের উপর হাত বুলাইয়া নিজেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন।

সমাপ্ত